KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : বীর প্রকাশন
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number 45/6 45/9 45/10	Year of Publication : Oct 1984 Jan 1985 Feb 1985
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিকাশ চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ নবম সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯৮৫

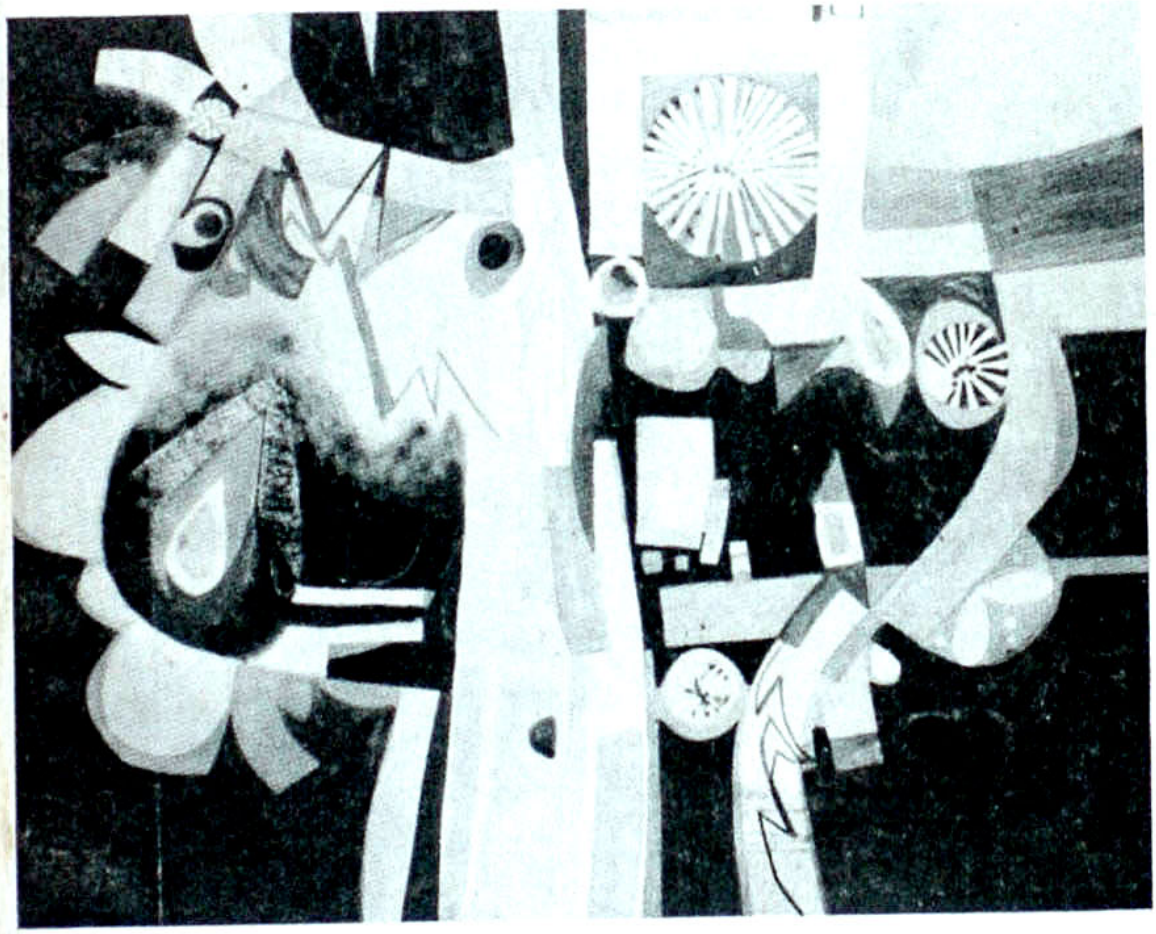

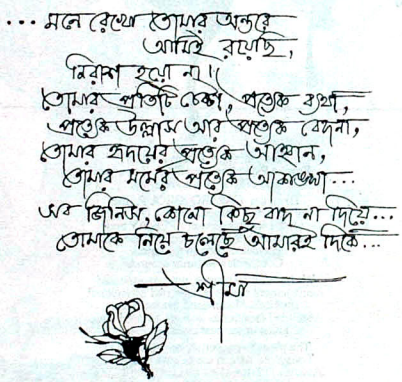

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ৯
জানুয়ারি ১৯৮৫
পৌষ-মাঘ ১৩৯১

আচার্য যদুনাথ সরকার অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯৯
শিল্পরচনার কলাকৌশল ও নন্দলাল ইন্দ্র দুগার ৭২৬
পুলিনবিহারী—যেমন দেখেছি কানাইলাল সরকার ৭৩২
সোনা, ডলার আর দরিদ্র দেশ ইন্দ্র সেন ৭৫৪

স্বরারোপ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৭২৯
মৃত্যু শিশিরকুমার দাশ ৭৩০
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৩১

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৭১৩
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৪০
মুসলমান অনিরুদ্ধ চৌধুরী ৭৪৫
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৭৫৯

গ্রন্থসমালোচনা ৭৬৬
অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, বারিদবরণ ঘোষ, আবদুর রউফ

আলোচনা ৭৭৭
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, চিত্তরঞ্জন ঘোষ,
বর্ণালী দাস, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদচিত্র। কাইয়ুম চৌধুরী
ইন্দ্র দুগারের প্রবন্ধের সঙ্গে নন্দলাল বসুর সাতটি স্কেচ

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Toxic and explosive gases. Impact injuries. Pollution. Respiratory hazards. Problems which affect workers in all industries. To help people work in safety MSA has the most advanced line of products.

We offer instruments that can detect and measure toxic, explosive and oxygen defficiencies.

MSA also offers the latest in chemical, heat-resistant and air-cooled clothing, respiratory protective equipment, head protection equipment, etc.

To find out more about the complete MSA line, write to :

MINE SAFETY APPLIANCES LTD.
P-25, Transport Depot Road, Calcutta 700 088.

MSA For Safety in Industries.

আচার্য যদুনাথ সরকার

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদের মধ্যে আচার্য যদুনাথ সরকার অন্যতম প্রধান স্মরণীয় পুরুষ। দীর্ঘ ছয় দশক তিনি ভারতীয় ইতিহাসের মন্দিরে নিরলস সাধক ছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাসের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের দেশে পথিকৃৎ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী ছিল। ১৮৭০ সালে (১০ ডিসেম্বর) যদুনাথ বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত রাজসাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে এক সমৃদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজকুমার সরকার ১৮৫৭ সালে নবস্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কলেজে এফ.এ. (ফার্স্ট আর্টস) ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কারণে তাঁকে পড়া বন্ধ করে পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তিনি স্বাধীনচেতা দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে এবং ইতিহাসে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে যদুনাথ তাঁর এই দুটি গুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

যদুনাথ কৈশোরে শিক্ষালাভ করেছিলেন রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলকাতার হেয়ার স্কুলে আর সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। ১৮৮৭ সালে তিনি রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে রাজসাহী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন। তারপর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। থাকতেন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। বি.এ. ক্লাসে যদুনাথ ইংরেজি এবং ইতিহাস—এই দুটি বিষয়ে 'অনারস' নিয়েছিলেন। (সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে 'অনারস' নেওয়া যেত এবং মেধাবী ছাত্ররা এই নিয়মের সুযোগ গ্রহণ করতেন)।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁদের কাছে যদুনাথ ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন টনি, রো এবং কলকাতায় ইংরেজি সাহিত্য অধ্যাপনার ক্ষেত্রে প্রবাদপুরুষ পারসিভ্যাল। ১৮৯১ সালে তিনি দুই বিষয়ে 'অনারস' সহ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পড়েন এবং ১৮৯২ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। (তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না, নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে এম.এ. পড়ানো হত। এম.এ. পড়ার সময় ছিল এক বৎসর)। এম.এ. পরীক্ষায় তিনি যত নম্বর পেয়েছিলেন তত নম্বর তাঁর পূর্বে—সম্ভবত তাঁর পরেও—আর কোনো পরীক্ষার্থী পান নি।

বিভিন্ন পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য যদুনাথকে ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারি বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাপনা এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি কলকাতায় রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় তিন বৎসর সেখানে কাজ করার পরে তিনি কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউশনে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজে কাজ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং এক বৎসর (১৮৯৮-৯৯) প্রেসিডেনসি কলেজে কাজ করার পর পাটনা কলেজে বদলি হন। (বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যা তখন একটি প্রদেশরূপে সংগঠিত ছিল)। পরে ১৯০১ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি প্রেসিডেনসি কলেজে ফিরে এসেছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি ফিরে গেলেন পাটনা কলেজে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে কাজ করেন। তারপর সরকারি চাকুরি থেকে ছুটি নিয়ে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষরূপে। সেখানকার পরিবেশ তাঁর ভালো লাগল না, তাই ১৯১৯ সালে তিনি সরকারি চাকুরিতে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে বিহার সরকারের উদ্যোগে ভারত সরকার তাঁকে ইনডিয়ান এডুকেশন্যাল সারভিসে উন্নীত করেছিলেন। বারাণসী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কটক রেভেনশ কলেজে যোগ দিলেন। ১৯২৩ সালে তাঁকে আবার পাটনা কলেজে বদলি করা হল। ১৯২৬ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

যদুনাথের অধ্যাপকজীবনের অবসান ঘটেছিল প্রায় ষাট বছর আগে। যাঁরা তাঁর ক্লাসে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই। কিন্তু তিনি যে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরূপে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন তার কিছু প্রমাণ আছে। প্রেসিডেনসি কলেজে তিনি পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য। পাটনা কলেজে তিনি প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস, পরে শুধু ইতিহাস পড়াতেন। বোধহয় তিনি কিছুদিন অর্থনীতিও পড়িয়েছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে —তখন অর্থনীতি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পৃথক পাঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হয় নি। ১৯০৯ সালে তাঁর 'ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি' ('ইকনমিকস অব ব্রিটিশ ইনডিয়া') বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধানত ছাত্রদের জন্য লেখা হলেও বইটি নিপুণভাবে সন্নিবদ্ধ বহু তথ্যের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়েছিল। যদুনাথ ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করেছিলেন। বহু কলেজের ছাত্র বইটির নানা অংশ মুখস্থ করে আবৃত্তি করত তাদের সহপাঠীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্য। কটক কলেজে যদুনাথ প্রধানত ইতিহাস পড়াতেন, ইংরেজি সাহিত্যও পড়াতেন, আবার বাঙলা সাহিত্যও পড়াতেন। প্রেসিডেনসি কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। পাটনা কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ছাত্র ছিলেন কটক কলেজে এবং পাটনা কলেজে।

স্বভাবত গম্ভীর হলেও যদুনাথ ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখতেন না। তাদের ফুটবল খেলায় তিনি রেফারির কাজ করতেন। কটক থেকে একদল ছাত্র রাজগীর গিয়েছিল বেড়াতে। তাদের অধিনায়ক ছিলেন যদুনাথ। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে। পাটনা কলেজ থেকে অবসরগ্রহণের দিন তিনি বৈকাল ৪টা পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে বিদায়-অভিনন্দনসভায় গিয়েছিলেন।

সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের আগেই বাঙলার গভরনর লর্ড লিটন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর আগে কোনো শিক্ষক উপাচার্য নিযুক্ত হন নি। (সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন বহরমপুরে অধ্যাপক ছিলেন)।

সেকালে উপাচার্যের কার্যকাল ছিল দুই বৎসর। যদুনাথ ১৯২৬ সালের অগস্ট মাস থেকে ১৯২৮ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত উপাচার্য ছিলেন। সরকার তাঁকে আরও দুই বৎসরের জন্য পুনর্নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যের অজুহাতে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন উপাচার্যের পদ অবৈতনিক ছিল। আংশিক সময়ের কাজের জন্য নিযুক্ত হলেও যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতেন, এবং প্রচুর পরিশ্রম করতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথের অভিজ্ঞতা প্রীতিপ্রদ হয় নি, আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারেন নি। এই পরিস্থিতির জন্য তাঁর নিজের কিছু দায়িত্ব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। যদুনাথ পাটনায় থাকতেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না, সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি স্যার আশুতোষের অনেক কাজের তীব্র সমালোচনা করে 'মডারন রিভিউ' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে। 'মডারন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (যদুনাথের বিশিষ্ট বন্ধু) নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর সমালোচক ছিলেন। স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত নেতৃবিহীন হয়ে পড়েছিল। লর্ড লিটন এবং তাঁর মন্ত্রীরা স্যার আশুতোষের প্রবর্তিত স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুকূল মত পোষণ করতেন না। ভালো ভালো কলেজে এম.এ. পড়ানোর প্রাচীন ব্যবস্থা বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা অর্থের অপব্যয় মাত্র—এটাই তাঁরা মনে করতেন। স্যার আশুতোষের কঠোর সমালোচক যদুনাথকে উপাচার্য নিযুক্ত করার এটাই সম্ভবত প্রধান কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যদুনাথ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। সাধারণভাবে বলা যায়, সিনেট আর সিনডিকেটের সভ্যেরা এবং অধ্যাপকেরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া উপাচার্যের পক্ষে দৈনন্দিন কাজের বাইরে কোনো গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া, ভালো কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ছিল সীমিত। কোনোরকমে দুটি বৎসর কাটিয়ে যদুনাথ দ্বারভাঙ্গা ভবন থেকে বিদায় নিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে যদুনাথ ফিরে গেলেন তাঁর সুপরিচিত গবেষণার ক্ষেত্রে। তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়তেন তবে ভারতীয় ইতিহাসচর্চা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ উপকার হত না। তিনি একা, সম্পূর্ণ নিজের মত অনুসারে, কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সম্ভবত এটা তাঁর মানসিক গঠনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোনো সংগঠনের মধ্যে থেকে, অনেক রকম মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে, কাজ করা তিনি পছন্দ করতেন না। এটা তাঁর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার প্রধান কারণ। ১৯১৯ সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের সমালোচনা করে 'মডারন রিভিউ' পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কলকাতার জলবায়ু যদুনাথের সহ্য হত না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার পর ১৩ বৎসর তিনি বাস করেছিলেন দার্জিলিঙে, কেবল শীতের সময় কলকাতায় নেমে আসতেন। তাঁর নিজস্ব বিপুল লাইব্রেরির অধিকাংশ বই, পাণ্ডুলিপি, মানচিত্র ইত্যাদি দার্জিলিঙে থাকত। সেখানে স্বার্থান্বেষীদের কোলাহল থেকে দূরে, শীতল শান্ত পরিবেশে, তিনি গবেষণার কাজ করতেন। বয়সবৃদ্ধির ফলে ক্রমে দার্জিলিঙের উচ্চতা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হল। তাই ১৯৪১ সাল থেকে তিনি সেখানে যাওয়া বন্ধ করে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। কলকাতায় তিনি নানা অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন (১২/১ ডাফ স্ট্রীট, ১৮-বি মোহনলাল স্ট্রীট, ৩৬/৮ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, ৯ বাদুড়বাগান রো, ৭ ডি রামমোহন সাহা লেন, পি ১৬৯ সাউদার্ন অ্যাভেনিউ, পি ৬২ ল্যানসডাউন রোড একসটেনশন)। পরে তিনি নিজে বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে যান (পি ২৫৫ ল্যানসডাউন রোড একসটেনশন—বর্তমানে ১০ লেক টেরেস)। কিছুকাল আগে ভারত সরকারের আনুকূল্যে এখানে একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে যদুনাথের নাম সংযুক্ত হয় নি।

যদুনাথ কয়েক বৎসর অবিভক্ত বাঙলার বিধানসভায় সরকার-মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি পদত্যাগ করেন।

পরিণত বয়সে যদুনাথকে গভীর শোক সহ্য করতে এবং কঠিন পারিবারিক দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কলকাতায় দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই দুর্ঘটনার পরে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার বাড়িতে এখন দুই বিধবা কন্যা এবং এক বিধবা পুত্রবধূ রয়েছে।

যদি আমি আরও অন্তত দশ বৎসর না বাঁচি তবে দুই নাবালক পৌত্র এবং তিন নাবালক দৌহিত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সাতটি নাবালিকা দৌহিত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা কিভাবে করব?" ১৯৫৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করেন। এই নিদারুণ পারিবারিক দুর্যোগ যদুনাথের ইতিহাস-সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তাঁর 'মোগল সাম্রাজ্যের পতন' ('ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার') নামক বিরাট গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে, এবং ভারতের সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে ২৮টি মহামূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড' পত্রিকায় ১৯৫২-৫৫ সালে।

যদুনাথ পরলোকগমন করেন ১৯৫৮ সালে (১৯ মে)।

২

যদুনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯০৪ সালে। তারপর অর্ধশতাব্দী-কাল তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতেন, বহুবার তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ তথা ভাববিনিময় হয়েছে, তাঁরা ইতি-হাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বহুবার একসঙ্গে ভারতের নানাস্থানে—বিশেষত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে—ভ্রমণ করেছেন। বরোদা সরকারের চাকুরি থেকে অবসর-গ্রহণ করে সরদেশাই বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে পুনা শহর থেকে ২৯ মাইল দূরে কামসেত নামক গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। এই গ্রামটি মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ইন্দ্রায়নী নদীর তীরে অবস্থিত। ওই নদীর তীরে দুটি বিভিন্ন স্থানে, সন্ত জ্ঞানেশ্বর এবং সন্ত তুকারামের আশ্রম অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত অপূর্ব বৌদ্ধ ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে ইন্দ্রায়নীর তীরবর্তী কারলায়। যদুনাথ অনেক বার কামসেত গিয়েছেন এবং সেখানে বা তার পার্শ্ববর্তী তালেগাঁওতে থেকেছেন সরদেশাইর সঙ্গলাভ এবং তাঁর সঙ্গে মারাঠা ইতিহাসের নানাবিধ সমস্যা আলোচনার জন্য। এই অঞ্চলের জলবায়ু তিনি খুব পছন্দ করতেন। বোম্বাই-পুনা রোডে অবস্থিত লোনাভেলা নামক ছোটো শহরে একটি ঐতিহাসিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

যদুনাথ এবং সরদেশাই পরস্পরকে শত শত চিঠি লিখেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে বাছাই-করা বহু চিঠি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ('লাইফ অ্যান্ড লেটারস অব স্যার যদুনাথ সরকার', সম্পাদক হরিরাম গুপ্ত, প্রকাশক পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, হোসিয়ারপুর, ১৯৫৭)। এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত কথা খুবই কম। প্রায় সব চিঠির বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর বা মতবিনিময়। একজন আর-একজনের ভুল দেখাচ্ছেন এবং সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তথ্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ ছিল, যেমন শিবাজীর রাজনৈতিক আদর্শ এবং মারাঠাদের হিন্দু পাদশাহি স্থাপনের প্রয়াস। যদুনাথ যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

> My sole interest is the discovery of truth from unassailable sources, and I am not so vain as to feel hurt it any state-ment in a book of mine is contradicted by later discovered (or published) sources. For, unless such continual **supersession** is welcomed, progress in human knowledge would be impossible.

১৯৩৭ সালে সরদেশাইকে লেখা যদুনাথের এক চিঠিতে দেখা যায়, তিনি কিভাবে মনের জানালা খুলে রাখতেন। তখন 'মোগল সাম্রাজ্যের পতন' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ছাপা হচ্ছে, ছ ফরমা ছাপা হয়ে গেছে। এই সময় যদুনাথ ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ফারসি কাগজপত্রের নকল (১৬০০ পৃষ্ঠা) পেয়ে দেখলেন, তিনি যা লিখে-ছেন তার প্রচুর সংশোধন দরকার। ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে দুটি নতুন করে লেখা হল, চার মাসের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

যদুনাথের গবেষণাপদ্ধতি ঠিকমত বুঝতে হলে এই চিঠিগুলি খুব ভালো করে পড়তে হবে। তাঁর পাণ্ডিত্য, সত্যান্বেষণে নিষ্ঠা, পরিশ্রম করার শক্তি এবং আগ্রহ প্রভৃতি গুণ এই চিঠিগুলিতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মাঝে-মাঝে সাধারণ মানবিক গুণের প্রকাশ তাঁর আপাতকঠোর চরিত্রের উপর নতুন আলো বিচ্ছুরিত করে। ১৯৩৭ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

> Kamshet may be a quiet *asrama* but dreadfully lonely, and you require mental relaxation, suitable conversation or the frolics of children to cheer your last days in this Vale of Tears.

যদুনাথ যে শিশুদের হাসিমুখ পছন্দ করতেন তার প্রমাণ এই দুই বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ ঐতিহাসিকের চিঠিতে পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালে যদুনাথ লিখে-ছিলেন :

> My little grandson, aged 10 months... dotes on me, and therefore has hitherto taken much of my daytime ! ! !

যাঁরা যদুনাথের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের পক্ষে দশ-মাস-বয়স্ক পৌত্রের সঙ্গে ক্রীড়ারত ঐতিহাসিকের ছবি কল্পনা করাও অসম্ভব। সরদেশাই অন্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভবভূতির সেই বিখ্যাত মন্তব্য—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি/লোকোত্তরানাং চেতাংসি' —যদুনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সরদেশাই প্রধানত মারাঠি ভাষায় লিখতেন, ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর দখল তেমন ছিল না। এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ১৯৪৩ সালে—৭৭ বৎসর বয়সে—তিনি ইংরেজি ভাষা থেকে উপযুক্ত শব্দচয়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে যদুনাথের উপদেশ চেয়েছিলেন। যদুনাথ লিখলেন :

> In fact, the surest means of acquiring a good style is (I) to read aloud the best English prose—avoiding ornate and involved authors, such as Dr. Johnson and Macaulay,—for half an hour every morning, (2) to avoid trashy authors, except when it is necessary to pick facts out of them, and (3) to pause and revise frequently in the course of our writing. This is the method that has borne most fruit with me, besides certain advan-tages that I had in my college.
>
> ...I compress as much as I can, and hence I have the time to revise and polish my words, or rather as I meditate before writing, the words flow well cho-sen out of my pen...
>
> ...the elements of a good prose style include not merely the choice of apt phrases, but also the judicious and most effective marshalling of the facts, the order of development of the parts of the theme or proposition you intend to prove, and the proper proportion in the length of the different parts. The true difficulty is to decide what to omit and what to keep, because we cannot give every facts ; some must go out, probably many. "The half is better than the whole", is a Greek adage, which Macaulay admires.

ইংরেজি সাহিত্যের দিগ্বিজয়ী ছাত্র এবং কৃতী অধ্যাপক যদুনাথ বিদেশী ভাষায় স্বদেশের ইতিহাস রচনার জন্য কত পরিশ্রম আর চিন্তা ('মেডিটেট') করতেন সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর বিপুল-কায় দুটি গ্রন্থে ('হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব' এবং 'ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার') মোগল স্থাপত্যের বিশালতা এবং দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসখ্যাত মন্দিরগুলির গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু চোখধাঁধানো কারুকার্য নেই। যদুনাথ ইতি-হাস রচনা করেছেন সুদক্ষ স্থপতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বাহুল্য বর্জন করে, যতটুকু ঘটনাপ্রবাহকে স্বচ্ছ গতি দেবার জন্য দরকার ঠিক ততটুকুই তিনি দিয়েছেন ; বিপুল পরিশ্রমে সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জের ভারে তিনি পাঠককে বিভ্রান্ত করেন নি। বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে ; কিন্তু সমগ্র ভারতের ইতিহাসের মূল ধারা থেকে তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। অলংকারবিহীন ভাষা পার্বত্য ঝরনার জলের মতো স্বচ্ছ ; তার প্রবাহ ক্ষণকালের জন্যও প্রস্তর-খণ্ডে বাধা পায় না, তার মৃদু দীপ্তি মনকে আলোকিত করে।

১৯৩৭ সালে যদুনাথ ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিশার-এর সদ্যপ্রকাশিত 'হিস্টরি অব ইউরোপ' বইটি সর-দেশাইকে জন্মদিনের উপহার দিয়েছিলেন। ইতিহাস-

রচনায় ইংলন্ডে মেকলে এবং স্টাবস-এর যুগে তখন অতীত হয়েছে, ফিশার এবং ট্রেভেলিয়ন-এর যুগ শুরু হয়েছে। যে যুগে মেকলের রচনাশৈলী সর্বত্র সমাদৃত হত সেই যুগের ছাত্র যদুনাথ ইংরেজি ভাষার নবরূপ-গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে যদুনাথ যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তিনি কঠোরভাবে সংযমী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি বলেছেন, ইউরোপ নানা দিকে এগিয়ে চলেছে—

> This is the result of an army of her best intellects carrying on to higher and higher stages the gains of her predecessors by working without cessation, without a break.

ইউরোপের মনীষীদের এই দৃষ্টান্ত যদুনাথ অনুসরণ করতেন। ১৯৫৬ সালে, ৮৫ বৎসর বয়সে, তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

> I too share your disgust at having to pass my old age in indolence, unable to work, while the brain is still fit.

ভারতের সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে এই অবসরক্লান্ত পণ্ডিতের ১২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে!

যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর তাঁর পক্ষে সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোকের মতো ঢিলেঢালা জীবনযাপন সম্ভব হয় না। কর্মের প্রেরণা যদুনাথকে অসামাজিক করে রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তিন মিনিটের বেশি সময় দিতেন না, অনেককে তার আগেই বিদায় করতেন তাঁর কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিয়ে। অনেক সময় দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলতেন, যিনি এসেছেন তাঁকে বসতে বলতেন না। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যদুনাথের প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরিচয়, কিন্তু যদুনাথ কখনও তাঁকে চা দেন নি। আড্ডা দেওয়া বাঙালির সামাজিক ঐতিহ্যের অঙ্গ। যদুনাথকে এই ঐতিহ্য স্পর্শ করতে পারে নি। অপরাহ্ণে তিনি বেড়াতে যেতেন, তখনও তিনি কোনো সঙ্গীর সাহচর্য পছন্দ করতেন না। কোনো প্রিয় শিষ্যের কাছ থেকেও তিনি কোনো রকম উপহার—যেমন, এক-ঝুড়ি আম—গ্রহণ করতেন না।

যদুনাথ মিতব্যয়ী ছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে তিনি আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করতেন, কিন্তু নিজের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি অর্থব্যয় করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ড· কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন, যে ক্ষুর তিনি ১৮ বৎসর ব্যবহার করেছেন সেটি পরিত্যাগ করে একটি নতুন ক্ষুর কিনতে তাঁকে রাজি করানো যায় নি। শুনেছি, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকার সময় তিনি ট্রামে কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি ট্রেনে সেকালের মধ্যম শ্রেণীতে (ইনটার ক্লাস) যেতেন, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতেন না। কিন্তু এই আপাত-কৃপণ মানুষটির বাড়িতে—কটকে এবং পাটনায়—কয়েকজন ছাত্র বৎসরের পর বৎসর বিনা ব্যয়ে বাস করত। বহু সহস্র টাকা খরচ করে তিনি বিপুল লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন ; তাতে বই এবং মানচিত্র ছাড়া দেশবিদেশের নানা স্থান থেকে সংগৃহীত ফারসি পুঁথি ছিল। এ ব্যাপারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

খ্যাতি-প্রতিপত্তির লোভ কখনও যদুনাথকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে তিনি সরদেশাইকে লিখলেন :

> I shall have to bid good bye to historical research (during the two years of my term as V.C.) instead of being able to devote all my time, as a pensioner, to my literary work.

উপাচার্যরূপে কার্যকাল সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সরদেশাইকে লিখলেন :

> Hurrah ! I am a free man again, and feel cheerful like a bird escaped from its cage.

১৯২৯ সালে যদুনাথকে 'স্যার' উপাধি দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ছয়টার সময় সরকারি উরদি-পরা এক ব্যক্তি তাঁর হাতে একটি সরকারি খাম দিল। তখন তিনি তাঁর বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন। তিনি খামটি ছিঁড়ে ভেতর-কার চিঠিটি পড়লেন, তারপর নীরবে পায়চারি করতে

লাগলেন। বাড়ির মধ্যে মহিলারা ব্যাপারটা লক্ষ করে-ছিলেন। সরকারি লোক কী বার্তা নিয়ে এসেছে তা জানবার জন্য তাঁরা স্বভাবতই খুব উৎসুক ছিলেন ; কিন্তু যদুনাথ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেও কিছু বললেন না, তাঁরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। রাত্রিতে খাবার সময় যদুনাথের স্ত্রী তাঁকে বললেন : "শুনছি তুমি নাকি কী একটা হয়েছ। এটা কি ঠিক?" তিনি উত্তর দিলেন : "ঠিকই শুনেছ। আজ থেকে লোকে তোমাকে লেডি সরকার বলবে।"

১৯৩৯ সালে যদুনাথের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে 'সরকারের অত্যোষ্টিক্রিয়া' ('সরকার ফিউ-ন্যারেল') বলে বর্ণনা করে তিনি সরদেশাইকে এক চিঠি লিখেছিলেন।

১৯১৯ সালে ভারতসরকার ইতিহাসসংক্রান্ত কাগজ-পত্র সংগ্রহ করা এবং নতুন তথ্য উদ্ধার করার জন্য 'ইনডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন' গঠন করেন। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি এবং কয়েকজন সরকার-কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি ঐতিহাসিক কমি-শনের সদস্য হতেন। যদুনাথ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েকবার কমিশনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ কমিশনের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালে কমিশন পুনর্গঠিত হয়, কিন্তু যদুনাথকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয় না। তখন ড· সুরেন্দ্রনাথ সেন কমিশনের কর্মসচিব, স্যার জন সারজেন্ট ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা এবং নলিনীরঞ্জন সরকার বড়লাটের একসিকিউটিভ কাউনসিলে শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। সুরেন্দ্র-নাথ সেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একান্ত অনু-রাগী এবং তাঁর কাজের তাঁর সমালোচক যদুনাথের প্রতি বিরূপ ছিলেন। মহারাষ্ট্রে একদল ঐতিহাসিক যদুনাথ এবং সরদেশাইর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দত্ত বামন পোতদার। তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেনের সৌহার্দ্য ছিল। সরদেশাই ১৯৪১ সালে যদু-নাথকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, সেন এবং পোত-দারের কারসাজিতে যদুনাথকে কমিশনের বাইরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। যদুনাথের যেসব চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই।

পোতদারের উদ্যোগে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল পুনাতে, ১৯৩৫ সালে। এখানে কেবলমাত্র আধুনিক যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ড· সফতে আহম্মদ খাঁ। তাঁর উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল। এখানে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। যদুনাথ এবং সরদেশাই এই অধিবেশনে, বা কংগ্রেসের পরবর্তী কোনো অধিবেশনে, যোগদান করেন নি। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদু-নাথ কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তিনি বলতেন, এটা একটা 'বিরাট তামাসা'। ১৯৩৮ সালে সরদেশাই এলাহাবাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদুনাথকে যা লিখেছিলেন তাতেই যদুনাথের এই মন্তব্যের কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> I think our object is essentially different from that of Allahabad. Paper reading, speech making and other advertising items are their mainstay : while we here will have quiet heart to heart talks, consultations and deliberations, throughout night and day as we sit together and devote practically all our time to the subject'.

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, গভরনর বা রাষ্ট্রপতির দ্বারা সভার উদ্বোধন করিয়ে, শত শত সভ্যের সমাবেশে প্রকৃত গবেষণার পক্ষে সহায়ক কোনো কাজ হতে পারে, এটা যদুনাথ বিশ্বাস করতেন না।

৩

যদুনাথের ইতিহাস-সাধনা সম্বন্ধে দুটি প্রাথমিক প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। প্রথমত তিনি এম.এ. পরীক্ষার জন্য ইতিহাসের পরিবর্তে ইংরেজি বেছে নিয়েছিলেন। তবে ঠিক এম.এ. পরীক্ষার পরেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ইতিহাস নির্বাচন করলেন কেন?

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বাদ দিয়ে তিনি মধ্যযুগের ইতিহাস, বিশেষত আওরঙ্গজেবের মতো হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাটের ইতিহাস, গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন কেন?

যদুনাথ কলকাতায় আকাশবাণীতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন যে তাঁর পিতা তাঁর মনে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের বীজ বপন করেছিলেন, এবং পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি স্বদেশের ইতিহাসচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কোনো দেশের সাহিত্য ভালো করে বুঝতে হলে সেই দেশের ইতিহাস জানা দরকার। দান্তের মহাকাব্যের রসাস্বাদনের জন্য যদুনাথ ইটালির ইতিহাস পড়েছিলেন সিসমনডির গ্রন্থে। তাঁর কাছে সাহিত্য এবং ইতিহাস পরস্পরের অনুপূরক ছিল। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফলে ইংরেজি ভাষায় ভাবপ্রকাশে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস পাঠের ফলে ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। 'ইতিহাস এক মহাদেশ' নামক বাঙলা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "তুলনা-মূলক নৃতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদির গত পঞ্চাশ বৎসরে যে অগাধ চর্চা হইয়াছে তাহার ফলে প্রাগ্‌ইতিহাস নামে একটি নূতন মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" যিনি অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল মধ্যযুগের ফারসি আর মারাঠি বই এবং কাগজপত্রের স্তূপে ডুবে ছিলেন তাঁর পক্ষে ইতিহাসের সীমানার বিস্তার সম্বন্ধে এই সচেতনতা সত্যই বিস্ময়কর। নৃতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ—এসব উপাদান যে ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, তা স্বীকার করে তিনি গবেষণার আধুনিকতম ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন।

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্বন্ধে যদুনাথের গভীর জ্ঞান ছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

> Writing a history that will live requires not only mere industry (a copyist's industry) in collecting materials, but what is far higher,—extensive reading (not narrow specialised study), power of deep thinking and connecting together the near and the distant, things Indian and foreign (by way of comparative estimate and liberal interpretation) and a certain advance in age'.

এখানে যদুনাথ তিনটি গুণের উপর জোর দিয়েছেন : (১) নানা বিষয়ে পড়াশুনা, (২) গভীর-ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, (৩) মানসিক শক্তি পরিণতি লাভ করেছে এমন বয়স। আজকাল যাঁরা তিন বৎসরে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করে 'ডক্টর' হন তাঁদের কাছে এসব কথা বৃদ্ধের প্রলাপ বলে মনে হবে।

যদুনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন নি কিন্তু এই দুরূহ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। সরদেশাই বলেছেন, এক-দিন কামসেতে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে এসেছিলেন হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষে একটি বাণীর জন্য। যদুনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরদেশাই যখন ভাবছিলেন তিনি কী লিখবেন তখন—

> Jadunath quietly pulled out a piece of paper and wrote on it in his own hand a line from the Heliodorus pillar inscription at Bhilsa (cir. 130 B.C.) which means that the best religion consists in carrying into practice self-restraint, self-sacrifice and right thinking. What more fitting message from Ancient India could a venerable Guru give to Modern India!

১৯৪০ সালে যদুনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পুস্তকের তালিকা সরদেশাইকে পাঠিয়ে-ছিলেন তাঁর পড়বার জন্য। তাতে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে জায়সবালের প্রসিদ্ধ বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

> The writings of K. P. Jayaswal, though containing a few original discoveries, are ninetynine per cent pure nationalistic brag and moonshine.

এই কয়টি শব্দে যদুনাথ জায়সবালের বই সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের মত প্রকাশ করেছিলেন।

সেকালে কেউ কেউ ইংরেজি এবং ইতিহাসে 'অনার্স' নিয়ে পরে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তেন, কিন্তু পরে ইতি-

হাসে তাঁদের অনুরাগ বাড়ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস নেতা এবং রাষ্ট্র-পতি থাকার সময় তিনি ইতিহাসচর্চায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতেন। যদুনাথের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগ করা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার কারণ নেই।

যদুনাথ যখন কলেজে পড়তেন তখন হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ চলছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের কীর্তিগাথা রচনা শুরু করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিস্টরি অব সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' (তিন খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। মহাজনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে যদুনাথ মধ্য-যুগের ইতিহাস—বিশেষত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস—তাঁর গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন কেন? ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন, প্রাচীন ভারতের ইতি-হাসের প্রধান উপাদান শিলালিপি আর মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি যদুনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে আকর্ষণীয় ছিল না; তাই ফারসিতে লেখা ইতিহাস এবং চিঠিপত্র ব্যবহার করে তিনি মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবকে তিনি কেন বেছে নিলেন সে সম্বন্ধে ড. কানুনগো কিছু বলেন নি। আমার মনে হয়, এই বহু গুণে সমৃদ্ধ সম্রাটের জীবনের ট্রাজেডি (যা সমগ্র ভারতের পক্ষেও ট্রাজেডি) তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা আকৃষ্ট করেছিল। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যদুনাথ বলেছেন :

> The ruler was free from vice, stupidity, and sloth. His intellectual keenness was proverbial, and at the same time he took to the business of governing with all the ardour which men usually display in the pursuit of pleasure. In industry and attention to public affairs he could not be surpassed by any clerk. His patience and perseverance were as remarkable as this love of discipline and order. In private life he was simple and abstemious like a hermit. He faced the privations of a campaign or forced march as uncomplainingly as the most seasoned private. No terror could daunt his heart, no weakness or pity melt it. Of the wisdom of the ancients which can be gathered from ethical books, he was a master. ...And yet the results of fifty years' rule by such a sovereign was failure and chaos. The cause of this political paradox is to be found in Aurangzib's policy and conduct.

সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। যদুনাথ এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বলেছেন, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের সামরিক অভিযানগুলি কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। শাসক-শ্রেণীর নৈতিক চরিত্রের অবনতির উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র আজমকে এক চিঠি লিখেছিলেন। তার একটি পঙ্‌ক্তি বিশেষ অর্থবহ : 'দেখবে যেন কৃষকেরা এবং সাধারণ মানুষ অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত না হয় এবং মুসলমানেরা নিহত না হয়...'। হিন্দুদের নিধন সম্বন্ধে মৃত্যুশয্যা-শায়ী সম্রাট কোনো সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন নি।

যদুনাথ আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সমালোচনা করে সেকালের মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন এবং সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক লেখকরূপে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি মুসলমানদের লেখা ইতি-হাস এবং মোগল দরবারের দলিলপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মন্দির ধ্বংস, জিজিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে হিন্দুবিরোধী ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যা লিখে-ছেন তার সত্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। ১৯৪৬ সালে যদুনাথ সরদেশাইকে লিখেছেন :

> True, interpretation must differ according to the writer's personality; but the basis of the conclusions must be unquestionable facts (as established by latest research) and not mere conjecture.

Moreover, the interpretation must be such as to convince an impartial outsider.

যদুনাথ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সমালোচনা করেন নি। বর্তমানের চশমা দিয়ে অতীতকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মারাঠা ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে তিনি মারাঠাদের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেন নি। ১৯৪০ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

It is pure moonshine to suggest that Baji Rao and (Sawai) Jai S(ingh), of Jaipur) planned to co-operate in founding a Hindu Pat-Padshahi. We make ourselves ridiculous when we read the thoughts of 20th century English-educated nationalists into the lives of sectarian or clannish champions of the 17th and 18th centuries.

বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদুনাথ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করেছিলেন। মোগল সম্রাটেরা ভারতে প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু যদুনাথের ভাষায় (মডারন রিভিউ, নভেম্বর ১৯৪২) বলা যায় :

Mere autocratic dictation, the mere drawing of the administrative road roller over the rough face of the people's heads, cannot grind them into true uniformity; at least such uniformity is not natural and does not last long.

আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিরোধী নীতি সম্বন্ধে যদুনাথ বলেছেন :

With every generous instinct of the soul crushed out of them, with intellectual culture merely adding a keen edge to their sense of humiliation, the Hindus could not be expected to produce the utmost of which they were capable; their lot was to be hewers of wood and drawers of water...Amidst such social conditions the human hand and the human mind cannot achieve their best; the human soul cannot soar to its highest pitch. The barrenness of the Hindu intellect and the meanness of spirit of the Hindu upper classes are the greatest condemnation of Muhammadan rule in India.

এই দুর্গতি থেকে হিন্দুদের উদ্ধারের পথ দেখিয়েছিলেন শিবাজী। যদুনাথ বলেছেন :

Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from the administration, and legal repression; it can again lift its head up to the skies.

আওরঙ্গজেব তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালের (১৬৫৮—১৭০৭) অধিকাংশ সময় রাজপুত এবং মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর নীতি মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

যদুনাথের বিশাল গ্রন্থ 'হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব' পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৯১৬ সালে, চতুর্থ খণ্ড ১৯১৯ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯২৪ সালে। যখন নতুন সংস্করণ প্রয়োজন হত তখনই যদুনাথ নতুন তথ্য সংযোজিত করতেন।

এই মহাগ্রন্থ পড়তে-পড়তে পাঠকের মনে হবে তিনি এক ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে এক পঞ্চাঙ্ক ট্রাজিক নাটকের অভিনয় দেখছেন—যে নাটকে কল্পনার স্থান নেই, ভাবোচ্ছ্বাস নেই, কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের লৌহকাঠামোর মধ্যে যার স্থিতি। তিনি মোগল বাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে যাবেন মধ্য এশিয়ায়, কান্দাহারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, পানজাবে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, চট্টগ্রামে, মধ্যভারতে, রাজস্থানে, মহারাষ্ট্রে। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের বৈচিত্র্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠবে। জয়ের উল্লাস এবং পরাজয়ের হতাশা তাঁকে স্পর্শ করবে। তিনি আরও দেখবেন, দারাকে হত্যা করার নিষ্ঠুর দৃশ্য; বন্দী শাহজাহানের অসহায় ক্রন্দন তিনি শুনবেন; তিনি দেখবেন, শিবাজীর পুত্র বন্দী সম্ভাজীর দেহ টুকরো টুকরো করে কুকুরগুলির দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের মৃত্যুতে বিচলিত, ৮৯ বৎসর (১৬১৮-১৭০৭)-বয়স্ক জরাজীর্ণ সম্রাটের দেহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। দেহাবসান ঘটল ইসলামের পবিত্র দিন শুক্রবারে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর ভক্তের সকল অপরাধ ক্ষমা করলেন—এটা কি তারই ইঙ্গিত?

যদুনাথ বলেছেন, মধ্যযুগে সকল দেশে—বিশেষত ভারতবর্ষে—রাজাকে প্রজাদের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী করা হত। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং রাজাকে কেন্দ্র করেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সাজাতে হবে এবং তাঁর চরিত্র এবং নীতির মধ্যেই সেগুলির ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যদুনাথ তাঁর গবেষণার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। স্বভাবতই তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য আজকাল যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেন তাঁরা দুটি কথা ভুলে যান। প্রথমত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অর্থবহ আলোচনার জন্য রাজনৈতিক ইতিহাসের সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট কাঠামো গঠন করা দরকার। সন-তারিখ আর সামরিক অভিযান নিয়ে ব্যস্ত যদুনাথ সেই কাঠামো রেখে গেছেন। কোনো সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক সেই কাঠামোতে ফাটল ধরাতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে সচেতনতা এসেছে সেটা যদুনাথের যুগে পৃথিবীর কোনো দেশেই ছিল না। তাঁর কাছে এটা আশা করা উচিত নয় যে, যে গবেষণার যুগ পরে এসেছে তাঁর সে গবেষণা আগেই আসা উচিত ছিল।'

'হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব' রচনার জন্য যদুনাথ প্রধানত ফারসিতে লেখা বই, সরকারি দলিল এবং চিঠিপত্র ব্যবহার করেছেন। পানজাবি, রাজস্থানি, মারাঠি, অহমিয়া, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় লেখা উপকরণও তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শিবাজীর জীবনী রচনা করিতে গিয়া আমাকে ভাল করিয়া পার্সী ও মারাঠি ভাষা শিখিতে হয়, তা ছাড়া ইংরাজি, সংস্কৃত ও রাজস্থানি ডিপ্লোম ভাষা তো আছেই।' বহু যত্নে প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি যেসব উপকরণ সংগ্রহ করতেন তার সবই তিনি নির্বিচারে ব্যবহার করতেন না, কোন্‌টি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা খুঁটিয়ে দেখতেন। সংগৃহীত তথ্যগুলিকে কোনোরকমে এলোমেলোভাবে সাজানো তাঁর রীতিবিরুদ্ধ ছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি সরদেশাইকে লিখেছিলেন :

The true historian's function is that of the stomach in digesting and extracting the vital juice from the raw food stuff passed down the throat.

আজকাল মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে, যদুনাথ ফারসি আর মারাঠি ভাষা ভালো জানতেন না। তিনি 'মাসির-ই-আলমগীরী' গ্রন্থের যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তা কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'আইন-ই-আকবরী'র জ্যারেট-কৃত অনুবাদ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) তাঁর সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেছে। তা ছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন 'আথাম-ই-আলমগীরী', মারাঠা ইতিহাস সংক্রান্ত ফারসিতে লেখা কাগজপত্র, ইত্যাদি। এইসব অনুবাদে কোনো ভুল সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতেরা গবেষকদের নজরে এনেছেন বলে শুনি নি। মারাঠি ভাষায় তাঁর কতখানি দখল ছিল সেটা সরকার-সরদেশাই পত্রাবলী পড়লে বেশ বোঝা যায়। পুনায় সংরক্ষিত পেশোয়া দপ্তরের পত্রাবলী (মারাঠি ভাষায় লেখা) সরদেশাই সম্পাদনা করেছিলেন (৪৫ খণ্ড)। যদুনাথের নির্দেশ তথা সহযোগিতা নিয়ে। যদুনাথ প্রাচীন মোড়ী লিপি পড়তে অসুবিধা বোধ করতেন, কিন্তু তাঁর সময় ওই লিপিতে লেখা চিঠিপত্রের দেবনাগরী অনুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল।

উইলিয়ম আরভিন ১৭০৭ সাল থেকে পরবর্তী তিন বৎসরের ইতিহাস ('লেটার মুঘলস') লিখেছিলেন। বইটি অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিত রেখে তিনি পরলোকগমন করেন। যদুনাথ বইটি সম্পাদনা করেন এবং নিজে তিনটি অধ্যায় যোগ করেন। ১৯২২ সালে বইটি প্রকাশিত হল; আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে নাদির শাহের আক্রমণ (১৭০৭-৩৯) পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হল।

'হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব' লিখতে যদুনাথ সময় নিয়েছিলেন ২৫ বৎসর; অবশ্য এই সময়ের মধ্যে আরো কয়েকখানি বই এবং বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'হিস্টরি অব আওরঙ্গজেব', পঞ্চম খণ্ড, প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী ২৫ বৎসরে তিনি লিখলেন চার খণ্ডে বিভক্ত 'ফল অব দি মুঘল

এম্পায়ার'। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৪ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৮ সালে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৫০ সালে। এই বিরাট গ্রন্থে ১৭৩৯ সাল থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মারাঠা পাদশাহির উত্থান-পতনের কাহিনী এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ, কিন্তু যদুনাথ সযত্নে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। মারাঠাদের কর্মকাণ্ডের যে অংশ মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্যের সংগে যুক্ত নয় সেটা তিনি বাদ দিয়েছেন। ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি বিদেশী জাতির কর্মকাণ্ড সম্বন্ধেও তিনি এই নীতি অনুসরণ করেছেন।

আওরংগজেবের রাজত্বকালে তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রম বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করত। তিনি ছিলেন রংগমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দু। ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত না থাকলেও তাঁর অশরীরী উপস্থিতি স্থানীয় নায়কদের প্রভাবিত করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ছিল খণ্ড-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি এক নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দাবি করতে পারেন এমন কোনো বিরাট পুরুষ ছিলেন না। বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন নায়ক। এই বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস একটি কাঠামোর মধ্যে টেনে আনা এবং তাকে একটি সুসংহত ছবির রূপ দেওয়া অতি কঠিন কাজ। ৫৫ বৎসর বয়সে কাজটি আরম্ভ করে ৮০ বৎসর বয়সে যদুনাথ এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন।

যদুনাথের ব্যবহৃত উপাদানের বৈচিত্র্যও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। ফারসি এবং মারাঠি বাদে ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, রাজস্থানি এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিপুল উপাদানের সম্ভার তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

নাদির শাহের আক্রমণের সংগে-সংগেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের মৃতদেহ ষাট বৎসর সুসজ্জিত শবাধারে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘকাল মোগল শাসনে অভ্যস্ত মানুষ মনে করত যে মোগল সাম্রাজ্য বেঁচে আছে। ঐতিহ্যের মোহ সাম্রাজ্যের এক ছায়ামূর্তি সৃষ্টি করেছিল। মারাঠারা উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেও সেই ছায়ামূর্তিকে সরিয়ে দেয় নি। আহম্মদ শাহ সেই ছায়ামূর্তির নামে নিজের প্রতিনিধি নজীবউদ্দৌলার নামে দিল্লী শাসন করতেন। ইংরেজ কোম্পানি সেই ছায়ামূর্তির কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেছিল। সেই ছায়ামূর্তির নামে মহাদাজী সিন্ধিয়া রাজপুত রাজাদের কাছে কর আদায় করতেন। সেই ছায়ামূর্তিই 'ফল অব দি মোগল এমপায়ার' গ্রন্থের নায়ক। তাঁকে কেন্দ্র করেই যদুনাথ এক বিরাট অশ্রুসিক্ত রক্তাপ্লুত নাটক রচনা করেছেন।

শব্দের মালা গেঁথে অপূর্ব চিত্র রচনা করেছেন যদুনাথ। পুতুল বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের সময় অর্থাভাবে সম্রাটের প্রাসাদে রান্না হয় না—

> ...one day the princesses could bear starvation no longer, and in frantic disregard of the *parda*, rushed out of the palace for the city...

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছে, পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাস রাও নিহত হয়েছেন। তাঁর খুল্লতাত, প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউ স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলেন।

> He could not show his face at Poona after having lost the precious charge entrusted to his hands by a weeping mother. Death had lost all its bitterness, because life had no longer any meaning for him.

রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির দিল্লী অধিকার করে পুতুল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের (যিনি ইংরেজ কোম্পানিকে দেওয়ানি দিয়েছিলেন) চক্ষু উৎপাটন করল।

> ...in unimaginable brutality, he called for the Court-painter and made him draw a picture of himself as he knelt on his half-dead master's bosom and carved out one eye-ball with his dagger, while the other eye was extracted by Qandahari Khan. The wounded old man was left for days together without a drop of water...

কিছুদিন পরে মহাদাজী সিন্ধিয়া দিল্লী অধিকার করলেন, গোলাম কাদিরের চক্ষু উৎপাটন করে শাহ আলমের হাতে দেওয়া হল, তার দেহ খণ্ড-খণ্ড করে একটা গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

> ...a black dog with white rings round its eyes sat below it (i.e., the body) and lapped up the blood dripping from the neck...

যে মারাঠারা হিন্দু পাদশাহির ধ্বজা তুলেছিল তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় না দেখে জয়পুরের রাজা ঈশ্বরী সিংহ আত্মহত্যা করেন।

> Iswari Singh ordered his servant to bring a live cobra and some arsenic as needed for preparing a medicine. It was done. At midnight he swallowed the poison and caused the cobra to sting him. Three of his queens and one favourite concubine took poison along with him and all five of them died...

অষ্টাদশ শতাব্দীর নিমজ্জমান ভারতবর্ষে নৈতিক অবনতি সমাজকে বিষাক্ত করেছিল। বাঁরত্বের পুণ্যভূমি রাজপুতনায় জয়পুরের রাজা সওয়াই প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে যদুনাথ বলেছেন :

> Anticipating the decadent Nawabs of Oudh, he used to dress himself like a female, tie bells to his ankles and dance within the harem.

মারাঠা রাষ্ট্রনায়ক নানা ফড়নবীশ তাঁর ব্যক্তিগত কোষাগারে দুই কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। এই বিপুল অর্থ রাজের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হত না। তাঁর নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য ছিল।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের শেষদিকে, ১৮০৩ সালে, বৃদ্ধ অন্ধ পুতুল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম পরাজিত দৌলত রাও সিন্ধিয়ার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ সূর্যাস্ত হল।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সংগে মারাঠাদের ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। ১৯০৭ সালে যদুনাথ শিবাজী সম্বন্ধে 'মডারন রিভিউ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তখন বাঙলায় স্বদেশী যুগ, বাঙালি তিলক-কর্তৃক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব পালন করছে, রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা যোগাচ্ছে। ১৯১৯ সালে যদুনাথের 'শিবাজী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবদ্দশায় বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ; প্রত্যেক বারই তিনি নতুন তথ্য সংযোজন করেছিলেন। 'হিস্টরি অব আওরংগজেব' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়, শিবাজী এবং শম্ভাজী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। পঞ্চম খণ্ডে মারাঠাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম (১৬৮৯-১৭০৭) দমনে আওরংগজেবের প্রাণপণ প্রয়াস এবং ব্যর্থতা বর্ণিত হয়েছে। 'ফল অব দি মোগল এমপায়ার' গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনের কাহিনী পাওয়া যায়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বর্ণনায় এবং তার রাজনৈতিক ও সামরিক দিকের বিশ্লেষণে যদুনাথ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা ভারতের ঐতিহাসিক সাহিত্যে নেই। আমার মনে হয়, কেবলমাত্র উইনস্টোন চারচিলের রচিত মারলবরোর জীবনীতে স্পেনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সংগ্রামের বর্ণনার সংগে যদুনাথের পানিপথসংক্রান্ত অধ্যায়গুলির তুলনা করা যায়। অবশ্য যদুনাথের ভাষায় তথা রচনা-ভঙ্গিতে চারচিলের ভাষার অলংকারের দীপ্তি নেই, কিন্তু সুষ্ঠু, শব্দপ্রয়োগ থেকে উদ্ভূত প্রাথর্য আছে, ঘটনা-প্রবাহ ঝরনার জলের মতো অবিরাম অস্থির নৃত্যে প্রবাহিত হচ্ছে। যদুনাথ একাধিকবার পানিপথের রণক্ষেত্র পদব্রজে পরিক্রমা করেছেন ; ১৭৬১ সালের পর ঐ অঞ্চলে যমুনা নদী দেড় মাইল সরে গিয়েছে, এটাও তিনি লক্ষ করেছেন।

১৮০৩ সালে কেবলমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত হয় নি, মারাঠা সাম্রাজ্যেরও সূর্যাস্ত হয়েছিল ; পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজ কোম্পানির আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

পুনায় পেশোয়াদের দরবারে ১৭৮৬ সাল থেকে ইংরেজ কোম্পানির রেসিডেন্ট থাকতেন। রেসিডেন্টরা যেসব চিঠিপত্র লিখতেন সেগুলি সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। যদুনাথ এবং সরদেশাইর মিলিত চেষ্টায় ১৫ খণ্ডে এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ('পুনা রেসিডেন্সি করেসপনডেনস')। যদুনাথ ছিলেন এই গ্রন্থাবলীর সাধারণ সম্পাদক ; তিনি নিজে তিন খণ্ডের সম্পাদনা করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে যদুনাথের উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি লিখেছেন :

> I have travelled extensively through the Sahyadri hill range and the river valleys, and everywhere have noticed with surprise the free self-reliant character of the common people, peasants and day labourers, such as can never be seen among the helpless ryots of big zamindars in Hindustan, the police-ruled population of indigo-growing areas, the vassals (serfs) of feudal jagirdars in Rajputana and Malwa.

কিন্তু মারাঠা শাসকশ্রেণীর নৈতিক অধঃপতন এবং উত্তর ভারতে মারাঠাদের লুণ্ঠন আর অত্যাচার সম্বন্ধে যদুনাথ বারবার অতি কঠোর মন্তব্য করেছেন। এজন্য মহারাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে ক্ষমা করে নি।

১৯৪৮ সালে সরদেশাই যদুনাথকে লিখেছিলেন :

> ...more than 90 p.c. of Maratha history is the result of your singular untiring labours of half a century.

এই মন্তব্য গুণমুগ্ধ বন্ধুর অত্যুক্তি নয়।

বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর দুটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানত কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বন করে তিনি ইংরেজিতে চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' (দ্বিতীয় খণ্ড, বক্তিয়ার খলজী থেকে পলাশী) গ্রন্থের তিনি ছিলেন সম্পাদক, এবং ছাব্বিশটি অধ্যায়ের মধ্যে দশটি এবং আর-একটির অর্ধাংশ তিনি নিজে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের উপসংহারে তিনি ইংরেজের আগমনের ফলে বাঙলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাকে ভিত্তি করেই তিন দশক যাবৎ বিষয়টির আলোচনা চলছে।

মাতৃভাষার প্রতি যদুনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিবাজী সম্বন্ধে তিনি বাঙলায় একটি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা বহু বাঙলা প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ করে তিনি কবিগুরুর বাণীর বিভিন্ন দিক অবাঙালি পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করেছিলেন।

যদুনাথের যে কয়টি গ্রন্থের কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইতিহাস এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তিনি ইংরেজিতে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কৌতূহলী পাঠক অমলেন্দু দে এবং বিনয়ভূষণ রায়-কর্তৃক সংকলিত 'স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জী' (১৯৭৩) দেখতে পারেন।

বর্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে যদুনাথ যে ভাষণ (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২) দিয়েছিলেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ইতিহাস-চর্চায় নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্মরণীয় :

> 'সত্য প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত যদুনাথ এই 'প্রতিজ্ঞা' পালন করেছেন।

আওরঙ্গজেবের জীবন থেকে যদুনাথ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেটা সাম্প্রতিক কালের জাতীয় সংহতির প্রবক্তাদের বিবেচনা করা কর্তব্য।

> If India is ever to be the home of a nation able to keep peace within and guard the frontiers, develop the economic resources of the country and promote art and science, then both Hinduism and Islam must die and be born again. Each of these creeds must pass through a rigorous vigil and penance, each must be purified and rejuvenated under the sway of reason and science.

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'শিখধর্ম' সম্বন্ধেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

জাহাজে ওঠার আগে মিলি চিঠি লেখে জুলিকে। বলে, "আমি আবার অকূলে ভাসলুম রে! জীবন আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমার স্থান। ঝাঁসীর রানী হতে চাইলেই হওয়া যায় না, ভাই। তোকেও বুঝতে হবে যে জোন অভ হতে চাইলেই হওয়া যায় না। নৌসেনা বিদ্রোহ বা সিপাই বিদ্রোহ কোনোটাই এদেশে জমবে না। তার আগেই এদেশ স্বাধীন হবে। আয়ারল্যান্ডের মতো স্বাধীন। তার পরেও যদি কেউ আইরিশ রেপাবলিকান আর্মির মতো অখণ্ড ভারতীয় সেনা গঠন করতে চায় করতে পারে। কিন্তু আমি তার মধ্যে নেই। যারা আমাদের নয় তারা আমাদের নয়। জোর করে তাদের আপন করা যায় না। ওরা যদি আলাদা হতে চায় আলাদাই হোক। শুধু দেখতে হবে যেন আমাদের ভাগ থেকে কলকাতা বাদ না পড়ে। ইংরেজদের ঘটে ওটুকু বুদ্ধি আছে। ওরা যদিও পিটারকে রব করে পলকে দিতে ওস্তাদ তবু ভারততাগের সময় পিটারকে চিরশত্রু করতে সাহস পাবে না। বাণিজ্য তো পিটারের সঙ্গেই। আর ওরা বণিক জাতি।

এর পর মিলি আসে আসল কথায়। "জুলি, আমার বিশেষ অনুরোধ যতদিন না তোর নিজের কুটীর হয় ততদিন আমাদের বাড়িই তোর বাড়ি, আমার মা-বাবাই তোর মাসিমা মেসোমশায়। তুই ও'দের কাছেই থাকিস। তাতে ওরা আমাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ ভুলবেন। তুই ও'দের আরেকটি মেয়ে। শুধু মনে রাখিস যে ও'রা রাজনীতির লোক নন, রাজনীতি এড়িয়ে চলেন। ও'দের পক্ষে ওটাই নিরাপদ পলিসি। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। ও'দের কাছে এটা স্পষ্ট যে ও'দের বাসস্থানটা কুম্ভীরাস্থান হতে যাচ্ছে। যদি না কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন হয়।"

মিলির নৌসেনাবিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার বিশদ বিবরণ সে নিজে লেখে নি। লিখেছেন তার দাদা। জুলিকে নয়, ওর বাবাকে। ক্যাপটেন মুস্তাফী সেটা শোনান ওর মাকে। ওর মা শোনান জুলিকে। আর জুলি সৌম্যকে।

সৌম্য তা শুনে বলে, "ওর ভিতরে যে আগুন ছিল তা দেখছি এতকাল পরেও নিবে যায় নি। ধন্যি মেয়ে!"

জুলির তা শুনে কী অভিমান! "তোমার সঙ্গে ঠিক মানাত। আমি তো কবে নিবে গেছি, যদি আদৌ জ্বলে থাকি।"

"না, না, তোমার ভিতরেও আগুন আছে, জুলি। সে আগুন তুমি লক্ষ-লক্ষ নরনারীর জীবনে ধীরে-ধীরে, অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করবে। বাক্য দিয়ে নয়, ব্যক্তিত্ব দিয়ে। জনজাগরণ না হলে আমরা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কী করব! আমরা যাকে গঠনের কাজ বলি তা জনজাগরণের সূত্র। দেখতে নাটকীয় নয় বলে বামপন্থীরা বিমুখ। দক্ষিণপন্থীদেরও চাড় নেই, কারণ তাঁরা আইন-সভায় গিয়ে মন্ত্রী হতে চান। এবার বড়লাটের কর্ম-পরিষদের সদস্য হয়েই তাঁদের ইপ্সিতপ্রাপ্তি। যার জন্যে আজীবন দুশ্চর তপস্যা। এর পরে একদিন শুনবে তাঁরা পদত্যাগ করে ফিরে এসেছেন। আমাদের পথ তেমন পথ নয়। আমরা জনগণের কাছে যাই ভোটের জন্যে নয়। ওদের ভিতরে আগুন সঞ্চার করতে। যে আগুন হিংসার আগুন নয়, তেজস্বিতার আগুন।" সৌম্য জুলিকে বোঝায়।

ইনটারিম গভর্নমেন্টের প্রসঙ্গ ওঠে। সৌম্য বলে, "জবাহরলাল আর আজাদ অত্যধিক বাস্ত। তাঁদের মতে ওটা নাকি প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট। বিপ্লবের পর যেমন হয়। বিপ্লব করে হল যে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট হবে? কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। ওটা বড়লাটের নিয়ন্ত্রণাধীনই থাকবে, নেহরু-নামক প্রধানমন্ত্রীর নয়। প্রধানমন্ত্রী পদটাও কবিকল্পনা। বড়লাট বা মুসলিম লীগ কেউ সেটা মেনে নেবে না। ঊর্ধ্বতন দায়িত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই থাকবে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নয়। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে আইনসভা কাউকে পদচ্যুত করতে পারবে না। বড়লাট অসন্তুষ্ট হলে কিন্তু তা করতে পারবেন। আর মুসলিম লীগকেও মাশুল জোগাতে হবে। রকমারি মাশুল। নয়তো ওরা সহযোগিতা করবে না। ওরা সহযোগিতা না করলে বড়লাট কংগ্রেসকেই বলবেন ওদের মানভঞ্জন করতে। বাপু, কী করবেন? জবাহর আর আজাদকে টেনে রাখবেন না যেতে দেবেন? ভিতরে-ভিতরে এটা গান্ধী বনাম জিন্না। বাইরে থেকে মনে হয় ব্রিটেন বনাম ভারত।"

মিলির অনুরোধে নয়, মুস্তফাফীদের অনুরোধেই ওরা তাঁদের ওখানে থাকে। আশ্রমে ওদের জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হলে সেখানে উঠে যাবে।

মুস্তফাফীরা প্রত্যেক শুক্রবারে রিসিভ করতেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বৈঠকখানায় আসতেন শহরের গণ্যমান্য উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক আর সরকারি কর্মচারী। সব-রকম বিষয়েই আলাপ-আলোচনা হত।

রায়বাহাদুর বাসুদেব হালদার বলেন, "কেবল ইংরেজদের সঙ্গে নয়, মুসলমানদের সঙ্গেও একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক চাই। যেটা শাসক-শাসিতের নয়, শোষক-শোষিতের নয়, উচ্চ-নীচের নয়। স্বাধীকার করতেই হবে যে ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যে সমানভাব প্রত্যাশা করি অথচ পাইনে, আমাদের কাছ থেকে মুসল-মানরাও সেই সমানভাব প্রত্যাশা করে অথচ পায় না। তাই মুসলিম লীগের প্রথম শর্ত হল তাকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমান মর্যাদা আর সমান ওজন দিতে হবে। যাকে বলে প্যারিটি। কিন্তু তার মানে দাঁড়াচ্ছে একই সিংহা-সনে দুই রাজা। যার নাম দ্বৈরাজ্য। ব্রিটিশ রাজের দুই উত্তরাধিকারী সমান ক্ষমতা এবং দায়িত্ব নিয়ে একই সিংহাসনে বসবে—এটা কী করে সম্ভব? সঙ্গে-সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে না? দারা শিকো বনাম আওরঙ্গজেব। আধুনিক আওরঙ্গজেবের সামর্থ্য থাকলে তিনি আধুনিক দারা শিকোকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে সমগ্র সাম্রাজ্য অধিকার করতেন। তেমন সামর্থ্য নেই জেনে ছয়টা প্রদেশের বিপরীতে ছয়টা প্রদেশ দাবি করছেন। এটাও একপ্রকার প্যারিটি। গান্ধীজীর কথা শুনে মনে হয় তিনি বিনা দ্বন্দ্বে ছয়টা প্রদেশ ছেড়ে দেবেন, কিন্তু একটি শর্তে। সোভরেনটি থাকবে ঊর্ধ্ব-তম স্তরে ফেডারল গভর্নমেন্টের হাতে। সে তিনটিমাত্র বিষয় পরিচালনা করবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগা-যোগ। জিন্না সাহেবের এতে প্রবল আপত্তি। সোভ-রেনটি তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। তা হলে গিভ অ্যান্ড টেক হয় কী করে? গিভ অ্যান্ড টেক বিনা কি কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্ভবপর? কংগ্রেস-লীগ চুক্তি না হলে কংগ্রেস-লীগ সংঘর্ষ রোধ করবে কে? ইংরেজ? ইংরেজ কি চিরস্থায়ী? ওরা তো এখন যাই-যাই করছে।"

এর উত্তরে সৌম্য মুখ খোলে। "গান্ধীজী তো একথাও বলছেন যে, হয় কংগ্রেসকে নয় লীগকে কেন্দ্রের ভার দিয়ে ওরা এক্সিন বিদায় হোক।"

প্রথ্যাত উকিল মোহিনীমোহন ধর রাজনীতিতেও ধুরন্ধর। তিনি চোখ বুজে শুনছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার মতো তুখোড় পলিটিসিয়ান এদেশে আর জন্মায় নি। গান্ধী চলেন ডালে-ডালে তো জিন্না চলেন পাতায়-পাতায়। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আশ্বাস না পেলে হ্রস্বমেয়াদি সমাধানে তাঁর আগ্রহ নেই। পাকি-স্তান হবে কি না সেইটেই প্রথম কথা। ইনটারিম গভর্নমেন্ট তার পরের কথা। আর পাকিস্তান বলতে তিনি কেবল সেপারেট নয়, সোভরেন স্টেটও বোঝেন। বাঙলা হবে তার একটা প্রদেশ। আসামও আরেকটা। সেটাও নাকি মুসলিম লেনিনের অংশ। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি ধাধিয়ে ফেলেছেন। ইংরেজরা শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পক্ষপাতী। অশান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কংগ্রেসও চায় না। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি বলে, আমরা পাকিস্তানের জন্যে লড়তে তৈরি, মরতে না লাখে-লাখে হিন্দু মুসলিম শিখ, তা হলে অশান্তির চূড়ান্ত হবে। এই নির্বাচনেই তো দেখা গেল মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্র মুসলিম লীগের জয়জয়কার। 'জবরের যম জারমলীন। হিন্দুর যম নুরুদ্দীন। নুরুদ্দীনকে ভোট দিন। পাকি-স্তান জিতে নিন।' বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগের জয়। কৃষক-প্রজার জামানত বাজেয়াপ্ত। জিন্না সাহেব এখন থেকেই পাকিস্তানের বাদশা বনে বসে আছেন। অশান্তিকে তিনি ডরান না। জেহাদ বলে একটা অস্ত্র আছে তাঁর হাতে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের চেয়ে ঢের বেশি জোরালো। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক ধর্মের জন্যে তারা প্রাণ নিতে প্রস্তুত। গান্ধীজীর পরা-মর্শে সারা ভারত যদি লীগের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজরা বিদায় হয় তা হলে তার পরের দিনই পানি-পথের যুদ্ধ। হিন্দু মহাসভা অখণ্ড ভারতের জন্যে লড়বে। দিন-দিন তারও প্রভাব বাড়ছে। সমান ভায়ো-লেনট। আওরঙ্গজেব বনাম শিবাজী।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে না। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সেও আঁচতে পারছে হিন্দু-মুসলমানের জঙ্গী মনোবৃত্তি। হিন্দুদের সংখ্যার জোর কম, তাই দাপট কম, নইলে তারা যে অহিংসার পূজারী, তা নয়। সে সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী। গৃহযুদ্ধের বিরোধী তো বটেই। কিন্তু আর-একটা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করার মতো দম তার বা তার সহকর্মীদের নেই।

গৃহকর্তা ক্যাপটেন মুস্তফাফী বিতর্কে যোগ দেন। "এর কোনো সামরিক সমাধান নেই, মোহিনী। তোমরা নেতারা একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করো। ক্যাবিনেট মিশনও তারই অন্বেষণ করছে। আমার জামাতা সুকুমারের মুখে শুনেছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আটলি স্বয়ং ভারত সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার নিয়েছেন। ভারত-সম্পর্কিত ফাইল এখন তাঁর নিজের দেরাজে। কাউকে জানতেই দিচ্ছেন না ব্রিটেন কী করবে না করবে। তবে গান্ধীকে তিনি পছন্দ করেন না, গত মহাযুদ্ধের সময় গান্ধী ইংরেজদের পিঠে ছোরা মেরেছিলেন। জিন্নাকেও তিনি আশকারা দিতে চান না। জিন্নার অস্ত্র জেহাদ নয়, ভাঁটো। সে অস্ত্র অ্যাটলি সাহেব জিন্নার হাতে থাকতে দেবেন না। জিন্নাও কিছুদিন পরে টের পাবেন যে ইংরেজ তাঁর খেলা খেলবে না, তাঁকেই ইংরেজের খেলা খেলতে হবে। মান অভিমান বৃথা।"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "দ্যাখো, কালীকৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে নেতা বলে লজ্জা দেয় না। আমার কৃষক-প্রজা দল তো গোহারান হেরেছে। লোকের মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে। যেখানে অবজেকটিভ চেনজ সম্ভব নয় সেখানে সাবজেক-টিভ চেনজ দিয়ে পরিস্থিতিকে শান্ত করতে হয়। অব-জেকটিভ চেনজ বলতে বুঝি ভূমিহীনকে ভূমিদান, কর্মহীনকে কর্মদান, মুদ্রাস্ফীতিনিরোধ, ধনিকদের উপর বধিত কর। ইংরেজ কর্তাদের দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় বস্তুগত পরিবর্তন হবে না, ওঁরা সেটা উপলব্ধি করে-ছেন। আর সাবজেকটিভ চেনজ বলতে বোঝায় ক্ষমতার হস্তান্তর। ইংরেজরা এখন এর জন্যে তৈরি। তারা জানে এখন যদি যায় মানে-মানে যাবে। দেরি করলে মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। জট খুলতে পারবে না। শত কয়েক ইংরেজ প্রাণে মরতেও পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল শ্রীরাধা যেমন বলেছিলেন, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? ভারত হেন সাম্রাজ্য কাকে দিয়ে যাব? কংগ্রেসকে? না, কংগ্রেসকে ষোলো আনা কিছুতেই নয়। মুসলিম লীগকে? না, মুসলিম লীগকে হিন্দুপ্রধান বা শিখপ্রধান অঞ্চল কখনো নয়। তা হলে কি পার্টিশন? পার্টিশন হলে কেবল ভারতের কেন? বাঙলার নয় কেন?

পানজাবের নয় কেন? সেরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে দুই বা তিন পক্ষের সম্মতি নিতে হবে। উপর থেকে চাপিয়ে দিতে গেলে বিপত্তির অবধি থাকবে না। পক্ষপাতের অভিযোগ উঠবে। হিন্দু মুসলিম শিখ আলাদা-আলাদা করে ইংরেজদেরই পদাঘাত করে তাড়াবে। নেগোশিয়েশন ফেল করলে ইংরেজদের সর্বনাশ, অথচ কংগ্রেস-লীগের পৌষমাস নয়। এই দুই দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া দরকার। তার জন্যে যদি সালিশ করতে হয় এই অধমকে ডাকলে এই অধম দোরে-দোরে গিয়ে পায়ে ধরে সাধতে রাজি। শিখদের আমি চিনি নে। কিন্তু অন্য দুই পক্ষকে চিনি। একদা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলুম। জিন্নার ইনডিপেনডেন্ট পার্টির মেম্বর। সেদিনকার সেই প্রীতির সম্পর্ক আর নেই। তিনি সেই দল ভেঙে দিয়ে আইনসভায় মুসলিম লীগ দল গড়ায় আমিও ছিটকে পড়ি। কেন্দ্রে নয়, বাঙলার আইনসভায় আমার দল হয় কৃষক-প্রজা দল। তবু পরিচয় দিলে জিন্না নিশ্চয়ই চিনবেন। কংগ্রেসেও এককালে ছিলুম। তার পর সি. আর. দাশের স্বরাজ পার্টিতে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমি না ঘরকা না ঘাটকা। সকলের সঙ্গে কথা বললে তবেই তো বুঝতে পারব কোন্ সমাধানটা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। এক-পক্ষ নিলে অপরপক্ষ নিল না, এমন যদি হয় তবে আমিও তো ব্যর্থ।"

বাসুদেব হালদার হাসেন। "সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ইংরেজরা যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে তবে আরো অর্ধ শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন অপেক্ষা করা ওদেরও মত নয়, আমাদেরও মত নয়। চেনজ একটা চাইই চাই। তার জন্যে চাই একটা রাজনৈতিক সমাধান। সেটা যে আদর্শ সমাধান হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো। ষোলো আনা কোনো পক্ষই পাবে না। লড়াই করলেও না। বুদ্ধিমানের কাজ গিভ অ্যান্ড টেক। সেটা যেভাবেই হোক। ক্ষমতাভাগও হতে পারে। দেশভাগও হতে পারে। প্রদেশভাগও হতে পারে।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে। "না, না, দেশভাগ নয়। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অবিভাজ্য। না, না, প্রদেশভাগ নয়, বাঙলার ভাষা, বাঙলার সংগীত অবিভাজ্য। ক্ষমতাভাগে আমার আপত্তি নেই। ক্ষমতাভাগ কেন, ক্ষমতার সবটাই নিক না মুসলিম লীগ। ক্ষমতা মানেই দায়িত্ব। দায়িত্বকে ভাগ করতে পারা যায় না। মুসলিম লীগ এককভাবেই নিক বাঙলাদেশে সরকার গঠনের দায়িত্ব। অবিচার, অত্যাচার দেখলে আমরা সত্যাগ্রহ করব। এমন ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করব যে মুসলমানদের একভাগও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সরকারের ভুল নীতি বানচাল করে দেবে। আমার কাছে বিরোধিতা করার অধিকারটাই গৌরবের। বিরোধিতা অবশ্য কথায়-কথায় নয়। মূল-নীতির প্রশ্নে। যেখানে সরকার গঠনের দায়িত্ব কংগ্রেস নিয়েছে সেখানে মূলনীতির প্রশ্নে সত্যাগ্রহ করার অধি-কার মুসলিম লীগেরও রয়েছে। আমিই তখন লীগের পক্ষ নিয়ে সত্যাগ্রহে নামব। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষেরও মর্যাদা অনেক। মুসলীম লীগ সেই মর্যাদা লাভ করবে কেন্দ্রীয় আইনসভায়, বহুসংখ্যক প্রাদেশিক আইন-সভায়। তেমনি কংগ্রেসও কয়েকটি প্রাদেশিক আইন-সভায়। তবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়েক বছর অন্তর-অন্তর পালাবদল হয়। বিরোধী-পক্ষ হয় সরকার-পক্ষ। সরকার-পক্ষ হয় বিরোধী-পক্ষ। তাই দুই পক্ষেরই স্বার্থ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে বলবৎ রাখা। আমাদের দেশে সেটা কিন্তু ব্যাহত হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতির দ্বারা। তার বদলে যদি যৌথ নির্বাচনপদ্ধতি থাকত, স্বতন্ত্রনির্বাচনির্ভর মুসলিম লীগ গড়ে না উঠে যৌথ-নির্বাচনির্ভর ইউনিয়নিস্ট পার্টি গড়ে উঠত এবং সে পার্টি একদিন কংগ্রেসের মতো হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র ভোটে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করত। কনস্টি-টুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্রথম কাজ হবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন। তখন জিন্না সাহেব আবার ইনডিপেনডেন্ট পার্টির মতো একটা মিশ্র দল পত্তন করবেন আর হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টানের ভোটে জিতে সরকার গঠন করবেন। কংগ্রেস কি চির-স্থায়ী? এর উৎপত্তি হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অপোজিশন হিসাবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মহাপ্রস্থানে গেলে কংগ্রেসও মহাপ্রস্থানে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে নয়, পাঁচ দশ কি বিশ বছর বাদে। কংগ্রেস সরকারের বিরোধী-পক্ষই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিয়ে সরকার গঠন করবে। এমনও হতে পারে যে কংগ্রেসই দুভাগ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে দুর্বল, কিন্তু বৃদ্ধদের মৃত্যু বা অবসরগ্রহণের পর তারাই প্রবল হবে। আমার তো বিশ্বাস এই অধ্যায়ের শুরু হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে। সেই স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই ধাপে-ধাপে এসেছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। তবে ইংরেজরা বোধহয় ভাবতেই পারে নি যে তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির পরিণাম হবে ডিভাইড অ্যান্ড কুইট। তারা কুইট করতে চায় করুক, নয়তো আরো কিছুকাল থেকে আবার এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হোক। কিন্তু ডিভাইড করতে হয় ওদের বিদায়ের পর আমরাই ভাইয়ে-ভাইয়ে করব, ওরা নিরপেক্ষ সেজে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে কেন? আমি বিশ্বাসই করি নে যে ওরা ব্যালান্স অভ পাওয়ার নিজেদের হাতে রাখবে না। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে একটা দোনোমনো ভাব আছে। গান্ধীজী কিন্তু অটল ও অনড়। পাকিস্তান দিতে হয় আমরাই দেব, ইংরেজরা নয়।"

মোহিনীবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। তা নয়। তিনি চাঙ্গা হয়ে বলেন, "জিন্না মানুষটি যে কত বড়ো তুখোড় পলিটিসিয়ান তার ধারণাই নেই গান্ধী মহারাজের। হবে কী করে? তিনি কি সত্যাগ্রহ আর গঠনকর্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়ে মাথা খাটিয়েছেন? তিনি যেমন সত্যাগ্রহ আর গঠনকর্মে বিশেষজ্ঞ জিন্না তেমনি পারলামেনটারি আর কনস্টিটিউ-শনাল স্পেশিয়ালিস্ট। তিনি এই নিয়ে লেগে আছেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। গান্ধী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আজাদ, নেহরু—এঁরা তাঁর তুলনায় অ্যামেচার। ধরো, মুসলিম লীগ যদি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বয়কট করে তবে কংগ্রেস কি মেজরিটির ভোটে সেপারেট ইলেক-টোরেট তুলে দিয়ে জয়েন্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তন করতে সাহস পাবে? দেশময় দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যাবে না? কে থামাবে যদি ইংরেজরা না থামায় বা থামাবার শক্তি রাখে? মুসলমানরা যেদিন একবাক্যে বলবে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন চাই নে, যৌথ নির্বাচন চাই, সেদিন এ আপদ যাবে। কিন্তু সেটা হবে পাকিস্তান অর্জনের পর তার কুফল দেখে। তার আগে নয়। আপাতত মুসলিম লীগ যদি শাসনতন্ত্র রচনায় সহযোগিতা না করে তবে শুধুমাত্র মেজরিটির ভোটে বিরাট কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। কারণ কংগ্রেসের মেজরিটি হচ্ছে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে হিন্দু মেজরিটি। একটা সম্প্রদায় কখনো আরেকটা সম্প্রদায়ের নিয়তি নির্ধারণ করতে পারে না। করতে গেলে গৃহযুদ্ধ অবধারিত। তবে একবার পাকি-স্তান স্বীকার করে নিলে দুই সম্প্রদায়ে মিলে একটা আপসে পৌঁছতে পারে। জিন্না বার-বার সেই কথাই বলে আসছেন। আপস মানে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন। কংগ্রেসের মন মেজাজ যতদূর আমি বুঝি, সে কারো সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজি হবে না, যদি না কংগ্রেস হাই কমান্ডের পরামর্শ অনুসারে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীরা কাজ করেন। মুসলিম লীগেরও একটা হাই কমান্ড হয়েছে। সে তাতে নারাজ। দুই হাই কমান্ডের গুঁতোগুঁতিতে কোয়ালিশন সরকার ছত্রভঙ্গ হবে। আর কোথায়ও না হোক বাঙলাদেশে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট করতে পারা যেত। কিন্তু পারা যাবে না। কারণ কংগ্রেস হাই কমান্ড বা লীগ হাই কমান্ড—কোনো পক্ষই তাঁদের কনট্রোল ছাড়বেন না। এই অধমের উপর যদি ভার দেওয়া হত, এই অধম সালিশি করতে এগিয়ে যেত। কিন্তু এই অধম এখন সর্বদলপরিত্যক্ত। তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখব কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে দাঁড়ালে কেউ আমাকে ভোট দিয়ে সেখানে পাঠায় কি না। জিন্নার সঙ্গে আমার যেমন যোগাযোগ বাঙলাদেশে আর কারো তেমন নয়। আর জিন্নাই যে নাটের গুরু, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, সৌম্য। নাটের গুরু ভালোর জন্যেও বটে, মন্দের জন্যেও বটে। সেবার লখনউতে কংগ্রেস-লীগ প্যাকট হয়েছিল তিলক আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। এবারও সেই-রকম একটা প্যাকট হতে পারে রাজাজী আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। রাজাজীর সঙ্গেও এই অধমের প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু এখন তাঁর দুর্দিন যাচ্ছে। তিনি কুইট ইনডিয়া আন্দোলনে যোগ দেন নি বলে মাদ্রাজের প্রাদে-শিক গভর্নমেন্ট গঠন করার সময় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নি। অথচ তিনিই তো সর্বপ্রথম পদত্যাগ করে-ছিলেন। কোথায় কৃতজ্ঞতা! রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো পদার্থই নেই। মহাত্মারও একদিন সেই দশা হবে।"

সৌম্য বৈরাগ্যের সঙ্গে বলে, "তিনি রাজক্ষমতা চান নি, চানও না।"

এতক্ষণ বাদে মৌনভঙ্গ করেন অধ্যাপক মাহমুদ শরীফ। "কায়দে আজম জিন্নাহ্ সাহেবও কি ক্ষমতা

চেয়েছেন না চান? তিনি চান সমতা। হিন্দু-মুসলমানের সমতা, কংগ্রেস-লীগের সমতা, হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের সমতা, গান্ধী-জিন্নাহ্‌র সমতা। কংগ্রেস নেতাদের কাছে লিবার্টিই সবচেয়ে কাম্য। লীগ নেতাদের কাছে ইকুয়ালিটিই সবচেয়ে কাম্য। এই যে পাকিস্তানের দাবি, এটা প্রকৃতপক্ষে সমতার দাবি। স্বরাজের দাবি যেমন স্বাধীনতার, পাকিস্তানের দাবি তেমনি সমতার। ইংরেজরা বিদায় নিলে স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু সমতা আসবে না, যদি না পাকিস্তানের রূপ ধরে আসে। তার মানে এক নেশন নয়, দুই নেশন। সমতার প্রয়োজন আছে এটা যদি মেনে নেন, তা হলে পাকিস্তানের প্রয়োজন আছে এটাও মেনে নিতে হবে। সমতার খাতিরেই বাঙলাদেশকে পাকিস্তানের শামিল করতে হচ্ছে। বাঙলাদেশ হবে পূর্ব পাকিস্তান, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাঙালিস্তান নয়। সমতার প্রয়োজন না থাকলে এর মতো ধোঁকাবাজি আমরা সহ্য করতুম না। এখনো সময় আছে, এখনো দেশভাগ নিবারণ করা যায়, কিন্তু কংগ্রেসের নাছোড়বান্দা মনোভাব আর মুসলিম লীগের যুদ্ধং দেহি মনোবৃত্তির ফলে দেশ যদি সত্যি-সত্যি ভাগ হয়ে যায় তবে স্বাধীনতাও আসবে, সমতাও আসবে, কিন্তু আসবে না মৈত্রী। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার একটি বাদ পড়বে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বৈরী হয়েই কে জানে কতকাল কাটবে। দেশ একবার ভাগ হয়ে গেলে আবার একদিন জোড়া লাগবে, এটা একটা দিবাস্বপ্ন। একাকার করার জন্যে একটা রাষ্ট্র হাতিয়ার শানালে অপরটাও হাতিয়ার শানাবে। বলপরীক্ষায় হিন্দুস্থান জিতবে, পাকিস্তান হারবে, এমন সম্ভাবনা দেখলে ব্রিটেন ছুটে আসবে হস্তক্ষেপ করতে। পাকিস্তান একবার হলে বরাবরের জন্যেই হল মনে রাখবেন। তৃতীয় পক্ষ যতদিন থাকবে দেশভাগও ততদিন থাকবে। ভারত ছেড়ে যাওয়া মানে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া নয়। ইংরেজকে দুনিয়া ছাড়াতে পারে এত শক্তি কংগ্রেসের বা হিন্দুর বা হিন্দুস্থানের নেই। গান্ধীজী আর তাঁর অহিংসা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, কিন্তু একাকার করতে পারে না। অন্তত এখনো তা পারে নি। একাকার যে এখনো রয়েছে, এটা তৃতীয় পক্ষের কল্যাণে। তবে একাকার করাই যদি শ্রেয় হয় তবে কায়দে আজমের সঙ্গে সমানে-সমানে এগ্রিমেনট করতে হবে। একপক্ষ মেজরিটি, অপরপক্ষ মাইনরিটি—এটা এগ্রিমেনটের মূলসূত্র নয়। আমরা আজকাল নিজেদের আর ইনডিয়ান ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে ভাবি নে। আমরা পাকিস্তানি ন্যাশনাল মেজরিটি। এটা একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন। আপনারা এখনো ভাবছেন যে আপনারা ইনডিয়ান ন্যাশনাল মেজরিটি। আপনাদের চিন্তার বিবর্তন হয় নি। প্যারিটিই হচ্ছে পাকিস্তানের বিকল্প। আমরা যদি সারা ভারতে প্যারিটি পাই তা হলে পাকিস্তানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হব না। পাকিস্তানে সারা ভারতের সব মুসলমানের লাভ হবে না। যারা হিন্দুস্থানে থাকতে চাইবে বা থাকতে বাধ্য হবে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আর আমরা বাঙালি মুসলমানরাও যে অবাঙালি মুসলমানদের সর্ব ঘটে দেখে সুখী হব, তা নয়। আপিস আদালত, দোকান বাজার, কারখানা, চাষের জমি ভরে যাবে তাদের মাইগ্রেশনে। পাকিস্তানের পক্ষে তারা ভোট দিয়েছে, তাদের মাইগ্রেশনের অধিকার আছে। সবচেয়ে বড়ো বৈষম্য হবে যদি পূর্ব পাকিস্তান বলতে বোঝায় কেবল পূর্ববঙ্গ ও আশা করি কংগ্রেসও চাইবে না। চাইলে কিন্তু বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমান উভয়েরই ঘর ভেঙে যাবে। বাঙালি জাতীয়তার বনিয়াদ ধ্বসে যাবে।"

সিভিল সারজন বীরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী উত্তেজিত হয়ে বলেন, "আপনারা দেখছি গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়োবেন। মুসলমান হিসাবে পাকিস্তান আর বাঙালি হিসাবে সমগ্র বাঙলাদেশ। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে কত লোক ফাঁসি গেল, আন্দামানে গেল, জেলে গেল, বেত খেল, জরিমানা দিল। তার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। এখন সারা বাংলার তখতে আপনারাই রাজা হয়ে বসেছেন তাতেও সন্তুষ্ট নন, গোটা বাংলাদেশকে স্টেপিং স্টোন করে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করতে চান। বঙ্গভঙ্গ রদ করে আমরা বিহারে ঠকে গেছি, ওড়িশায় ঠকে গেছি, আসামে ঠকে গেছি, বাঙলাদেশেও ঠকে গেছি। কোনোখানেই একজন বাঙালি হিন্দু প্রধানমন্ত্রী নেই। বাঙালি হিন্দু অফিসার ক্লাস এখন অনাথ।"

মুস্তাফী তাঁকে শান্ত করে বলেন, "দেখুন, ডাক্তার সাহেব, বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে বাঙালি হিন্দু অন্য দিক দিয়ে ঠকে যেত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে একটা মতবাদ গড়ে উঠত না। সাহিত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, ইন্ডাস্ট্রি, শিক্ষাদীক্ষা—কত দিক দিয়ে কত প্রগতি হয়েছে ভেবে দেখবেন। এই যে আজ বাঙালি মুসলমানের মুখে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব শুনছেন এটাও সেই আন্দোলনের সুফল। তবে এঁদের দোটানা এখনো যায় নি, এঁরা ইসলামের প্রতি আনুগত্য আর মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য—দুই আনুগত্যের মধ্যে দোল খাচ্ছেন। এটা একটা সাইকোলজিকাল কেস। এটাকে সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতা দিয়ে বোঝানো যায় না। কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করলে পরে এঁদের দোটানা কেটে যাবে। তখন দেখবেন এঁরাও সমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী। দুঃখের বিষয়, তার জন্যে হয়তো আবার বঙ্গভঙ্গের দরকার হবে। আমার মেয়ে মিলি এখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।"

"মধুমালতীর পক্ষে ওটা একটা ডিফিট।" মোহিনীবাবু বলেন। "বাঙালি হিন্দুদের পক্ষেও, ওদের দাবি যদি হয় কার্জনের প্রেতকে জীয়ানো। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একটা পুরনো বোতল। এর মধ্যে একটা নতুন মদ এসে ঢুকেছে। ইনডিয়ান ন্যাশনালিজম। ইনডিয়ান ন্যাশনালিস্টরা যখন আট-আটটা প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনে জিতে মন্ত্রিত্ব নেয় তখনি আমার বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। যেখানে নবাব-বাদশারা রাজত্ব করেছেন সেখানে গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম জনমত সহ্য করবে! এর পরের ধাপ তো দিল্লীর লাল কেল্লায় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। মুসলিম জনমত ফেটে পড়বে না? সেটা বন্ধ না করতে পেরে তারা করবে স্বাধীনভাবে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে চাঁদ-তারা-মার্কা সবুজ নিশান উড্ডয়ন। তার জন্যে করতে হবে পাকিস্তান হাসিল। হয় কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে, নয় ইংরেজের সঙ্গে যুক্তি করে, নয় গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে রাস্তায়-রাস্তায় লড়াই করে। ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড টমসনকে জিন্না সাহেব একথা বলেছেন। কথাটাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। জিন্না একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান।"

মুস্তাফী হাত জোড় করে বলেন, "আপনারা কেউ না খেয়ে যাবেন না। মিলির বন্ধু জুলির আজ রান্নার পরীক্ষা। ওর মাসিমা ওকে শেখাচ্ছেন।"

ষোলো

যাঁরা যাবার কথা ভাবছিলেন তাঁরা খাবার কথা ভেবে জাঁকিয়ে বসেন।

ডাক্তার নিয়োগী অধ্যাপক শরীফের দিকে চেয়ে বলেন, "হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব কে না চায়! কিন্তু তার জন্যে হিন্দুকেই দাম দিতে হবে, মুসলিমকে নয়, এ কেমন কথা! প্যারিটি চ্যারিটি নয়। দরাদরির ব্যাপার। দরাদরির জন্যে সরাসরি কথাবার্তা চালাতে হয়। তৃতীয় পক্ষকে মাঝখানে রেখে সরাসরি কথাবার্তা হয় না। আর প্যারিটি বা চ্যারিটি সেই তৃতীয় পক্ষ অনিচ্ছুকের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। হিন্দুদের উপর জোরজুলুম করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আজ ইংরেজদের নেই। তারা এখন চাচার মতো আপন প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। আর গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে রাস্তায়-রাস্তায় লড়াই করার হুমকি যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা যদি তুখোড় পলিটিসিয়ান হয়ে থাকেন তবে তাঁদের জানা উচিত যে শ্মশান ও গোরস্থানের মধ্যে প্যারিটি হলে ন কোটি হিন্দু আর ন কোটি মুসলমান ফৌত হবে। তার পরেও বাইশ কোটি হিন্দু বেঁচে থাকবে, কিন্তু একটিও মুসলমান বেঁচে থাকবে না। যদি না ইংরেজরা তাদের পক্ষ নেয়। কিন্তু পক্ষ নিলে ইংরেজও তো কয়েক হাজার মরবে। সে রকম মরণস্পৃহা কি তাদের কারো আছে! হিন্দুরা আর শিখেরা তাদের জন্যে জারমানদের সঙ্গে, ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে। জাপানিদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বন্দী হয়েছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে আবার হয়তো ইংরেজদের পক্ষে লড়বে। তাদের শত্রু করে ইংরেজদের কী লাভ। জিন্না সাহেব যদি হুমকি দেবার সময় মনে-মনে ধরে নিয়ে থাকেন যে ইংরেজরা তাঁর হয়ে হিন্দু আর শিখদের সঙ্গে লড়বে তা হলে তিনি তাঁর ব্রিজ খেলার পার্টনারের হাতে কী কী তাস আছে তা না জেনে নিজের হাত দেখেই ওভারকল করছেন। যারা তুখোড় খেলোয়াড় তারা ওভারকল করে না। তিনি হয়তো এটাও ধরে নিয়েছেন যে অহিংসাবাদী গান্ধী অনশন-টনশন করে হিংসাবাদী হিন্দুদের বিরত করবেন। অমনি করে মুখরক্ষা আর শেষরক্ষা হবে। কিন্তু জেহাদ যারা শুরু করবে তারা অত সহজে সেটা থামাতে পারবে না। হিটলার পারে নি, তোজো পারে নি। থামবে যখন তখন দেখা

যাবে যে লক্ষ-লক্ষ হিন্দু মুসলমান শিখ নিহত হয়েছে। আরো বেশি প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে একটা সীজ ফায়ার হয়েছে। সীজ ফায়ারের সময় যা হয়। এ পক্ষও কিছু রেখেছে, ও পক্ষও কিছু রেখেছে। সেই পর্যন্ত পাকিস্তানের সীমানা, হিন্দুস্থানের সীমানা। কোনো পক্ষই তাতে বিশেষ লাভবান হবে না। পরে আবার একহাত লড়বার জন্যে মনে-মনে তৈরি হবে। সেটা আর যাই হোক অহিংস নয়। গান্ধীর দিন গেছে। জিন্নাকে মোকাবিলা করতে হবে জবাহরলালের সঙ্গে।"

অধ্যাপক শরীফের মুখ শুকিয়ে যায়। মুস্তাফী বলেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ক্যাবিনেট মিশন এসেছেন তিন পক্ষের গ্রহণযোগ্য সমাধান বার করতে। সকলের সঙ্গেই তাঁরা কথা বলছেন। সকলেই চায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইংরেজদের দিক থেকে আমি তো ইচ্ছার কোনো অভাব দেখছি নে। কংগ্রেস নেতারাও ইচ্ছুক। লীগ নেতারাও তাই। দেশের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। আরো কিছুদিন পরে আরো ঠান্ডা হবে। তবে পুরোপুরি নরমাল হবে বলে মনে হয় না। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ আজ উদ্‌ভ্রান্ত। কি হিন্দু, কি মুসলমান।"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে কী ভাবছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাঁকে আমি ভালো করেই চিনি। পাকিস্তানের উদ্ভাবক চৌধুরী রহমত আলী লন্ডনের এক রেস্টোরান্টে এক ভোজ দেন, তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন হলেন ইকবাল, আরেকজন জিন্না। পাকিস্তানের প্রস্তাব জিন্না সাহেব সরাসরি খারিজ করে দেন। ওটা অবাস্তব। তা হলে এমন কী ঘটল যে সেই জিন্নাই বছর পাঁচেক বাদে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন? এর উত্তর নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে গিয়ে দেখা গেল কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে একক মেজরিটি পেয়েছে, আরো দুটি প্রদেশেও সে লীগকে সঙ্গে না নিয়েও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করতে পারে। কোন্ দুঃখে সে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে চাইবে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হলে সে বরং পদত্যাগ করে বনবাসে যাবে তবু মুসলিম লীগের শর্তে রাজি হবে না। শাসনতন্ত্রের অনুশাসন অনুসারে প্রতি ক্ষেত্রে মাইনরিটিদের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। জিন্না আশা করেছিলেন যে মাইনরিটির প্রতিনিধি একমাত্র মুসলিম লীগ থেকেই নেওয়া হবে আর গভর্নররাও সেই নির্দেশ দেবেন। দেখা গেল, কংগ্রেস তার নিজের দল থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়েছে। আর গভর্নররাও কংগ্রেসকে চটাতে সাহস পান নি, পাছে সে মন্ত্রিত্বই গ্রহণ না করে। মাস ছয়েক ধরে গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের যে পত্রব্যবহার চলে তার নীট ফল হয় কংগ্রেস হাই কমান্ডের বলবৃদ্ধি ও লাটসাহেবদের বলক্ষয়। এসব দেখে শুনে জিন্না সাহেব ফেডারেশনের উপরে বিশ্বাস হারান। রাজন্যরা যদি প্রতিনিধি মনোনয়ন না করেন, যদি তার পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠান, তা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলও কংগ্রেস এককভাবে গঠন করতে সমর্থ হবে, লীগের মুখাপেক্ষী হবে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সে নিজের দল থেকেই আহরণ করবে, লীগ যদি মুসলমানদের একমাত্র দল বলে স্বীকৃত না হয়। যেমন করে হোক, কংগ্রেস একাধিপত্য বানচাল করতেই হবে। জিন্না সাহেব তাই ফেডারেশন অগ্রাহ্য করে তার বদলে দাবি করেন দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। একটা হিন্দুদের, অন্যটা মুসলমানদের। এরাও মেজরিটি, ওরাও মেজরিটি। এরাও নেশন, ওরাও নেশন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তাধারা সহসা খাত বদলায়। তার মধ্যে একটা যুদ্ধং দেহি ভাবও আসে। টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেই ভাবটাই ব্যক্ত হয়। ইংরেজ চলে গেলে কংগ্রেস তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে—অসহ্য, অসহ্য এই নিয়তি। অপর উত্তরাধিকারী হবে মুসলিম লীগ, প্রয়োজন হলে ওয়ার অভ সাকসেসন লড়বে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগেছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস বা গান্ধী তাঁর দিকে মিটমাটের হাত বাড়িয়ে দেন নি। যুদ্ধের ইস্যুতে বনবাসে গিয়ে তাঁকে উপবাসী রেখে দেন। ভেবেছিলেন তাতে তাঁর বল কমে যাবে। বল কমে যাওয়া দূরে থাক, সবকটা প্রদেশেই বেড়েছে। কংগ্রেস মুসলিম এখন মুষ্টিমেয়। তাঁর বল এখন এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে তিনি ইংরেজদের ডিকটেট করতে পারেন। কংগ্রেসকে তো গ্রাহ্যই করেন না। প্রয়োজন থাকলেও কোয়ালিশনের জন্যে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না। পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হবে।"

সৌম্য আর স্থির থাকতে পারে না। বলে, "কংগ্রেস মুসলিমরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ধর্মে মুসলমান আর জন্মসূত্রে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদেরও ভূমিকা আছে, সে ভূমিকা এখনো শেষ হয় নি, যে-কোনো দিন আবার তাঁদের ডাক পড়তে পারে। আমরা কি তাঁদের প্রতি বেইমানি করতে পারি? লীগ বললেও না। বড়লাট বললেও না। ইনটারিম গভর্নমেন্টে এঁদের একজন না থাকলে কংগ্রেসও থাকবে না। মুসলিম লীগই গভর্নমেন্ট চালাক। কংগ্রেস অপোজ করবে না, লড়াই করা তো দূরের কথা। গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে রাস্তায়-রাস্তায় যদি হাতাহাতি মারামারি খুনোখুনি বাধে কংগ্রেস তার মধ্যে থাকবে না, সেটা থামাবার দায় দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, তবে মানবতার খাতিরে গান্ধীপন্থীরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত হতে বলতে পারেন। শুধু গান্ধীপন্থীদের কেন, মানুষমাত্রেরই কর্তব্য মানুষকে গুন্ডার হাত থেকে রক্ষা করা। পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে উদ্ধার করা। এক্ষেত্রে কে হিন্দু কে মুসলমান বাছবিচার করা অনুচিত। এমন মুসলমান নিশ্চয়ই আছেন যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে হিন্দুর প্রাণ বাঁচাবেন, হিন্দু নারীর ইজ্জত বাঁচাবেন। জিন্না সাহেবের থীসিসটা তো এই যে ইংরেজ চলে গেলে কংগ্রেস রাজ কায়েম হবে, সুতরাং মারো শত্রু পার যে প্রকারে। থীসিসটাই ভুল। দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না। কংগ্রেস যদি থাকে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করেই থাকবে। মিটমাটের জন্যে কংগ্রেসের দুয়ার সব সময়ই খোলা। তা না হলে গান্ধীজী জিন্না সাহেবের দুয়ারে সতেরো দিন ধরে ধরনা দিলেন কেন? কায়দে আজম যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করে ইংরেজের সঙ্গেই মিটমাট চান তাতেও কংগ্রেস রাজি হবে, যদি তার মূলনীতিতে ঘা না পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জেলখানায় ফিরে যাবে। কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে কংগ্রেসের মূলনীতির সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে হবে। কংগ্রেসের মেজরিটি হিন্দু মেজরিটি নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টানের মিলিত মেজরিটি। সাম্প্রদায়িক মেজরিটি নয়, রাজনৈতিক মেজরিটি। তেমন মেজরিটি জাতীয়তাবিরুদ্ধ তো নয়ই, গণতন্ত্রবিরুদ্ধও নয়। আর কংগ্রেসের সংগ্রামকেও মাইনরিটিবিরুদ্ধও বলা যায় না। কংগ্রেসপন্থীরা কখনো মুসলমানের গায়ে হাত দেয় নি, কখনো দেবেও না। কংগ্রেস মন্ত্রীদের গদিচ্যুত করার জন্যে লীগপন্থীরা অনেক কিছু বানিয়েছেন। ভবিষ্যতেও বানাতে পারেন। উদ্দেশ্যটা কী? কংগ্রেস মন্ত্রীদের আবার গদিচ্যুত করা? তার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত। তা না হয়ে উদ্দেশ্য যদি হয় ভদ্রভাবে মিটমাট, তা হলে কোয়ালিশনের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, পার্টিশনের জন্যে ঝগড়াঝাঁটি নয়।"

শরীফ সাহেব তারিফ করেন। "কোয়ালিশন লীগপন্থীরাও চায়। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে, লীগবহির্ভূত মুসলমানের সঙ্গে নয়। ওরা স্টুজ, ওরা কুইসলিং। মওলানা আজাদই বলুন, খান আবদুল গফ্‌ফর খানই বলুন, এঁরা কেউ সাচ্চা মুসলমান নন। হিন্দুর সঙ্গে মিটমাট একদিন না একদিন হবে, পাকিস্তানেও হিন্দু থাকবে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে কোনোদিন নয়। যদি না এঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে লীগে যোগ দেন। মুসলিম ইউনিটির খাতিরে সব মুসলমানকেই লীগের নিশানতলে সমবেত হতে হবে। তার পরেই হবে কোয়ালিশন অথবা পার্টিশন।"

সৌম্য আর কথা বাড়াতে চায় না। এই ফ্যানাটিকদের সঙ্গে তর্ক বৃথা। তখন রায়বাহাদুর খেই হাতে নেন। বলেন, "শরীফ সাহেব, এটা কি আপনারা ভেবে দেখেন নি যে ভারত ভেঙে দুখানা হলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ও ভেঙে দুখানা হবে? তা যদি হয় তবে মুসলিম ইউনিটি যাকে বলছেন তাই হবে মুসলিম ডিসইউনিটির নিদান। ভারতের সর্বনাশ তো হবেই। আপনাদের তাতে কী এসে যাবে? আপনারা তো ভারতীয় নন, আপনারা মুসলমান। কিন্তু ভারতের সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানেরও সর্বনাশ হবে। সেটা এখন নজরে পড়ছে না, হিন্দু আধিপত্যকে খর্ব করাই একমাত্র লক্ষ্য। জিন্না যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পাকিস্তান তিনি আদায় করবেনই। তার জন্যে নিজের এজমালি ঘরে আগুন দিতেও তাঁর হাত কাঁপবে না। কিন্তু সারা ভারতের সব মুসলমান যদি পাকিস্তানে জড়ো না হয় তো যারা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে তাদের দশা কী হবে? পাকিস্তানে তারা হবে বিদেশী। হিন্দুস্থানে তারা হবে

বিধর্মী'। সর্বত্র কৃপার পাত্র। জিন্না সাহেব পাকিস্তানে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাই কি সেখানে গিয়ে এখানকার ক্ষতিপূরণ পাবে? ব্যবসায়ীরা পাবেন ব্যবসায়, ব্যারিস্টাররা পাবেন প্র্যাকটিস, শ্রমিকরা পাবে কলকারখানার কাজ, কৃষকরা পাবে কর্ষণের জমি? বিশ্বাস হয় না, অধ্যাপক সাহেব। তার পর ভেবে দেখুন, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনো কারণে যুদ্ধ বেধে যায় মুসলমানের বোমা পড়বে মুসলমানের মাথায়। ধর্মভাই বলে সে রেহাই পাবে না। বোমা যে ফেলবে সে হিন্দু-মুসলমানে বাছবিচার করবে না। হিন্দু মুসলমান একই মহল্লায় না হোক, একই শহরে বাস করে। বোমা এত উপর থেকে ফেলা হয় যে তার লক্ষ্য শুধুমাত্র হিন্দু হতে পারে না। এমন একটিও শহর নেই যেটি মুসলিম-বিহীন। আজকের মুসলিম ইউনিট কালকের মুসলিম নিধনের পথ করে দেবে, যদি সেটা পার্টিশনের জন্যে আকাশ পৃথিবী তোলপাড় করে। আজাদ ও আবদুল গফফার খান মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু। কায়দে আজম জিন্না মুসলমানের নয়, মুসলিম লীগ নামক দলের শ্রেষ্ঠ নেতা।"

"মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু কে সে বিচার মুসলমানের উপরেই ছেড়ে দিলে ভালো হয়, রায় বাহাদুর।" শরীফ উত্তপ্ত হয়ে বলেন। "আজাদ যা পেয়েছেন তা হিন্দুর কাছ থেকে পেয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতির পদ। জিন্না যা পেয়েছেন তা মুসলমানের কাছ থেকে পেয়েছেন। লীগ সভাপতি পদ। বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফরের পতন ও কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নার উত্থান—এর মধ্যবর্তী যুগটা আমাদের গৌরবের যুগ নয়, আপনাদেরই গৌরবের যুগ। এখন আমরা যে মওকা পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করলে ভারতের অর্ধেক অথবা পাকিস্তানের গোটা সিংহাসন আমাদের হবে। মুসলমানের হাতে মুসলমান হয়তো একদিন মরবে, কিন্তু সেই ভয়ে পেছিয়ে গেলে চলবে না। লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম রাজত্বের রেস্টোরেশন। আমাদের নিন্দাবাদ না করে বরং এই বলে ধন্যবাদ দিন যে আমরা নিখিল ভারত দাবি করছিনে। রেস্টোরেশন চাইলেও পুরো মোগল সাম্রাজ্যের নয়। আপনাদের সঙ্গে সদ্ভাবের খাতিরেই দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, আলীগড় ত্যাগ স্বীকার করছি। কায়দে আজমের এই ত্যাগস্বীকার মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগস্বীকারের চেয়ে কম নয়। জেলে যাওয়াটাই কি ত্যাগ-স্বীকারের একমাত্র নিরিখ?"

"এতই যখন ত্যাগ করছেন", ডাক্তার নিয়োগী রাগ চেপে বলেন, "তখন কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গও ত্যাগ করুন।"

শরীফ সাহেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, মোহিনীবাবু কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "ওটা একটা আত্মঘাতী প্রস্তাব। বাঙলাদেশ দুভাগ হলে পশ্চিম ভাগটা হবে হিন্দুস্থানের ল্যাজ আর পূর্ব ভাগটা পাকিস্তানের ল্যাজ। যে প্রদেশ সারা দেশের মাথা ছিল তা কোনো অংশেরই মাথা হবে না। বাঙালি জাতির গোড়া কেটে আগায় জল দিলে সে কি দিন-দিন শুকিয়ে যাবে না? একেই বলে, রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। কারজনের আমলের এ দাওয়াই এত খারাপ ছিল না, কারণ কেন্দ্র ছিল একটাই, তার কাছে গিয়ে নালিশ করতে পারা যেত। এবার দেশ দুভাগ হয়ে দুই কেন্দ্র হবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে অত্যাচার হলে সে হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারবে না, কারণ সে সেখানে এলিয়েন। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেটাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করবেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে না। ছুটবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর কাছে সাহায্যের জন্যে। তখন আমরা কবির ভাষায় গাইব, এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে! না, ডাক্তার সাহেব, এ দাওয়াই আপনার উপযুক্ত হয়নি, এটা একটা হাতুড়ে দাওয়াই। এর থেকে মালুম হচ্ছে বাঙালির মস্তিষ্ক এখন দেউলে। বাঙালি বলতে আমি বাঙালি মুসলমানকেও বোঝাতে চাই। পাকিস্তানের জন্যে অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তারাও দেউলেপনার পরিচয় দিচ্ছেন। শরীফ সাহেব, আপনারা ভাবছেন আপনারা ও'দের ব্যবহার করছেন। তা নয়। ও'রাই আপনাদের ব্যবহার করছেন। আমি আবার বলি, জিন্না সাহেব একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান। তিনি আপনাদের এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন। এর মধ্যেই তিনি বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র হোমল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন আর ভুলিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রস্তাবটার উপর কলম চালিয়ে প্রদেশে পরিণত করেছেন। পাকিস্তানের প্রদেশে। পাকিস্তান হলে সেখানকার কেন্দ্র থেকে শাসক নিয়োগ

হবে। সে শাসক বাঙালি না হতেও পারেন। হিন্দুস্থানের মুসলিম অফিসারগণ দলে-দলে আসবেন পাকিস্তানে চাকরি করতে। আপনাদের সন্তানরা তো হিন্দুস্থানে চাকরি করতে পারবেন না। একেই বলে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচা।"

"আপনি তাহলে আমাদের কী চাইতে পরামর্শ দেন? দুই প্রান্তে দুই স্বতন্ত্র পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান? হিন্দুস্থান কি দুই পাকিস্তানকে দুই বগলে পুরবে না? দুই পাকিস্তানের এক হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।" শরীফ সাহেব বলেন।

"সেলফ-ডিটারমিনেশনের অধিকার আপনাদের আছে। আপনারা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু আমাদেরও কি সে অধিকার নেই? আমরাও কি সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারব না? আপনারা ভারতে মাইনরিটি হতে রাজি না হলে আমরাও পাকিস্তানে মাইনরিটি হতে নারাজ হব, প্রোফেসর শরীফ। আমরা চাইব কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ।" ডাক্তার সাহেব বলেন।

"তা হলে 'বন্দে মাতরম' মিথ্যা? 'বঙ্গ আমার জননী আমার' মিথ্যা? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' মিথ্যা? বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা লিখেছেন? তা নয়। আপনারাই ভুল করছেন। পাকিস্তানকে আপনারা অকারণে ভয় করছেন। পাকিস্তান হিন্দুর শত্রু নয়। আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন ছিল সিরাজউদ্দৌলার আমলে।"

তাপের মাত্রা বাড়ছে দেখে মুস্তাফী তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। সোমার দিকে ফিরে জানতে চান গান্ধীজী আজকাল নীরব কেন।

"তিনি আজকাল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এমন নিঃসঙ্গতা জীবনে অনুভব করেন নি। এমন একদিন ছিল যেদিন সমগ্র দেশে কংগ্রেসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আর কংগ্রেসের ভিতরে গান্ধীজীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সেদিন তিনি ভারতীয় প্রজাশক্তির একমাত্র প্রতিভূ হিসাবে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি আরউইনের সঙ্গে কথা-বার্তা চালিয়েছিলেন। তেমন দিন আর ফিরল না। কংগ্রেসের ভিতরেই দেখা গেল তাঁর কথার দাম কমে গেছে। ভোট নিলে হয়তো তিনিই জিততেন। কিন্তু তেমন জয় তিনি চান নি। তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও থাকবেন না। প্রতিনিধিত্বের দাবি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসকে তিনি ছাড়লেও কংগ্রেস কিন্তু তাঁকে ছাড়ে না। কম্‌লী নহিঁ ছোড়তি। কংগ্রেস নেতারা যখনি তাঁর পরামর্শ নিতে যান তখনি তিনি তাঁর পরামর্শ দেন। কিন্তু নিতে বাধ্য করেন না। লোকে ভাবে, তিনি একজন ডিকটেটর। কিন্তু ডিকটেটর যদি তিনি হয়ে থাকেন তবে সেটা নৈতিক বলে বলীয়ান মহাপুরুষের ডিকটেটরশিপ। সেটার পরিচয় মেলে সংগ্রামের সময়। তখন কংগ্রেস তাঁকে দেয় সেনাপতির ভূমিকা। শান্তির সময় কিন্তু তিনি আর সেনাপতি নন। তিনি পরামর্শ-দাতা। কংগ্রেসের হয়ে কথা বলার দায় তাঁর নয়, কংগ্রেস সভাপতির। গত ছ বছর ধরে মওলানা আজাদের। বড়-লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চান তবে আজাদকেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এখন দেশে কংগ্রেসের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরেও কংগ্রেস হাই কমান্ডের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী। সবচেয়ে বড়ো কথা, গান্ধীজীর সঙ্গেও কংগ্রেস নেতাদের পায়ে পা মিলছে না। ভারতের শাসনব্যবস্থার কংগ্রেস নেতাদের হাই কমান্ড চান কেন্দ্রীকরণ। মুসলিম লীগ নেতারা চান ত্বিকেন্দ্রীকরণ। আর গান্ধীজী চান বিকেন্দ্রীকরণ। যেখানে এতখানি মতভেদ আর সব কটা মতই নীতিগত সেখানে অন্যান্য নেতাদেরকে কথা বলতে দিয়ে নিজের সরে থাকাই শ্রেয়। সকলেই জানে, তিনি কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় রেখে দিয়ে আর সব বিষয় প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। ফলে প্রদেশের বল বাড়বে, কেন্দ্রের বল কমবে। কংগ্রেসে নেতাদের কিন্তু উলটো মত। তাঁরা প্রদেশকে দুর্বল না করে কেন্দ্রকে বলবান করতে চান। যেমন ব্রিটিশ আমলে। যেমন মোগল আমলে। শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে ভারতের বলকানীকরণ হতে পারে। অথচ জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবি তুলে ভারতকে বলকানের অভিমুখে রওনা করে দিতে উদ্যত। ভারত যদি ধর্মের নিরিখে দুভাগ হয় ভাষার নিরিখে বহু ভাগ হবে না কেন? একবার যদি ভাঙন শুরু হয় সেটা কি সেখানেই থামবে? শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে? মুসলমানদের নিশ্চয়ই একটা বখরা দিতে হবে। কিন্তু দাবিদার তো একমাত্র মুসলমানরাই নন। এ এক জটিল সমস্যা। এর একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হলে ঘোর

অশান্তি। যে আগুন জ্বলবে তাতে সবাই দগ্ধ হবেন—গান্ধী, জিন্না, আজাদ, তারা সিং, আমবেদকর, সাভারকর, লর্ড ওয়েভেল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সময় থাকতে তার প্রতিবিধান করতে চান বলেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী-ত্রয়কে ভারতে পাঠিয়েছেন। পেথিক-লরেন্স দীর্ঘকালের ভারত-বন্ধু। ক্রিপসও তাই। শুনছি তৃতীয় জনের নাম আলেকজান্ডার।"

"শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আমরা চাই, চৌধুরীজী। ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ না হলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই হবে। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে নেতারা সবাই থাকবেন, আজাদ সাহেব বাদে। দরাদরি সেইখানে বসেই চালাবেন। তার পর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে তাঁদের মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করবেন। সেখানে তা পাশ হয়েও যাবে। কেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, দ্বিকেন্দ্রীকরণ—যেটাই হোক না কেন, সর্বসম্মতিক্রমেই হবে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেনটে যেমন অধিকাংশের ভোটে বিল পাশ হয়, কখনো কখনো একটামাত্র ভোটের ব্যবধান, ভারতের মতো বহু-ধর্মী, বহুভাষী দেশে সেটা অনুসরণ করা চলবে না। এই কথাটাই কায়দে আজম বলে আসছেন প'চিশ বছর ধরে। মেজরিটি ভোট মামুলি বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু যেসব প্রশ্নে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থাকে সেসব প্রশ্নে অপেক্ষাকৃত মেজরিটি ভোটই যথেষ্ট নয়। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ করতে হয়। এমন প্রশ্ন থাকতে পারে যার নিষ্পত্তির জন্যে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ভোটের আবশ্যক হয়। ভারতে হিন্দুর সংখ্যানুপাত শতকরা সত্তরের মতো। এখানে দুই-তৃতীয়াংশ না হয়ে তিন-চতুর্থাংশ ভোটই মাইনরিটিদের পক্ষে নিরাপদ। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কংগ্রেস যদি বলে ভারতের সরকারি ভাষা হবে হিন্দি আর মুসলিম লীগ যদি বলে, উরদু, তা হলে সেটা শতকরা একান্নটা ভোটে পাশ হলে গৃহ-যুদ্ধ বেধে যাবে। শতকরা সাতষট্টি হলেও মুসলিম লীগের বিষম আপত্তি থাকবে। লীগ পক্ষে বহু হিন্দু শিখও ভোট দেবেন। তবু নিরাপত্তার খাতিরে শতকরা প'চাত্তরই বিধেয়। নয়তো হিন্দি উরদু উভয়কেই সরকারি ভাষা করতে হয়। ব্রিটেনের মতো একমাত্র ইংরেজিকেই সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের তলে-তলে কাজ করছে হিন্দি-উরদু বিরোধ। এটা যুক্তপ্রদেশে আর বিহারে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে সক্রিয়। উরদুকে আদালত থেকে হটানো মানে মুসলিম রাজকর্মচারীদের হটানো। হিন্দিকে তার জায়গায় বৈঠানো মানে হিন্দু রাজকর্মচারীদের বৈঠানো। সার সৈয়দ আহমদ আতঙ্কিত হন হিন্দিভক্তদের উৎসাহ দেখে। তাঁর কংগ্রেসবিরোগের মূলে হিন্দুবিরাগ নয়, হিন্দিবিরাগ।" অধ্যাপক শরীফ বিশ্লেষণ করেন।

রায়বাহাদুর কটাক্ষ করেন, "সেই সঙ্গে বাঙালি উকিল ব্যারিস্টার শ্রেণীর প্রতি বিরাগ। এই শ্রেণীটাই নাকি ব্রিটিশ ইনডিয়ান-গভর্নমেনটের অপোজিশন হিসাবে কংগ্রেস পরিচালনা করতে-করতে একদিন সেই গভর্নমেনটের উত্তরাধিকারী হবে। যে পন্থতিতে হবে সেটা গণতান্ত্রিক পন্থতি। সার সৈয়দের মতে সেটা ভারতের মতো দেশের অনুপযুক্ত। একট কথা শোনা যায় শাসকশ্রেণীর মুখেও। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে। পন্থতিটা ভারতের অনুপযুক্ত তো বটেই, ভারতও পন্থতিটার অনুপযুক্ত। কিপলিং তো একটা কবিতাই লিখে ফেলেন। 'হারি চান্ডার মুকার্জি ব্যারিস্টার অ্যাট লা'। হা হা হা হা! পড়েছেন?"

কেউ পড়েন নি শুনে রায়বাহাদুর বলেন, "বাঙালি বাবুদের উপর সে কী গায়ের ঝাল ঝাড়া! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ ট্রাইবাল আক্রমণকারীরা এসে বাঙালি বাবুদের পার্লামেনটারি লীলাখেলা সাঙ্গ করে দেবে। তাঁদের প্রাণে বাঁচাই দায় হবে। জীবিত থাকলে কিপলিং সাহেবের চোখ কপালে উঠত যখন শুনতেন যে বাঙালি বাবু সুভাষ চান্ডার বোস সেইসব ট্রাইবালদের এলাকা দিয়ে কাবুলে গিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের তোড়জোড় করছেন। পার্লামেনটারি লীলাখেলায় তাঁরও অনীহা।"

"পার্লামেনটারি লীলাখেলায় আমাদেরও অনীহা।" সৌম্য গান্ধীপন্থীদের দিক থেকে জানায়। "সাধারণ নির্বাচনের পরে জনগণের সঙ্গে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর সংস্রব থাকে না। তবু পরের বারের নির্বাচনে একটা-জবাবদিহির দায় থাকে। যে দায় চারাচিলের মতো মহাপ্রতাপশালী জননায়কেরও ছিল। সাধারণ নির্বাচকরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। গান্ধীজীর মতো পার্লামেনটারি লীলাখেলার উপর আস্থাহীন সংগ্রামীর উপরেও এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে। পার্লামেনটারি পন্থাকে তিনি এখন সত্যাগ্রহের মতোই গুরুত্ব দেন। ইংরেজরা যদি এখন হারি চান্ডার মুকার্জির সঙ্গে পার্লামেনটারি হারজিতের খেলায় যোগ দিতে সম্মত থাকেন তবে কেবল আর্টটি প্রদেশে কেন, কেন্দ্রীয় আইন-সভাতেও কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। হারি চান্ডারের দল একদিন মেজরিটি পাবেন সেই আশঙ্কায় তাঁরা মুসলিম লীগের উৎপত্তি ঘটিয়েছেন, তাকে সেপারেট ইলেকটোরেটের মই ধরিয়ে দিয়েছেন, সে মই বেয়ে উপরে উঠেছে কংগ্রেসের মেজরিটিকে ভাঁটো দিয়ে চালমাত করতে। যেটা করতে বড়লাটেরও বাধে। আর কোনো উপায় পাওয়া যাচ্ছে না বলে কেন্দ্রটাকেই দুভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে। সেটা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে, ইংরেজদের স্বার্থে নয়, একথা বিশ্বাস করা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পক্ষে শক্ত। আমাদের সন্দেহ হয় এটা আমাদের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার ফন্দি। আমরা ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে মুসলমানদের সঙ্গে লড়ব। জনতার রোষ পড়বে জনতার উপরে, হিন্দুর রোষ মুসলমানের উপরে, মুসলমানের রোষ হিন্দুর উপরে। ইংরেজরাই হবে দুপক্ষের রক্ষক আর সালিশ। তাদের সালিশিতে একপক্ষ পাবে পাকিস্তান, অপর পক্ষ হিন্দুস্থান। যেন এইজন্যেই এত-কালের স্বপ্ন। উমেশ চান্ডার বনার্জি থেকে যার শুরু। সুভাষ চান্ডার বোসেও যা শেষ নয়। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র ভাবনা স্বাধীনতার জন্যে অধীর হয়ে আমরা যেন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ি। তা হলে স্বাধীনতা তো হবেই না, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক চিরকালের মতো বিষিয়ে যাবে। এটা আমাদের আত্মপরীক্ষার আর আত্ম-শুদ্ধির সময়। এখনকার পলিসির নাম মার্ক টাইম।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে শোনে। এর পর অধ্যাপক শরীফ বলেন, "চৌধুরীজী, ইংলন্ডের মতো দেশেও এককালে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল। পিউরিটান বনাম অন্যান্য। এরকম বিরোধ কোথায়ই বা না বেধেছে! ইংরেজরা আপনাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেলেও এরকম বিরোধ বাধবে। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ নয়, হিন্দু মুসলমান উভয়ের দেশ। তাকে যদি আপনারা মেজরিটির ভোটে আপনাদের মনোপলি করতে যান তো আমরাও ভোটের রাজনীতির উপর আস্থা হারিয়ে সুভাষ বোসের পন্থা অনুসরণ করব। উদ্দেশ্য হোমল্যান্ড অর্জন। গান্ধীজীর মতো জিন্না সাহেবের বুকের ভিতরেও একই আগুন জ্বলছে। কিন্তু সেটা কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি নয়, হিন্দু শাসন থেকেও মুক্তি। ইংরেজের কথায় তিনি নাচছেন না। আটটা প্রদেশ কংগ্রেস দখল করেছে বলেই নাচছেন। উপরন্তু পানজাব মন্ত্রিমন্ডলেরও একাংশ। কংগ্রেস এখন তার দখল পাকা করতে চায়। তার পলিসি কনসলিডেশন। তাই মার্ক টাইম। লীগ পলিসি তার বিপরীত। কায়দে আজম বেশিদিন সবুর করবেন না। প্রলয় নাচন নাচবেন।"

[ক্রমশ

শিল্পরচনার কলাকৌশল ও নন্দলাল

ইন্দ্র দুগার

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক চিত্রকলার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আধুনিক শিল্পীর সম্মুখে রূপসৌন্দর্যের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। চীনা, জাপানি, ভারতীয়, এমনকি ইউরোপীয় কোনো দেশের রূপসৌন্দর্যের আদর্শই এঁদের চিত্তকে আর স্পর্শ করতে পারছে না। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্রশৈলী এঁদের কাছে প্রাচীনপন্থী। সুতরাং প্রগতিবাদী শিল্পী বলে পরিচয় দিতে হলে প্রগতিবাদের মৌসুমি বায়ুর উদ্ভব-ক্ষেত্রের দিকেই লক্ষ্যকে নিবদ্ধ রাখতে হয়। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে যাঁরা অতি-আধুনিক, তাঁদের সে আধুনিকতা নিগ্রো শিল্প, আদিম শিল্প, শিশুশিল্প, পিকাসো, মাতিস, হেনরি মুর, ডানকান গ্রান্ট-পন্থীদের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা।

অবশ্য রূপপ্রকাশের এই দিকটি যদি তাঁদের আকৃষ্ট করে থাকে তাতে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। কারণ রূপপ্রকাশের এটিও একটি স্বীকৃত পথ। কিন্তু বিপদ ঠিক এদিক থেকে নয়। শিল্প-সৃষ্টির মূলে শিল্পীর নন্দনাবেগ বা উত্তেজনা এবং তদনুসারী সৃষ্টিকে এক দার্শনিক রহস্যময়তা দিয়ে আচ্ছাদিত করে তোলা হয়েছে ; সেই রহস্যময়তাই আধুনিকপন্থীদের আত্মসন্তুষ্টির বর্মস্বরূপ হয়েছে। সুতরাং নির্ভয়ে তাঁরা সিগনিফিক্যানট ফরম তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। এই কথাটি নির্গুণ ব্রহ্মের মতো। তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া কঠিন। এই লাগামহীন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অতীন্দ্রিয় আবহাওয়ায় অনেকেই যে তিলক কেটে গুরু-মহারাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার চেষ্টা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিল্পকলাকে যদি সিগনিফিক্যানট ফরম-এর স্বেচ্ছাচার বলে মনে করে না নেওয়া যায়, তবে মূলে যে একাগ্র সাধনার প্রয়োজন আছে—এ কথা শিল্পকলার রসিক মাত্রই স্বীকার করবেন। সে সাধনা শিল্পকলার প্রাথমিক উপাদান পর্যবেক্ষণ, রেখারচনা এবং বর্ণজ্ঞানের সাধনা। এই প্রাথমিক সাধনায় যাঁরা উত্তীর্ণ হন নি, সিগনিফিক্যানট ফরমের দোহাই দেওয়া তাঁদের পক্ষে নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়।

শিল্পীরা যে ছবি আঁকেন, তাকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ থাকেন অগণিত রসপিপাসু দর্শক। অবশ্য ছবি

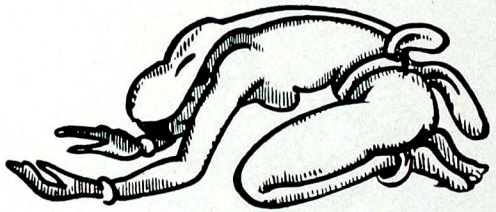

দেখার জন্যও চাই কিছুটা মানসিক শিক্ষা। কিন্তু সব দর্শকই যে রসবোধে এবং রসবিচারে অক্ষম, এমন ধারণা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। বহু দর্শককে দেখেছি—চোখেমুখে নিবিড় বিভ্রান্তি নিয়ে প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসতে। শিল্পীর সৃষ্টি সেখানে তাঁর নিজস্ব ভাবনার এবং তদনুসারী কলাকৌশলের আবরণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল, দর্শকের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হল না।

আচার্য নন্দলাল অনেক বার শিল্পশিক্ষায় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করলে শিল্পকলা হয়ে ওঠে মূলহীন গাছের মতো। কেননা, ঐতিহ্য থেকেই আসে জীবনের রস—যা শিল্পসৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয় নতুন-নতুন পাতা হয়ে, বিচিত্র বর্ণের ফুল হয়ে।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নন্দলাল ড্রয়িঙ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং পারদর্শিতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের এখানে যারা ছবি আঁকতে সবে আরম্ভ করে তাদের আমরা গোড়ার দিকে খুব উৎসাহ দিই যথেচ্ছ ছবি আঁকার কাজে। ক্রমে তারা এমন এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় যখন তাদের সঠিক পথে চালিত করার জন্য জোরে চেপে ধরি ; যদি তা না করি তবে তার ছবি আঁকার দিনগুলো এলোমেলোভাবে শেষ হয়ে যাবে।" তারপর হেসে বলেন, "আমি আজও কপি করছি অবনবাবু আর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি—যখন যা ভালো লাগে। হাজার-হাজার ছবি কপি করেও কূলকিনারা পাই নে। পুরোনোযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজ দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। ছবি-আঁকা যদি সত্যিকারের শিখতে চাও তা হলে কপি করতেই হবে, এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ফাঁকি দিয়ে কোনো কাজ কি কখনো হয়েছে? ড্রয়িঙ জানি না অথচ 'ওরিয়েনটাল', 'মডারন' একটা কিছুর দোহাই দিয়ে যেমন-তেমনভাবে হাত-পা দুমড়ে দেবে—এ চলে না। যার উপর বাড়ি তৈরি হবে সেই বনিয়াদই যদি কমজোর হয় তা হলে সে বাড়ি অনাতিবিলম্বে ধসে পড়বেই। অনেক ধূমকেতু-ধর্মী শিল্পী আছেন যাঁরা রাতারাতি উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে বা ছবির গুণাগুণবিচারে অশিক্ষিত লোককে ছবি দেখিয়ে খুব বাহবা পাওয়া যেতে পারে, শিল্পী বলে তারা সম্মানও দেবে কম নয়, হয়তো কাগজওয়ালারা হইচই করে উঠবে, কিন্তু সত্যিকারের সমঝদারের হাতে যখন ছবিগুলো পড়বে—তার চোখে তো এ দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাবে না। শিল্পীর পক্ষে এই একসাইটমেনটের স্টেজ বড়ো আত্মঘাতী। নেশায় পায় তখন তাকে ; অথচ তার বুনিয়াদে সে জোর নেই যাতে করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই একসাইটমেনটে এসে কী করবে ঠিক করতে পারে না। তাই একটা দাগের বদলে দুটো-চারটে, তাতেও না হলে আরো দাগ কেটে যায়। মনের অবস্থা তখন এমন যে কটা লাইনে সত্যিকারের ছবি হবে, তা সে বুঝতে পারে না। একটা হাতের ড্রয়িঙ যদি সত্যিই কারেকট হয়, তা হলে কি একটি লাইনের বেশি লাইন টেনে হাত বোঝাতে হবে। খুব পারদর্শী তরোয়াল-খেলোয়াড়—তার এমন নিশানা, এমন তার ক্যালকুলেশন যে সে এক আঘাতেই প্রতিদ্বন্দ্বীর গলা কেটে ফেলতে পারে। কিন্তু যার হাত ঠিক নেই—যে এখনো এ বিষয়ে পারদর্শী হয় নি, সে কুপিয়ে-কুপিয়ে কাটবে, সেই একবারের জিনিস দশবারে। ভালো শিল্পীর বেলায়ও ঠিক তাই। আনাড়ি শিল্পী দশটি আঁচড় দিয়ে যে ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম, পাকা শিল্পী একটি কি দুটি তুলির আঁচড়েই তা প্রকাশ করতে পারেন। এর জন্য চাই দিনের পর দিন সাধনা।"

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছোটো ছোটো স্কেচ করার চেয়ে বড়ো করে কমপোজিশন করার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে তিনি বলেন, "যা করবে বড়ো করে একেবারে রিজিড কপি—এতটুকু ফাঁকি তাতে থাকবে না। ছোটো স্কেচে সে দোষ থাকবার খুবই আশঙ্কা—ফস করে একটা আঁচড় দিয়ে ঘোড়ার পা আঁকা হল। ছোটো বলে ভুল-ভ্রান্তি ততটা চোখে পড়ে না। যদি ঘোড়ার পা আঁকতে হয় তবে সত্যিকারের ফরমে হুবহু সেই মাপে আগে করা উচিত—এতে করে শিখতে পারা যায় বেশি। এইভাবে এগুতে-এগুতে যখন সব জিনিসই আঁকতে পারবে বিনা পরিশ্রমে, তখন যেমন ইচ্ছে ছোটো করে কোরো ছবির কমপোজিশন এবং সেই অনুযায়ী তাকে মোলড কোরো। যেমন একটা বৃত্ত ঠিক বৃত্তের মতো করে আঁকা যায়, কিন্তু একটা ছবির কমপোজিশনে যখন তাকে ফেললে তখন তাকে বেঁকিয়ে নিলেও ক্ষতি নেই।" শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে অবজারভেশন প্রথম শিক্ষা ; একথা তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি, সেদিনও শুনলাম। বহুদিন লক্ষ করেছি, হয়তো মাঠের মধ্যে দিয়ে চলতে-চলতে

একটি ঘাসের ফুল কি একটি পাতা তুলে নিয়ে নিবিড়-ভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

একদিন বসে আছি তাঁর কাছে—পায়ের কাছ দিয়ে একটা পোকা চলে যাচ্ছিল ; তুলে নিলেন তাকে হাতে। পেনসিল-কাগজ নিয়ে তার প্রতিটি অংশ নিখুঁতভাবে এঁকে নিলেন। এমনিভাবে একদিন আমার আঁকা সাঁওতাল নাচের একটি ছবি দেখে বলেছিলাম, "এ তো দেখছি ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে গেছে—সাঁওতাল মেয়ের মুখের আদল তো হয় নি। ভালো করে গভীরভাবে ওদের স্টাডি না করলে শুধু কল্পনায় তো সাঁওতাল মেয়ের সত্যস্বরূপ আঁকা যাবে না।" সঙ্গে-সঙ্গে একটি স্কেচ এঁকে তা বুঝিয়েও দিলেন। সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ছবিতে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অবজার-ভেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। বললেন, "প্রকৃতির মধ্যে যে রঙের খেলা, তার যে জেল্লা; চোখে তা হয়তো ধরা পড়বে না—তার জন্যেও চোখকে শিক্ষিত করে নিতে হয়। সাধারণভাবে গাছের পাতাতে দেখবে শুধু সবুজ—কিন্তু একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে বুঝতে পারবে সে সবুজ নানান জাতের নানান শেডের ; তার মধ্যে নীলও আছে—অন্যান্য আরও কত রঙের খেলা।" তারপর বললেন, "আজও কত হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ছবি কেমন জ্বলজ্বল করছে দেখেছ। তাঁরা এভাবে রঙ ব্যবহার করতেন না। তাই তাঁদের ছবির জেলা যায় নি আজও। ধরো, যদি তাঁদের সবুজ রঙ ব্যবহার করতে হত, তবে তিন-চার রকম সবুজ তাঁরা আগে থেকেই তৈরি করে নিতেন—যেমন ধানের পাতার মতো কচি রঙ, তরমুজের মতো কালচে সবুজ, বট-অশ্বত্থের পাতার মতো চিকচিকে সবুজ, এইভাবে বিভিন্ন রঙ। তারপর যেখানে যেটি মানাবে, 'রস'-এর বিচারে যেখানে যেটির প্রয়োজন, সেখানে সেই রঙটি বসিয়ে দিতেন—এতে রঙ নোঙরা হত না, বরং আশ্চর্য রকমের ফ্রেশনেস আসত।"

এইভাবে বহুদিন তাঁর পায়ের কাছে বসে যেসব অমূল্য শিল্পনির্দেশনা শুনেছি, তাঁর কিছু কিছু তখনই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। তারই একটা টুকরো এই-খানে প্রকাশ করলাম। কিন্তু কত মণিমুক্তা যে অবহেলায় হারিয়েছি, তারও সীমাসংখ্যা নেই। আমার আক্ষেপ এইখানেই।

স্বয়ারোপ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সত্যি কথা বলতে গেলে
শতাব্দীর অন্তিক বিকেলে
জোর দিয়েছি হায়
শুধুমাত্র একটি বেশি বর্ণমাত্রায়

তাই বুঝি নিসর্গ শেষে ধূ-ধূ
মরুভূ বনে গিয়েছে, সেটা বলতে-বলতে যায়
শিল্পী শ্রমণ সংসারী আর রাজনীতির লোকেরা দলে-দলে

ওরা এখন আঁধার দিয়ে চলে...
বারুদ শিশির বিল্বপত্র ওতপ্রোত রয়েছে আজ ঘাসে,
যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে
'এখন ওরা অন্ধকার ঠেলে
যাচ্ছে বটে, কিন্তু আলোর দিকে—'
তবে কি ওরা বলবে আমি শুধু
বেঁকে গিয়েছি মিথ্যে নান্দনিকে ?

মৃত্যু

শিশিরকুমার দাশ

এখন পশ্চিমে এসে অকস্মাৎ সমস্ত আকাশে
সূর্য মেলে দিল তার বহুরূপী উজ্জ্বল পেখম
ঢেকে যায় অন্তরালে সব দুঃখ-সুখের প্রতিমা
সমুদ্রতরঙ্গো নাচে অস্তগামী ময়ূরের ছায়া।

এ নয় সে পরিচিত অরণ্যের উন্মত্ত ময়ূর
যে নাচে আসন্ন ঘন বিশ্বময় বর্ষার আশ্বাসে
যার কণ্ঠস্বরে কাঁপে প্রান্তরের কর্কশ বাতাস
যার কণ্ঠে টলমল করে ওঠে নিবিড় নীলিমা

এ এক রক্তাক্ত পাখি, তীরবিদ্ধ মেলেছে পেখম
নীচের তাঁবুতে বসে শিকারিরা জ্বালে অন্ধকার।
ঠিক যেই পৌঁছল সে সরাইখানার কাছাকাছি
লুকোল ঘাসের নীচে দ্রুতবেগে কাঠবিড়ালীটা
ভাঙা বাদামের এক টুকরো মুখে নিয়ে, ফেলে রেখে
এক টুকরো, লেগে ছিল চিহ্ন তাতে সুস্বাদু দাঁতের

তখন আকাশময় সূর্যের শরীর মেঘে ঢাকা
তখন পাহাড়ে ছিল মৃত্যুর আসন্ন পদধ্বনি
তখন ঘোড়ারা চায় বল্গাহীন নিশ্চিত আরাম
তখন মানুষ চায় সরাইখানার ম্লান আলো

কাঠবিড়ালীর মুখ মৃত্যুর মতোন, তার দাঁতে
ধরা আছে কঠিন বাদাম, ঘাসের জটিল অবয়বে।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবাল্য সুহৃদ্ পুলিনবিহারী সেন
সোদরপ্রতিমেষু

রবীন্দ্র-প্রয়াণলগ্নে জন্ম-যে তোমার
রবীন্দ্র-সন্ধিৎসা তব তাই দুর্নিবার।
অন্ধকার সূচীভেদ্য—ছিলে অপেক্ষায়,
সহসা সংকেত পেলে প্রভাতী তারায়।
অমনি সন্ধান শুরু দিলে দীপ জ্বালি,
তিলে তিলে অবশেষে তৈলপাত্র খালি।
এ নব গায়ত্রী-ব্রতে দুর্গতি অপার—
দীর্ণ প্রাণ, হৃত মান, জীর্ণ দেহভার।

সপ্ততিবর্ষের শুভ রাখিপূর্ণিমায়
সতীর্থের স্নেহবাক্য জানাই তোমায়—
পেয়েছ সম্মান কভু, কভু বা কৌতুক
হিসাব কর নি কার মূল্য কতটুক।
ব্রত সাঙ্গ হয় ভালো, না-ও যদি হয়
নম্র মনে মেনে নিও জয় পরাজয়॥

পুলিনবিহারী —যেমন দেখেছি

কানাইলাল সরকার

ইংরেজি ১৯২৬ সাল। আমরা শান্তিনিকেতনের শমীন্দ্র-কুটির ছাত্রাবাসের ছাত্ররা তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এক বছর আগে গুরুদেব শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কোরস প্রবর্তন করেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েও এই কোরসে নিয়ে পড়াশুনা করে তিন বছর পরে স্নাতক হওয়া যেত। বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি এই কোরসের স্নাতকদের স্বীকৃতি দিত। স্নাতক পর্যায়ের এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনার মূলে গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে —এমন-কি বিশ্বের নানা দেশ থেকে ছাত্র সংগ্রহ করা। তা ছাড়া, স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ যে-সব অভিভাবক ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তাঁরাও এই পাঠক্রমকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই বিশ্বভারতী কোরসে দ্বিতীয় বছরে ভরতি হল এক ছিপছিপে কিশোর, নাম পুলিনবিহারী—ময়মন-সিংহের স্বনামধন্য চিকিৎসক বিপিনবিহারী সেনের দ্বিতীয় পুত্র। পুলিনের বাবা বিপিনবিহারী তখন শুধু শ্রুতকীর্তি চিকিৎসকই ছিলেন না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।

সে-বছর বিশ্বভারতী কোরসে আরও একজন ছাত্র ভরতি হয়েছিলেন, পরের যুগে যিনি লেখনীর অমৃত-ধারায় বাঙলা সাহিত্যকে রসসিক্ত করেছেন। তাঁর নাম সৈয়দ মুজতবা আলী। শ্রীহট্টের মানুষ। তিনিও প্রবেশিকা পরীক্ষা না-দিয়েই ভরতি হলেন বিশ্বভারতী কোরসে। এই নতুন পাঠক্রমের ছাত্রদের নতুন ছাত্রাবাসটি নির্মিত হয়েছিল শমীন্দ্র-কুটির আর সতীশ-কুটিরের ঠিক মাঝখানে। নাম পশ্চিম তোরণ।

সুতরাং পুলিন এবং সৈয়দদাকে আমরা প্রতিবেশী হিসেবে পেলাম। দুজনেই বেশ মনের মতো মানুষ। পুলিন বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ো, সৈয়দদা আর-একটু বেশি। সৈয়দদাকে দেখেই আমরা বুঝেছিলাম বেশ মেধাবী ছাত্র—আমাদের তুলনায় অনেক সরেস। সামনে পরীক্ষা-পারাবার, পার হতে পারব কিনা ভেবে-ভেবে অস্থির হচ্ছি আমরা। শিক্ষকরা অবশ্য যথাসম্ভব তালিম দেন আমাদের, কিন্তু সর্বক্ষণ তো তাঁদের পাওয়া যায় না। তাই একদিন ঠিক করলাম সৈয়দদার শরণ নিলে কেমন হয়! ইংরেজিতে তো বেশ চোকস। প্রস্তাব শুনে তিনি

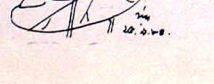

বললেন, 'আমি তোমাদের ইংরেজির ব্যাপারে সাহায্য করব, আর বাঙলা সংস্কৃত দেখিয়ে টেখিয়ে দেবে পুলিন।'

তথাস্তু। এর চেয়ে লোভনীয় সুযোগ সেই সময় আর কী হতে পারে! সেই থেকে আমরা কয়েকজন প্রায়শই হাজির হতাম ওই দুজনের কাছে। এই সুবাদে পুলিনের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। আর সৈয়দদার সঙ্গে বয়সের ফারাক যদিও একটু বেশি, কিন্তু তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্ব আর আলাপচারিতার গুণে আমাদের তিনি অনেক নিকট করে নিলেন।

'আপন পাঠেতে যেন নাহি করি হেলা'—এই নীতি নিয়ে আমরা সময়ে-অসময়ে জ্বালাতন করি দুজনকে। একদিন সৈয়দদা বললেন, 'ওহে পুলিন, এই চিংড়ি-গুলোর জন্যে তো আমাদের নিজেদের পড়াশুনো ডকে ওঠার যোগাড়, এবার এসো আমরাও এদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলি।' তার মানে তিনি বলতে চেয়ে-ছিলেন, বিশ্বভারতী কোরস যেমন চলছে চলুক, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা অধিকন্তু ন দোষায়। কিন্তু বাবার মত না নিয়ে পুলিন দু-নৌকোয় পা রাখতে নারাজ। শেষকালে সৈয়দদার পীড়াপীড়িতে পুলিনের স্থানীয় অভিভাবক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ওর বাবার মত আদায় করে আনলেন। পুলিনবিহারী সেন আর সৈয়দ মুজতবা আলী—ভিন্ন পাঠক্রমের দুই ছাত্র আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সামিল হল।

তখন শান্তিনিকেতনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ছিল অন্যরকম। নিজস্ব ব্যবস্থায় গৃহীত টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম পাঠাতেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী-রূপে গণ্য করতেন। পরীক্ষার কেন্দ্র পড়ত কখনো চুঁচুড়াতে, কখনো সিউড়িতে। আমা-দের বেলায় সিউড়িতে পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে যে তিনজন মেয়ে-পরীক্ষার্থী ছিল তাদের সীট পড়েছিল বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে। সেবার আমরা মোট ২১জন পরীক্ষা দিয়েছিলাম। সিউড়িতে যাবার সময় আমাদের টীমের সঙ্গে কোনো শিক্ষক-অভিভাবক ছিলেন না। অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্র আমাদের অগ্রজপ্রতিম কালীপদ রায় অভিভাবকত্ব করেছিলেন। সদ্য-গ্র্যাজুয়েট এই অমায়িক যুবকটি ছিলেন আমাদের বন্ধুর মতো।

সিউড়ি শহরে বিশাল এক ঝিলের ধারে মিশন হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সীট পড়েছিল সিউড়ি হাই স্কুলে। আমরা তো একটার পর একটা পরীক্ষা দিতে থাকলাম। পুলিনের অতিরিক্ত বিষয় ছিল ইতিহাস। কিন্তু সে অ্যাডিশনাল পরীক্ষাই দিল না। বলল, "অন্যান্য পরীক্ষা এত ভালো দিয়েছি যে ফার্স্ট ডিভিশন পাবই—তবে আর খামোকা অ্যাডিশনাল পরীক্ষা দিতে যাব কেন?"

ফল বেরোলে দেখা গেল, সে শুধু তিনটে লেটার সমেত ফার্স্ট ডিভিশনেই পাস করে নি, স্টারও পেয়েছে। পুলিন লেটার পেয়েছিল ইংরেজি, বাঙলা আর সংস্কৃতে। অতিরিক্ত বিষয়েও সে হয়তো লেটার পেতে পারত। সৈয়দদা লেটার পেয়েছিলেন ইংরেজি, বাঙলা আর অতি-রিক্ত বিষয় ফরাসিতে। তিনিও যে স্টার পেয়েছিলেন সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য। সেবার শান্তিনিকেতনের পরীক্ষার্থীরা কেউ থার্ড ডিভিশনে পাস করে নি, সেকেন্ড ডিভিশনেও একজন কি দুজন।

এর পর আই. এ.-তে পুলিন লজিক, ইতিহাস এবং বটানি নিল। আমরা তো থ! বটানি পড়াবে কে তোমাকে —অধ্যাপক কোথায়? পুলিন বলল, "বই তো আছে, বই দেখে-দেখে নিজেই পড়ব।" তা কথা রেখেছিল পুলিন। বই দেখে সে পড়ার মতোই পড়েছিল এবং প্রমাণ করে-ছিল সেলফ টীচিং ইজ দা বেস্ট টীচিং। বটানিতেও ভালো নম্বরই পেয়েছিল সে। আই. এ. পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তার স্থান ছিল ১০১তম।

আই. এ. পাস করে পুলিন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভরতি হল। ইকনমিকস-এ অনার্স। বিশ্ব-ভারতী কোরস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোরসে তার ফিরে আসার পিছনে আছে শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহাতিশয্য। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা আর হস্তুকিবাগানের অগলভি হস্টেলে থাকা-খাওয়া—এই হচ্ছে পুলিনের তদানীন্তন ত্রিবার্ষিক জীবনযাপন। ইকনমিকস-এ হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে সে এম. এ. পড়া শুরু করল ওই একই বিষয় নিয়ে। এম. এ. পড়ার সময়ই তার হস্টেল-জীবনের ইতি। এবার সে কোনো-এক সুহৃদ্-শুভানুধ্যায়ীর বাড়িতে পেয়িঙ গেস্ট। তখন থেকে তো বটেই, তার আগে থেকেও সে হস্টেল-জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মাঝে-মাঝেই আমাদের আপার

সারকুলার রোডের বাড়িতে এসে দু-দশ দিন থেকে যেত। এইভাবে সে হয়ে উঠেছিল আমাদের বাড়িরই একজন—যেন আমাদের আর-একটি ভাই।

এম. এ. পাস করতে মধ্যে পুলিনের একটা বছর নষ্ট হয়েছিল নানা কারণে। এম. এ.-তে অবশ্য ফার্স্ট ক্লাস পায় নি সে, পেয়েছিল সেকেন্ড ক্লাস।

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর পুলিনের সামনে দুটি চাকরির প্রস্তাব এল। একটি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে—প্রবাসী পত্রিকায় সম্পাদক-সহকারীর কাজ, বেতন মাসিক পঁচাত্তর টাকা ; আর-একটি প্রস্তাব এল হিন্দুস্থান ইনস্যুরান্সের নলিনীরঞ্জন সরকারের কাছ থেকে—তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে ওই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের প্রস্তাব—বেতন আড়াই শ টাকা। নলিনীবাবুকে রাজনীতিতে আনা এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে ছিল পুলিনের পিতৃদেব বিপিনবিহারীর ঐকান্তিক প্রয়াস। ময়মনসিংহ জেলায় এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপিনবিহারীর খ্যাতি আর সম্মান ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতোই। দেশবন্ধু তাঁকে অ্যাসেমব্লিতে আনবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিপিনবিহারী সবিনয়ে দেশবন্ধুর প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সোচ্চার রাজনীতির চেয়ে আর্ত আর পীড়িতের সেবাই শ্রেয়তর ছিল। গরিবদের তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা তো করতেনই, এমন-কি অনেকের পথ্য পর্যন্ত কিনে দিতেন। মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন আচার্যের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিপিনবিহারীর জীবনসাধনার যে মর্মস্পর্শী বিবরণ সেখানে দিয়েছিলেন তা শোনার পর শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত প্রতিটি মানুষ তাঁদের অতি আপনজনের বিয়োগব্যথায় শোকাশ্রু মোচন করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, সেই শোকসভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই ছিলেন মুসলমান, বাকি ২৫ ভাগ হিন্দু। এ থেকেই বোঝা যায়, বিপিনবিহারী ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের সমান শ্রদ্ধার্হ—যা শুধু গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার সঙ্গেই তুলনীয়। আমি নিজে ময়মনসিংহে কোনো দিন যাই নি, তবে এই কাহিনী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মুখে শুনেছি।

যাই হোক, বিপিনবিহারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নলিনীবাবু পুলিনকে এই চাকরিটি দিতে চেয়েছিলেন। পুলিন পড়ল মহা ফাঁপরে। একদিকে প্রবাসীর মতো দিগ্বিজয়ী সাহিত্য-পত্রিকায় সম্মানিত পদ। অন্যদিকে অনেক বেশি বেতনের হাতছানি। এই মানসিক টানাপোড়েনে শেষকালে পুলিনের সাহিত্য-প্রীতিই জয়ী হল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে প্রবাসীর চাকরিটিই বেছে নিল।

প্রবাসীর জহুরী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুলিনবিহারী সেনকে যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছিলেন কেন? একটু অতীতে অবগাহন করলেই এ-প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

পুলিন যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র তখন তার একটা আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। আশ্রমে গুরুদেব যে-সব তাৎক্ষণিক ভাষণ দিতেন পরে তা উপদেশাবলী হিসাবে সংকলিত হত। গুরুদেবের এই-সব তাৎক্ষণিক ভাষণ লিপিবদ্ধ করতেন প্রধানত তিনজন—সন্তোষকুমার মজুমদার, প্রদ্যোত সেনগুপ্ত এবং পুলিনবিহারী সেন। সন্তোষবাবুর মৃত্যুর পর এবং প্রদ্যোত সেনগুপ্ত কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে চলে যাওয়ায় পরবর্তী কালে পুলিন একাই প্রায় এই দুরূহ তথা দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করত। এবং এ কাজে তার দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। সে একবার শুনেই গুরুদেবের তাৎক্ষণিক ভাষণটি প্রায় হুবহু লিপিবদ্ধ করে ফেলত। অথচ সে শর্টহ্যান্ড জানত না, পূর্বোক্ত দুজনও অবশ্য জানতেন না। আসলে পুলিনের স্মৃতিশক্তি ছিল শ্রুতিধর—একসঙ্গে অনেক কথা শুনলেও পরম্পরাক্রমে তা মনে থাকত। আর গুছিয়ে লেখার ক্ষমতাটিও ছিল ঈর্ষণীয়। মনে পড়ছে, প্রথম যেবার সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গুরুদেবের ভাষণ লিপিবদ্ধ করে। নিজের ভাষণের সেই লিখিত রূপ একনজর দেখেই গুরুদেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। পুলিন ভেবেছিল ওটা গুরুদেবের ব্যাজ-স্তুতি। অমন জ্ঞানগম্ভীর মনস্বী ভাষণের সার্থক রূপায়ন কি তার পক্ষে সম্ভব? গুরুদেবের সংশোধন-প্রত্যাশী পুলিন পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে রেখে ছুটে পালিয়েছিল। পরে গুরুদেব তাকে ডেকে বলেছিলেন, "বলেছি তো ঠিকই লিখেছিস তুই—এত ভালো আমিও লিখতে পারতুম না।"

সেই পাণ্ডুলিপিটি প্রবাসী পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। দু-তিনটি শব্দের অদল-বদল করা ছাড়া গুরুদেব তাতে কলম ছোঁয়ান নি।

প্রবাসী-সম্পাদক পুলিনের এই গুণপনার কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই সহকারী-সম্পাদকরূপে মনোনয়ন করলেন।

তখনকার দিনে পঁচাত্তর টাকা মাস-মাইনেও বড়ো কম ছিল না। চাকরির পর পুলিনের নিজস্ব একটু বাসা বাঁধার তাগিদ এল। পরের বাড়িতে আর কতকাল পেয়িঙ গেস্ট থাকা যায়? সাদার্ন মার্কেটের পিছনে দুখানা ঘর ভাড়া নিল সে। একার সংসার। নিজে এবং একটি সর্বক্ষণের ভৃত্য। কলকাতায় পুলিনের সেই নিজস্ব আস্তানা আমাদের একটা বেড়াবার জায়গা হল। আমাদের বলতে পুলিনের সহাধ্যায়ী আর সমসাময়িক প্রাক্তন কয়েকজন শান্তিনিকেতনী যুবকের। পুলিনের সেই 'এতটুকু বাসা'য় যাঁরা এসে আড্ডা জমাতেন তাঁদের মধ্যে গোপাল রেড্ডি, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, সুধীর খাস্তগীর, বাচ্চুভাই শুক্লা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে এঁরা সবাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আর হামেশাই এসে হাজির হতেন আলীদা। চলত খাওয়া-দাওয়া গল্পগাছা আড্ডা, এমন-কি রাত্রিবাস পর্যন্ত। এক-একদিন বন্ধুসমাগম এত বেশি হত যে মেঝেয় মাদুর বা শতরঞ্চি পেতে ঢালা বিছানা পড়ত। রাত্রিবেলায় ভৃত্য-কাম-রসুইকরের হাতের গরম-গরম খিচুড়ি বা রুটি-তরকারি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়তাম সেই বিছানায়। সে এক আনন্দের দিন গেছে—আর ফিরে আসবে না।

প্রবাসী পত্রিকায় পুলিনের কর্মজীবন চলতে থাকে মর্যাদা আর দায়িত্বের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। প্রবাসীর লেখকগোষ্ঠীর বিস্তৃতি ঘটে পুলিনের আমল থেকেই। সৈয়দদার একটি গল্প প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকাতেই। গল্পটির নাম যতদূর মনে পড়ে 'দেড়ে'। অবশ্য লেখার বাতিক তাঁর আগে থেকেই ছিল এবং শ্রীহট্টের দু-একটা পত্র-পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে লেখাও বেরিয়েছিল তাঁর, কিন্তু কলকাতায়, তাও আবার একেবারে প্রথম সারির একটি পত্রিকায়, সেই প্রথম তাঁর লেখা প্রকাশিত হল।

আগে রামানন্দবাবু নিজেই গুরুদেবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে যোগাযোগ করতেন ; কিন্তু পুলিন তাঁর সহকারিত্ব গ্রহণের পর তিনি তার উপর সে-দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাই পুলিনকে মাঝে-মাঝেই শান্তিনিকেতনে ছুটতে হত গুরুদেবকে লেখার তাগাদা দিতে বা তাঁর কাছ থেকে লেখা আনতে। মোট কথা, বিচক্ষণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকা আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগরক্ষাকারী এক সেতু হিসেবেই তখন পুলিনবিহারী সেনকে কাজে লাগাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন।

সম্পাদনার কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পুলিনের মতো মেধাবী মানুষের খুব একটা দেরি হয় নি। এই কাজটিই যেন ছিল তার জন্যে বিধাতা-নির্দিষ্ট। এই মনের মতো কাজটিতে সে ক্রমশ হয়ে উঠছিল পারফেকশনিস্ট। প্রবাসীতে সে ঋষিতুল্য সম্পাদক ছাড়াও পেয়েছিল সহকর্মী-বন্ধুদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আর ভালোবাসা। তখন প্রবাসীতে তার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন নীরদ সি চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বাগল, নলিনীকুমার ভদ্র, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন লাহা প্রমুখ। পরের যুগে এঁরা সবাই স্বনামধন্য। প্রবাসীর প্রকাশক হিসাবে যাঁর নাম থাকত তিনিও পরের যুগের এক দিকপাল সমালোচক-সাহিত্যিক—সজনীকান্ত দাস।

সেই আমলে প্রবাসী ছাড়াও আর দুটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত—ভারতবর্ষ এবং মানসী ও মর্মবাণী। ভারতবর্ষের সুযোগ্য সম্পাদক জলধর সেনের নাম সাহিত্যরসিকরা সকলেই জানেন। জনপ্রিয়তা এবং প্রচারের দিক থেকে ভারতবর্ষ অবশ্য প্রবাসীকে টেক্কা দিয়েছিল, তার কারণ শরৎচন্দ্র তখন ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ; কিন্তু বিদ্বজ্জনমহলে প্রবাসী ছিল অধিকতর আদরণীয়—মননশীলতায় অদ্বিতীয়। তৎকালীন তিনটি পত্রিকার মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে মানসী ও মর্মবাণীর স্থান ছিল তৃতীয়।

বেশ কিছুদিন পরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বিচিত্রা—আর-একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি প্রকাশের পিছনে ছিলেন একটি শক্তিশালী সাহিত্যিকগোষ্ঠী এবং দু-একজন ধনবান ব্যক্তি—যাঁরা এর প্রকাশনার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম প্রকাশেই বিচিত্রা এক দারুণ চমকের সৃষ্টি করল। যেমন তার ভিতরের বাইরের দর্শনদারি, তেমনই তার রচনা-

বৈচিত্র্য। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রথম সংখ্যাতেই নন্দলাল বসু-চিত্রিত রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' -পর্যায়ের গান এবং 'স্ফুলিঙ্গ'-কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হল। আবির্ভাব-লগ্নেই বিচিত্রা যেন ঘোষণা করল—একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যাবে সে। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রার প্রথম সংখ্যাতেই লেখা দেওয়ায় রামানন্দবাবু মনে-মনে একটু আহত হয়েছিলেন হয়তো। পরে অবশ্য তাঁর মনোবেদনা প্রশমিত হয়েছিল, কারণ প্রবাসীর জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী ছিল উন্মুক্ত, উদার—তাঁর বহু বিখ্যাত রচনা প্রথম প্রকাশের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিল প্রবাসী। বিচিত্রা প্রকাশিত হওয়ার পর সেখানে তিনি লিখতে শুরু করেন ঠিকই, তবু প্রবাসীর জন্য তাঁর লেখনী ছিল অনেক বেশি স্নেহপ্রবণ।

প্রথম যুগে গুরুদেবের বই প্রকাশিত হত এলাহাবাদের ইনডিয়ান প্রেস থেকে। সে-সব বইয়ের বিক্রি আশানুরূপ ছিল না। রয়ালটিও ছিল কম—শান্তিনিকেতনের বিপুল ব্যয়ভার বহনের পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল। এমতাবস্থায় প্রশান্ত মহলানবিশের প্রস্তাবে তথা আগ্রহাতিশয্যে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ স্থাপিত হল। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরাকে অর্পণ করা হল প্রকাশন বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। সেল কাউনটার খোলা হল ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ির একতলায়। বিশ্বভারতী প্রকাশনের প্রথমাবস্থা কেটেছে আর্থিক অসাচ্ছল্যের টানাপোড়েনে, তবু কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়ের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুদেবের নতুন এবং পুরনো বই একে একে প্রকাশিত হতে থাকল। এই নবজাত বিশ্বভারতী প্রকাশন কি মুদ্রণসৌকর্যে, কি অঙ্গসজ্জায়, কি কাগজ-নির্বাচনে —সর্বক্ষেত্রেই বাঙলা প্রকাশন-জগতে এক অভিনবত্বের সূচনা করল। বইয়ের মূল্য নির্ধারিত হত ক্রেতাসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে। আমার ধারণা, পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেসের শ্রীদিলীপ গুপ্ত মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশনায় যে সৃজনধর্মী মনোহারিত্ব এনেছিলেন সেই মনোহারিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা—আরও অনেক বছর আগে। কিন্তু বিশ্বভারতী প্রকাশনের কর্ণধারের দায়িত্ব তিনি বেশিদিন পালন করতে পারেন নি। যক্ষ্মারোগজনিত তাঁর অকালমৃত্যু একটি কর্মকুশল জীবনের উপর যবনিকা টানে।

কিশোরীমোহনবাবুর মৃত্যুর পর গুরুদেব আর প্রশান্ত মহলানবিশ বেশ ভাবিত হয়ে পড়লেন। এরপর কাকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া যায়! গুরুদেব প্রশান্তবাবুকে বললেন, "পুলিনকে একবার আমার কাছে আসতে বলো।" পুলিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন, "আমি তোকে রামানন্দবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেব আমার বিশ্বভারতী প্রকাশনের জন্য। তুই রাজি তো?" গুরুদেবের ডাক কি অমান্য করতে পারে পুলিন? তবু সে একটু দোটানায় পড়ল বই-কি! কারণ ততদিনে সে রামানন্দবাবুর প্রবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছে। গুরুদেব যখন রামানন্দবাবুর কাছে পুলিনকে চাইলেন তখন রামানন্দবাবু যা বলেছিলেন তা পুলিনের উপর তাঁর গভীর নির্ভরতার কথাই প্রমাণ করে। তিনি গুরুদেবকে বলেছিলেন, "আমার ডান হাত ভেঙে দিলেন আপনি। বিশ্বভারতীর যতটা লাভ হল আমার ক্ষতি হল ঠিক ততটাই।"

বিশ্বভারতী প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে গোড়ার কয়েক বছর পুলিন কিশোরীমোহনবাবুর প্রদর্শিত পথেই অনুসরণ করল। তার পরিকল্পিত বিভিন্ন প্রকাশনা বেশ লাভের মুখ দেখল—বিশ্বভারতীর ঘরে বেশ কিছু টাকাও আসতে লাগল। এই সময় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রেসিডেনসি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনার প্রধান কর্ণধার হলেন। তাঁর আর পুলিনের যুগ্ম প্রয়াসে প্রকাশনার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল দিন-দিন। পুলিনের মাথায় আসতে লাগল নতুন-নতুন পরিকল্পনা। চিঠিপত্র, স্বরবিতান, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অজস্র বই এবং অন্যান্য লেখকদের বই জনপ্রিয় করার পিছনে ছিল পুলিনের ঐকান্তিক প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্ররচনাবলীর দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই রচনাবলী প্রকাশনায় পুলিনবিহারীর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের পরিচয় গুরুদেব দেখে যেতে পেরেছিলেন।

গুরুদেবের তিরোভাবের পর পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেন। অচিরেই তিনি পুলিনের গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন। পুলিনের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ দুর্বলতা আর সমীহাবোধ। পুলিনকে সোজাসুজি কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন—দেওয়াতেন তৃতীয় ব্যক্তি মারফত। পরে যখন উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হল তখন আর কোনো বাধা থাকল না। রথীন্দ্রনাথ উপাচার্যপদ ত্যাগ করার পর ড. প্রবোধ বাগচি এলেন। তাঁর বৈদগ্ধ্য তথা পাণ্ডিত্য তর্কাতীত, কিন্তু প্রশাসন অন্য জিনিস। শান্তিনিকেতনের এক সাধারণ শিক্ষার্থীরূপে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে প্রথম উপাচার্য রথীন্দ্রনাথের মতো দক্ষ প্রশাসক আর এলেন না। গুরুদেবের পর বিশ্বভারতীর অগ্রগতির জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকেন তবে তা করেছেন একমাত্র রথীন্দ্রনাথ। তাঁর পরে অনেক নামী গুণী উপাচার্য এলেন গেলেন, কিন্তু প্রশাসন জিনিসটা যে কী, তা যেন বুঝতেই পারলেন না কিংবা বুঝতে চাইলেন না। এখন বিশ্বভারতী চলছে আর-পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গতানুগতিকভাবে। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তার পূর্বগৌরব আর খ্যাতি আর-কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবেন বলেও মনে হয় না। যাক, সে অন্য প্রসঙ্গ।

প্রবোধ বাগচি মহাশয় কার্যভার গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই পুলিনের সঙ্গে তাঁর ভুল-বোঝাবুঝি শুরু হল। সেই ভুল-বোঝাবুঝির ফলে পুলিনকে প্রায় এক বছর নিষ্ক্রিয় কর্মজীবন যাপন করতে হয়েছিল। পুলিনকে অগ্রাহ্য করে তিনি অন্যদের সাহায্য আর পরামর্শ নিতেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন, পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর অগাধ—দর্শনশাস্ত্রের একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে সেই যুগে তিনি অনেক কৃতী ছাত্র তৈরি করেছিলেন। পুলিনের সঙ্গে তাঁর ভুল-বোঝাবুঝি হওয়ার কথা ছিল না, তবু হয়েছিল। তার কারণ, আমার অনুমান, শান্তিনিকেতনের তৎকালীন কতিপয় সুবিধাবাদী চাটুকার উভয়ের এই ঠান্ডাযুদ্ধে উশকানির ইন্ধন যুগিয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ সুদূর দেরাদুন থেকে এই খবর জানতে পেরে প্রবোধ বাগচিকে ট্রাঙ্ককল করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, পুলিনের মতো দক্ষ নিরলস কর্মীকে তিনি যেন চিনতে ভুল না করেন। সেই অনুরোধের পরেই প্রবোধবাবু পুলিনকে ডেকে সব কাজ বুঝে নিতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন, প্রকাশন বিভাগের কাজে আর তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। এই প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় উপাচার্য-পদে থাকাকালে অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিক্ততার অবসান ঘটতেই পুলিন আবার নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রবোধ বাগচির পর উপাচার্য হলেন প্রাক্তন বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস। এদিকে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী এগিয়ে আসছে। উপাচার্য মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের স্বত্ব দিয়ে দিলেন। এ-ব্যাপারে পুলিনের মতামত উপেক্ষিত হওয়ায় সে পদত্যাগ করল এবং অত্যন্ত মসৃণভাবেই তার পদত্যাগ গৃহীত হল। অথচ আর কিছুকাল পরেই সে পেনশনের অধিকারী হত। চাকরির মেয়াদকাল শর্তাধীন না হওয়ায় বার্ধক্যের বারাণসী সেই পেনশন থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হল। আত্মপরায়ণতার যূপকাষ্ঠে সে নীতিকে বলি দিতে চায় নি।

বিশ্বভারতীর কাজে ইস্তফা দেবার পর স্বভাবতই পুলিন এক আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। এই সময় তার দিকে যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁদের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের নাম বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। পুলিনকে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সহযোগী-সম্পাদকরূপে যোগদানের প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু পুলিনের অক্ষমতাজ্ঞাপন সে-প্রস্তাবকে কার্যকর হতে দেয় নি। পুলিন কুণ্ঠাভরে জানায়, সাংবাদিকতার কঠিন দায়িত্ব সে হয়তো যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না; কারণ 'লাইন'টা তার তেমন সড়গড় নয়। যাই হোক, অশোকবাবুর অনুরোধে আর মধ্যস্থতায় পুলিন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিতব্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী-গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই দায়িত্ব সে এত নিষ্ঠা আর দক্ষতায় পালন করে যে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ আর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এই সময় একজন বাঙালি প্রকাশকও পুলিনের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রায়ণ' নামে রবীন্দ্র-বিষয়ক অমূল্য প্রবন্ধরাজির এক সংকলন-গ্রন্থ একাধিক খণ্ডে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া, তাঁর প্রকাশনায় এবং পুলিনের সম্পাদনায় অবনীন্দ্রনাথের একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। পুলিনের গুণগ্রাহী এই প্রকাশক হচ্ছেন বাক্-সাহিত্যের শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নীতিগত কারণে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

ঘটলেও পুলিন মনেপ্রাণে আজও শান্তিনিকেতনের এক একনিষ্ঠ আশ্রমিক। গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতনের বাউল প্রকৃতি চিরদিন তার প্রাণে বাজায় বাঁশি। কর্তৃপক্ষস্থানীয় কারো কারো সঙ্গে তার মতাদর্শের সংঘাত হলেও কিংবা কোনো কোনো সুবিধাবাদী চাটুকারের কাছে নিন্দাবাদ পেলেও বিশ্বভারতীর সব বিভাগের প্রায় সব কর্মীর সঙ্গে তার এক হার্দ্য মধুর সম্পর্ক ছিল এবং আজও সে-সম্পর্ক অপরিম্লান। তাই তার পদত্যাগের কয়েক বছর পরেও তাকে অন্তত উপদেষ্টা হিসেবে ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দরবার করেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী এবং শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ইন্দিরাজী এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মাসিক ৬০০ টাকা সম্মানভাতায় পুলিনকে উপদেষ্টা করে নেওয়া হয়।

বিশ্বভারতী প্রকাশনায় নতুন ধারার প্রবর্তন এবং জীবনব্যাপী তন্নিষ্ঠ রবীন্দ্রচর্যা—এই দুটি কারণেই পুলিনবিহারী সেন বিদগ্ধজনের মুখে উচ্চারিত নাম। কালপ্রবাহে সে-নাম ধুয়েমুছে যাবে, না স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকবে—সে-রায় দেবার দায় ইতিহাসের। আমি শুধু পুলিনের এক গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে খানিকটা স্মৃতিচারণ করলাম। তবে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে পুলিনের বন্ধুবাৎসল্য আর মজলিশি মেজাজের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রসঙ্গটা সেই জিলিপি ক্লাব—যার কথা অনেকেই জানেন।

প্রতি রবিবার সকালে পুলিনের হিন্দুস্থান পার্কের বাসা-বাড়িতে একটা জমাট আড্ডা বসত। আমার মতো শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন আশ্রমিক ছাড়াও এই আড্ডার অংশভাক্ হতেন অনেক জ্ঞানী-গুণী-সুধীজন। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় আসর সরগরম হয়ে উঠত। এই বিখ্যাত আড্ডায় অনেকে দূর-দূর থেকেও আসতেন—এমনই ছিল এর আকর্ষণ। আসতেন প্র-না-বি, ড নীহাররঞ্জন রায়, ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ড শচীন সেন, ড প্রতুল গুপ্ত, মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ, শান্তিদেব ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবশরণ সরকার, অমল হোম, নরেন্দ্র দেব, অজিত চক্রবর্তী (কবি অমিয় চক্রবর্তীর ছোটো ভাই), হিরণকুমার সান্যাল, কবি অজিত দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বিশী, ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন, ওরিয়েন্ট লংম্যানের যতীশ ব্যানার্জি, ইন্দু রায়, শিবেন্দ্রমোহন রায়, গোলক মজুমদার, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন—আরো অনেকেই আসতেন, যাঁদের নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না।

রবিবার সকাল নটার মধ্যেই সবাই এসে পড়ত। তখন তো কলকাতার পরিবহণ-সমস্যা এত জটিল ছিল না। গৃহকর্তার কর্তব্য সম্বন্ধে পুলিন ছিল অত্যন্ত সজাগ। চিরকুমার হলেও আতিথেয়তা সে রপ্ত করেছিল ভালোই। অতিথিদের জন্যে শুধু চা নয়, 'টা'য়ের ব্যবস্থাও থাকত। নিজে সে ভোজনরসিক, কাজেই বন্ধু-বান্ধব-অভ্যাগতদের খাইয়ে তৃপ্তি পেত। দিন-দিন সেই রবিবাসরীয় আসরের সভ্য-সংখ্যা বাড়তে লাগল, তখন আমাদের চেষ্টায় দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা কমিয়ে দেওয়া হল। লোকটা যে খাইয়েই ফতুর হয়ে যাবে। কিন্তু অন্তরে যে ঋদ্ধ সে কি সহজে ফতুর হয়? তার মনে খুঁতখুঁতুনি লেগেই থাকল। শুধু চা আর বিস্কুট খাইয়ে কি মন ভরে! সুতরাং অন্তত জিলিপির ব্যবস্থা হোক। তো, তাই হল। খরচাও খুব একটা বেশি নয়। বাড়ির কাছেই দোকান, পাওয়াও যায় গরম-গরম। তারপর থেকে আমাদের এই জমায়েতের নামই হয়ে গেল 'জিলিপি ক্লাব'। যতদূর মনে পড়ে, হিরণকুমার সান্যাল কিংবা বিমলচন্দ্র সিংহ নামকরণটি করেছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন সুরসিক, ভোজনরসিক তো বটেই। কম খরচে বেশি-সংখ্যক মানুষকে আপ্যায়ন করানোর জন্য জিলিপির প্রস্তাবটি করেছিলেন সুরসিক হিরণকুমার সান্যাল।

আমি তখন সবে আনন্দবাজারে ঢুকেছি। আমাদের এই লোভনীয় আড্ডার কথা জানতে পারলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। সূত্র বিমলচন্দ্র সিংহ। সুরেশচন্দ্র একদিন আমাকে বললেন, তিনিও ওই আসরে যাবেন। পুলিনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কাজেই তার বাড়িতে প্রতি রবিবারে যে চাঁদের হাট বসে সেখানে একদিন না গেলে চলে! তাঁকে যত বলি, আমাদের কম-বয়সিদের আড্ডায় গিয়ে তিনি খুব-একটা আনন্দ পাবেন না, আমরাও একটু সংকুচিত থাকব, তিনি ততই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অগত্যা একদিন তাঁকে নিয়ে যেতেই হল। তাঁর মতো ভারি মানুষের আকস্মিক

পদার্পণে জিলিপি ক্লাবের অপেক্ষাকৃত তরুণ সভ্যরা একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেও আনন্দও পেলেন প্রচুর। ওই আড্ডায় অবশ্য বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে যেতে অসুবিধা ছিল না, কারণ আলোচনা যা হত তাতে অপরের চরিত্রহনন থাকত না। হালকা হাস্য-পরিহাস চললেও তার মধ্যে কুরুচির প্রকাশ ঘটত না। যেদিন শান্তিদেব আর সাগরময় আসতেন সেদিন আলোচনার মুখে কুলুপ এঁটে আমরা রবীন্দ্র-সংগীতের শান্ত দীঘল সরোবরে অবগাহন করতাম। কখনো শান্তিদেব গাইতেন, কখনো সাগরময়। সাগরময় ঘোষও যে কত বড়ো রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী ছিলেন, তা যাঁরা তাঁর গান শোনেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। কখন যে ঘড়ির কাঁটায় বারোটা-একটা বেজে বসে থাকত! যখন টনক নড়ত তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে যার বাড়ি ফিরে যেতাম। সেই স্মৃতিভুক্ অতীতের কথা ভাবতে বসলেই আমি যেন সময়ের পাঁচিল টপকে সেই যুগে চলে যাই।

রচনাকাল ১৯৮২
এতাবৎ অপ্রকাশিত

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৪

নেবুতলার গলিতে ছিল একচিলতে গাড়িবারান্দা।

এইটুকু লেখার পর আবার আমি ফ্লুসমন্তরে যেন ছোটো হয়ে গিয়েছি। রেলিঙের লোহার গ্রিলে পা দিয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ে নীচের বাঁধানো রাস্তাটা চুপিচুপি নিঃশব্দে দেখছি। পাশের ঘরে ঠাকুর্দা ছাড়া কেউ নেই। মা রান্নায় ব্যস্ত। আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রেলিঙে পা দিয়ে উঠেছি বলে কেউ এখন হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে না।

বাড়ির বাইরেটা যে কী মজার!

চোখ বুজলে এখনও যেন সব দেখতে পাই। চোখের ক্যামেরায় সেদিনের তোলা ছবিগুলো, যখন যেমন দরকার, ডেভালাপ, প্রিনট আর এনলারজমেনট হয়েছে অনেক পরে। ফলে, আজও সেসব হলদে হয়ে যায় নি। ইচ্ছামত এখনও সেই নেগেটিভ থেকে স্বচ্ছন্দে আমি পেয়ে যাই নতুন-নতুন প্রিনট।

গলিটা ছিল এমন যে কেউ সেখানে বোধহয় নিজের চোখে কোনোদিন সকাল হতে দেখে নি।

মনে আছে : হোসপাইপের গলাফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বান ডাকানোর শব্দ ; বাঁশের-চোঙ-লাগানো চৌবাচ্চায় কলকণ্ঠে সকালের প্রথম জল আসার আওয়াজ ; গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত-পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে-ঝির জোরে-জোরে কড়া নাড়া ; কলতলার এঁংটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কারনিশে-বসা কাকের গলা-চেরা কা-কা।

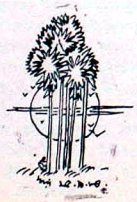

এ গলিতে সূর্যোদয় দেখা না গেলেও বিচিত্র সব শব্দে এখনও তেমনি সকাল হতে শোনা যায়।

আর ঠিক তখনই তোলা-উনুনের দম-আটকানো ধোঁয়াগুলো বাইরে থেকে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে-থাকা মানুষগুলোর নড়া ধরে তুলে দিত। আড়ামোড়া ভেঙে তাদের ওঠবার ওগিতে মনে হত যেন কড়িকাঠে-ঝুলে-থাকা আর দেওয়ালে-পিঠ-দেওয়া অন্ধকারের দিকে তারা যেন জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ছে।

সামনের গায়ে-গায়ে-লেগা দোতলা বাড়িগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে কিংবা ছাদ টপকে হৈ হৈ করে এসে রাস্তায় আর ছাতলা-পড়া উঠোনে লাফিয়ে পড়ত একপাল কচি-কাঁচা রোদ।

রাস্তা দিয়ে দলে-দলে প্রথম যাওয়া শুরু করত বস্তির ঠিকে-ঝি, জলকলের মিস্ত্রি আর বিশাল-বিশাল হাতাখুন্তি কাঁধে নিয়ে হালুইকরের দল।

এ গলির একজনই শুধু সকালে সূর্যোদয় দেখার কপাল করে জন্মেছিলেন। প্রথম লড়াইতে লাল-হওয়া ফটকঅলা বাড়ির বুড়ো কর্তা, যাঁর বাড়িতে ফি বছর দুর্গাপুজো হত ; যাঁর ঠাকুরদালানে বসত যাত্রা-অপেরার আসর। সূর্য-ওঠা তিনি দেখতেন তাই বলে এ-গলি থেকে নয়। সাতসকালে গঙ্গা নাইতে গিয়ে বাবুঘাটে তাঁকে চিত হিংবা উপুড় করে যখন তেল মালিশ করা হত, সেই সময় এ-গলির মানুষ হিসেবে একমাত্র তিনিই দেখতে পেতেন ময়দান পেরিয়ে আকাশের হাঁটু ধরে জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং সূর্যকে উঠে আসতে।

রাতে-ঘুমুতে-না-পারা ঠিকে-ঝিদের হাত ফসকে থালাটা গেলাসটা কলতলার শানবাঁধানো মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝনঝন আওয়াজে যখন সকালের স্তব্ধতা ভেঙে পড়ত, তখন তারা নিজেদের অপ্রস্তুত ভাবকে সামাল দিতে বাপের-বাড়ির-জন্যে-মন-কেমন-করা বউদের সান্ত্বনা দিয়ে বলত—এ বাড়িতে আজ কেউ আসচে গো, মা!

বাঁ-হাতের চেটোয় রাখা ঘুঁটের ছাই বা খড়ির গুঁড়োয়, হাঁটু-বার-করা লাল টেঁপি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের কাপে চায়ের ধোঁয়ায়, ময়রার দোকানে ফুটন্ত রসে ভাজা জিলিপির গন্ধে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উঃ—আঃ শব্দে, ঢোলগোবিন্দর মনে আছে, সেকালে নেবুতলায় সকাল হত।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত রাস্তায় রোদের খেলা। ঘোড়ার গাড়িগুলো যেত পায়ে-টেপা ঘন্টায় ঘুঙুরের বোল তুলে। কচিকাঁচা রোদগুলো, ভয় হত, এই বুঝি গাড়ির তলায় পড়ে থেঁতলে যায়! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত যখন দেখতাম ডানপিটে ছেলেদের মতো সেই রোদগুলো টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে গাড়ির চালের ওপর টকাস করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানি বেয়ে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতে গিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে যেত। অথচ রোদের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগত না।

তারপর রাস্তায় শুয়ে থাকতে-থাকতে পথচলতি লোকদের কখনও পা ধরে, কখনও মাথায় উঠে এমন তুর্কি-নাচন নাচত যে, তা দেখে ঢোলগোবিন্দ বেজায় মজা পেত। ক্রমে সেই চ্যাংড়া রোদ লায়েক হয়ে উঠে কনে-দেখা-আলো হয়ে ইঁটের রাজা টপকে কোথায় গিয়ে যে মাথা গুঁজত তার দিশে পাওয়া যেত না।

এ-গলিতে টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের তারগুলো সেতারের তারের মতো উঁচু-উঁচু খাম্বার সাদা-সাদা ঠোকায় টান-টান হয়ে থেকে এ-দেয়ালে সে-দেয়ালে মাথা ঠুকে গলির বাঁকে একটা জায়গায় যেন দুহাত বাড়িয়ে কোনো জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় কোনো কিছু না ধরে শূন্যে আড় হয়ে ঝুলে আছে।

আর সেই তারের গায়ে হেঁটমুণ্ডে লটকে আছে কাটা সৈনিকের মতো ভোঁ-কাটা-হওয়া কত যে ঘুড়ি। যতক্ষণ কল থাকে, জোরে একটু হাওয়া দিলেই আকাশে উড়ে যেতে চায়। একদিকের কল ছুটে গেলে তখন ডানা-কাটা পাখির মতো ঝটপট ঝটপট করতে-করতে কেবলি পাক খায়। ঢোলগোবিন্দর মনে পড়ে, নতুন-নতুন ঘুড়ি-গুলোকে ভারি সুন্দর দেখাত। রঙের কী বাহার। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে রঙ চটে গিয়ে দুদিনে তাদের এমন যাচ্ছেতাই চেহারা হত যে তাদের দিকে আর তাকানো যেত না। কোনোটার কাঁপের কাঠি ছিঁড়ে গিয়ে দেখাত ঠিক নিশানের মতো। আর সেই নিশানগুলো ঘুরে-ঘুরে এক-মাত্র আকাশ ছাড়া আর সব কটা দিকই ইশারায় দেখিয়ে দিত। ল্যাজে-বাঁধা চেতটানের কাঠিটা কী করবে দিশে না পেয়ে একবার এ-কাত, একবার ও-কাত হয়ে নিথর নিষ্পন্দ তারের গায়ে একটা এমন একঘেয়ে বিষণ্ণ সুরে তুলত—সেকথা মনে পড়লে ঢোলগোবিন্দর আজও মন খারাপ হয়।

রাতে হিম পড়লে কিংবা বৃষ্টি হলে ঢোলগোবিন্দ দেখতে পেত এক মজাদার তারের খেলা। রাস্তার চাঁনে বাজিকরদের মতন তারের গায়ে পড়ি-মরি করে ঝুলে থাকতে-থাকতে হঠাৎ এক সময় হাত ছেড়ে দিয়ে যখন নীচে পড়ে যেত কেমন যেন কষ্ট হত।

বর্ষার রাস্তার খোঁদলগুলোতে জল জমত। সন্ধের পর গ্যাসের আলোয় দেখা যেত তাতে উলটো হয়ে পড়েছে সামনের বাড়িগুলোর ছবি।

আট বছরের অদর্শনের পর ঢোলগোবিন্দ যখন আবার কলকাতায় ফিরে এল, তখন তার বয়স এগারো

কি বারো। তখন তারের গায়ে ঝুলে-থাকা বৃষ্টির ফোঁটা দেখে তার মনে হয়েছিল ঠিক যেন কোনো কিশোরীর নাকের নোলক।

বৃষ্টির জল-জমা রাস্তাটা তখন আর তাকে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ওপর থেকে দেখতে হয় নি। সটান রাস্তায় যেতে-যেতে হঠাৎ একটা গর্তের ধারে নীচু হয়ে সে দেখেছিল মেঘ-ভাঙা চাঁদের ছবি। কলকাতায় ফেরার পর ইঁটের পাঁজায় যে আকাশটা এতদিন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সে যেন হঠাৎ ঘোমটা খুলে তার পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ল।

সেসব তো ঢের পরের কথা।

আবার সেই আগের কথায় ফিরে যাই।

এ-পাড়ার অনেক বাড়িই ছিল পুঁয়ে-পাওয়া ক্ষয়া-খর্‌টে। বোধহয় চোয়ালের হাড়-বার-করা গাড়িবারান্দা-গুলোর জন্যেই ঢোলগোবিন্দদের বাড়িটাও কেমন একটু কোলকুঁজো-কোলকুঁজো লাগত। একতলার রোয়াকে দাঁড়িয়ে দড়িতে ঝোলানো বাঁশের আলনার মতো বারান্দা-গুলোকে লাফ দিয়ে যেন ছোঁয়া যায়।

এই গুণটুকুর জন্যেই চড়কের রাতে জেলেপাড়ার সঙ দেখতে বাইরের লোক এ-গলিতে ভেঙে পড়ত।

ছেলেবেলায় দেখা সেই সঙের ছবিটা মনের পটে কেমন যেন লেপে-পুঁছে গেছে।

আজকের মতো ট্রাক-লরি নয়। বার হত গোরুর গাড়ির মিছিল। সেই মিছিল জেলেপাড়া থেকে বেরিয়ে রমানাথ কবিরাজ লেন হয়ে হৈ হৈ করে যখন নেবুতলার গলিতে এসে পড়ত তখন উঠত হাততালির ঢেউ।

ভাঁড় সেজে ছড়া কেটে অন্যায় অবিচার আর ভণ্ডামিকে চাবুক মারা হত।

আট বছর পর যখন ফিরে আসি, তখন মুখিয়ে ছিলাম জেলেপাড়ার সঙের জন্যে। ঘুরে দেখেও এসেছিলাম তার তোড়জোড় চলছে।

ও হরি, চৈত্রসংক্রান্তির ঠিক মুখে দেখি গলির দেয়ালে-দেয়ালে কাঠের বড়ো-বড়ো টাইপে ছাপা পোস্টার : এ বছর জেলেপাড়ার সঙ বন্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।

শুধু সে-বছর কেন, সঙ সেই যে বন্ধ হল, বাস—কলকাতা থেকে বরাবরের মতোই জেলেপাড়ার সঙ উঠে গেল।

কানাঘুষো শুনেছি, এই সঙ যেমন বিদেশী সরকারকে চটিয়েছিল, তেমনি এদেশের ভণ্ড চাঁইদেরও গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল।

যখন কলকাতা ছেড়েছি, তখন আমার বয়স তিন কি চার।

তবু একটা ঘটনার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

ছেলেবেলার স্মৃতির ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। তার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। শুধু ছাড়া-ছাড়া কিছু ফ্রীজ-হওয়া শট। কেন কোন্ ঘটনা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, ভেবে ঠাহর পাওয়া যায় না।

বারমহলের যে সিঁড়িটা দোতলায় উঠে গিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে ডানহাতে ছিল ঠাকুর্দার ঘর।

বেলা বাড়লেও তখনও ঠিক দুপুর হয় নি। ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্সটা খোলা। সেটা কোনো টেবিলে থাকত, না তক্তপোশের ওপর থাকত সঠিক মনে পড়ে না। টেবিলে থাকলে ঠাকুর্দাকে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। অথচ একেবারে ছোটবেলায় তাঁর বাবু-হয়ে-বসা ভঙ্গিটাই আমার কাছে ঢের বেশি চেনা ছিল।

যাই হোক, ক্যাশবাক্সের ডালাটা ছিল খোলা। ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্সটার ব্যাপারে বাড়ির সকলেরই একটা চাপা কৌতূহল ছিল। ঐটুকু পলকা টিনের বাক্সে কে আর তার যথের ধন গচ্ছিত করে রাখবে? মাসে পেনসন তো পেতেন ভারি বত্রিশ টাকা ছ আনা। সেকালে সেরেস্তাদারের আর কত মাইনে ছিল?

এ সত্ত্বেও গাড়ির মেয়েদের যে এত কৌতূহল ছিল তার একমাত্র কারণ তিনি ক্যাশবাক্সের চাবিটা পৈতের সুতোয় বেঁধে রাখতেন এবং ক্যাশবাক্সটাকে সব সময় আগলে বেড়াতেন।

সেদিন সেজোকাকা না ছোটোকাকা, কে আমার মনে নেই—সিঁড়ির ধাপগুলো লাফ দিয়ে টপকে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে ঠাকুর্দাকে বললেন, 'ভীষণ ব্যাপার। শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

শোনামাত্র ঠাকুর্দা তড়িঘড়ি তাঁর ক্যাশবাক্সের খোলা ডালাটা দমাস করে বন্ধ করে আগে চাবি আঁটলেন। তারপর অন্য কথা।

রাস্তায় তখন লোকে ছোটাছুটি করছে। কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার শব্দও নাকি শোনা গেছে।

পরে জানা গেল, ডাকাত নয়। যারা হানা দিয়েছিল তারা স্বদেশী। তারা নাকি মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচিয়েছিল।

ঠাকুর্দা যেভাবে তাড়াতাড়ি তাঁর ক্যাশবাক্স বন্ধ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল ডাকাতরা এরপর হয়তো তাঁর ক্যাশবাক্সটাও লুট করতে আসবে। ফলে, ছেলেবেলা থেকে আমাদের এই ধারণাই হয়েছিল যে, ওর তলাকার খোপে নিশ্চয় সাত রাজার ধন এক মানিকের মতো কোনো গুপ্তধন লুকনো আছে।

ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন তারও প্রায় দু দশক পরে। কিন্তু ক্যাশবাক্সটার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল।

পরে আমার মেজোকাকা ঠিক ঠাকুর্দার ভঙ্গিতে পৈতেয় বাঁধা চাবি দিয়ে প্রথম যখন সেই ক্যাশবাক্সটা খোলেন, তখন এতদিনের কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসেছিলাম।

ওপরের ছোটো-ছোটো খোপের কয়েকটাতে ভাগে-ভাগে রাখা ছিল টাকা থেকে পাইপয়সার কিছু কয়েন। একটা খোপে ডাকটিকিট। চওড়া খোপগুলোর একটাতে খাম পোস্টকার্ড এবং আরেকটাতে ফালি-করা কাগজে রোজকার জমাখরচ আর সেই খাতাটা যাতে তিনি নিত্যকর্ম হিসেবে গুনেগেঁথে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখতেন।

আমার আসল কৌতূহল ছিল নীচেকার অদেখা খোপটা সম্পর্কে। সেটা দেখে যে কী হতাশ হয়েছিলাম তা বলার নয়।

নীচের খোপটাতে ছিল দশ টাকার তিনটে নোট। সে মাসে সদ্য-পাওয়া তাঁর পেনশনের ভগ্নাবশেষ। বিধবা সেজো পিসিমাকে মানিঅর্ডার করা আর জমিদারকে খাজনা দেওয়ার রসিদ। আরও টুকিটাকি গুচ্ছের কাগজ। হলদে কাগজে লাল কালিতে লেখা নাতিনাতনীদের কুষ্ঠির ছক। একটা ছোট বাঁধানো খাতায় খুদে-খুদে অক্ষরে তাঁর স্বহস্তে লেখা বাংলা পাঁজির হিসেবে আমাদের সব জন্মতারিখ আর জন্মক্ষণ।

যাঁদের বাড়ি তাঁরা থাকতেন একতলায়।

নেবুতলার সেই বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাই ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। কেন সেটা পরে বলছি। জ্যাঠাইমা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। নীচের বাড়িতে ছিল আমাদের অবারিত দুয়ার। জ্যাঠাইমার অমন সুন্দর মুখে এমন একটা চাপা বিষাদ মাখানো ছিল যে, দেখে ভারি কষ্ট হত।

জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা দুজনেই বনেদি পরিবারের মানুষ। জ্যাঠামশাইরা কোন্নগর থেকে এসে কলকাতার বাসিন্দা হন। জ্যাঠাইমারা ছিলেন যাকে বলে কলকাতার কায়েত।

জ্যাঠামশাই বোধহয় কাজ করতেন বি-জি প্রেসে। উঁচু পদে থেকে ভালো মাইনেই পেতেন।

বাড়ির বারমহলের একটা এঁদো ঘরে জ্যাঠামশাই থাকতেন। অন্দরমহলে ছেলেদের নিয়ে থাকতেন জ্যাঠাইমা।

কবে কী কারণে জ্যাঠাইমার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল কেউ জানে না।

জ্যাঠামশাই তারপর থেকে অন্দরমহলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেন নি। মাইনের প্রায় পুরো টাকাটাই তিনি পরিবারের জন্যে খরচ করতেন। রোজ থলি হাতে বাজারে গিয়ে ভালো-ভালো তরিতরকারি, বড়ো-বড়ো মাছ কিনে আনতেন। মাসকাবারি বাজার আনতেন দু-হাতে বড়ো-বড়ো চটের থলি ঝুলিয়ে।

কিন্তু নিজে রোজ দুবেলা খেতেন এক ও'ছা পাইস-হোটেলে।

হাজার চোখের জলেও তাঁর গোঁ ভাঙা যায় নি।

কিন্তু যেটাতে সবাই খুব কষ্ট পেত, সেটা হল আড়ত থেকে তাঁর কয়লা আনার ধরনে। পিঠ কুঁজো করে প্রকাণ্ড একটা কয়লার বস্তা সারা পথ টেনে আনবার পর বাড়ির দোরে এসে তিনি হাঁপাতেন। দেখে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত, তারা বলাবলি করত, ভদ্দরলোকের কি মাথা খারাপ?

জ্যাঠামশাই কিন্তু সেটাই চাইতেন। লোকে দেখুক, ছি ছি করুক। তাতেই ছিল ও'র আনন্দ।

এই নেবুতলার গলিতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাপু-গান। খালি গা। হাতে একটা চাবুক। দু-কলি গান গাইছে আর তারপরই নিজের পিঠে চাবুক মারতে-মারতে মুখে আওয়াজ তুলছে : হা-পু। হা-পু।

ছেলেবেলায় কাউকে হাপু গাইতে দেখলেই আমার বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়ে যেত।

একটা হাফ-হাতা ফতুয়া আর হাঁটুতে-এসে-ঠেকা

একটা আট-হাতি ধুতি। এই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের পোশাক।

বারমহলের এই উদ্ভট আচরণ কিছুতেই ঠেকাতে না পেরে অন্দরমহল শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বারমহলের সাধ করে ডেকে আনা দুঃখ দেখে-দেখে অন্দরমহলের অনুভূতিতে ঘাটা পড়ে গিয়েছিল।

জ্যাঠামশাই যখন টেঁটি গামছা পরে বাইরের রোয়াকে বসে এইটুকু একটা শালপাতায় একটা করে বেগুনি ফুলুরি দিয়ে প্রাতরাশ সারছেন তখন তাঁকেই দেখিয়ে-দেখিয়ে ফুলবাবু সেজে তাঁর বড়ো ছেলে ময়রার দোকান থেকে এক চাঙাড়ি খাবার নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকত।

তাতে জ্যাঠামশাইয়ের এতটুকু ভাবান্তর হত না। ছেলেদের এত সব বারফাট্টাই, অন্দরমহলের এত যে ফুটানি—সবই তো তাঁর টাকায়। তাতে তিনি একটুও কাতর নন। বরং তাতেই তাঁর আনন্দ।

জ্যাঠামশাইকে পাড়ার লোকে হাড়কিপটে ভাবলেও আসলে তিনি মোটেই কঞ্জুস ছিলেন না। নিজেকে বঞ্চিত করে বউছেলেদের তিনি চাইতেন মুক্তহস্তে খরচ করে সুখী করতে। এই চাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

খিঁচ ছিল শুধু একটা জায়গায়।

জ্যাঠামশাই শুধু চাইতেন তাঁর দুঃখ দেখে ওরা ও'র জন্যে একটু দুঃখবোধ করুক।

এই নিয়েই ছিল যত ল্যাঠা। জ্যাঠামশাই চাইতেন জ্যাঠাইমা তাঁর হাবভাবে শুধু একটু বুঝিয়ে দিন যে, তাঁকে কষ্ট পেতে দেখে মনে-মনে উনিও কিছুটা কষ্ট পাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমাও ছিলেন তেমনি ট্যাঁটা। দিনভর হাসি-আনন্দে অন্দরমহলটাকে তিনি সরগরম রাখতেন।

নিজের কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতায় জ্যাঠামশাই যে আনন্দ পেতেন তাতে জ্যাঠাইমার দুঃখকে পরোয়া না করার ভাবটা সব সময় কাঁটার মতন বিঁধে থাকত।

নেবুতলার সেই গলি আজও ঠিক তেমনিই আছে।

কলকাতা থেকে বাঙালিদের হটাবাহার হওয়ার প্রক্রিয়া এই গলির পুরনো বাসিন্দাদের কত অংশকে উৎখাত করে সে জায়গায় অবাঙালি বানিয়াদের এনে বসিয়েছে সে-খবর আমার জানা নেই।

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ওপরের ভগ্নপ্রায় গাড়িবারান্দাটার দিকে জুল-জুল করে তাকাই। পুরনো দিনগুলোর জন্যে মন কেমন করে। নীচের হাফ-দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে পিছিয়ে আসি। ও-বাড়ির আজকের মানুষেরা কেউই আজ আমাকে চিনবে না। আর যদি এমন হয় যে, ও-বাড়িটা বড়োলোক অবাঙালি বেহাত করে নিয়েছে—তাহলে কলকাতার ওপর হয়তো আর আমার সে টান থাকবে না।

যেতে-যেতে ছেলেবেলার স্মৃতি হাতড়ে ভাববার চেষ্টা করি এ গলিতে এখন কী নেই।

নেই মুসলমান শালকরদের সেই দোকানগুলো। নেই হেলানো বাঁশের গায়ে টান করে বাঁধা দড়িতে শুকোতে-দেওয়া রঙবেরঙের সেইসব শাল-আলোয়ান, যা বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জাপানি পাখার মতো আস্তে-আস্তে নড়েচড়ে এ-গলিটাকে হাওয়া করত।

নেই প্রকাশ্যে প্রকাণ্ড কড়াইতে ফুটন্ত রসে জিলিপি ভাজতে-ভাজতে একহাতে গামছা দিয়ে ঘাম-মোছা খালি-গায়ে ভুঁড়ি-বার-করা সেই ময়রা ; তার বদলে বানানো মিষ্টিগুলো যেন ফুসমন্তরে উড়ে এসে চুপচাপ কাঁচের বাক্সে জুড়ে বসে।

নেই ফরাস-পাতা কবিরাজ মশাইয়ের সেই বৈঠকখানা, যেখানে রুগীর চেয়ে বেশি আসত পাড়ার যত গপ্পবাজ লোক।

খেলার বস্তি আজও আছে, কিন্তু সেইসব পেট-মোটা হালুইকর, রোগা-রোগা ডকের খালাসি, জলকলের মিস্ত্রি, ঘণ্টা-নাড়ানো টিকিঅলা পুরুত, বিচিত্র-সব-জিনিস-বেচা ফেরিওয়ালা আর আলকোবালিওয়ালা—তারা সব গেল কোথায় ?

চুনসুরকির দোকানের পাশে থাকত কাবলিওয়ালারা। তারা এ-গলি থেকে অনেকদিন আগেই উবে গেছে।

আজকের কথা থাক। পুরনো কথার খেই ধরে এবার শুরু হবে আমার শৈশবে এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার গল্প।

[ক্রমশ

মুসলমান

অনিরুদ্ধ চৌধুরী

বহু বছর বাদে সুলতানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা।

প্রথমটায় চিনতেই পারি নি। দামি সাহেবি পোশাকে অভারতীয় বলেই ভুল করেছিলাম। গায়ের রঙটা একে-বারে ধবধবে ফরসা। চুলটাও খানিকটা লালচে ধরনের। সুলতানই বরং চিনতে পারল আমাকে, "আরে, আবু না!"

আমার নাম অবনী। সংক্ষেপে আবু।

হঠাৎ দেখা হওয়ায় দুজনেই ভারি খুশি। সুলতান বলল ওর হাতে তখন সময়ের অভাব নেই। আর আমার ডেরাটি কাছেই। সেখানেই নিয়ে এলাম ওকে।

আমাদের বাল্যকালটা কেটেছে বর্ধমানে। সুলতানের বাবা বর্ধমানের একজন বর্ধিষ্ণু জোতদার। গ্রামে ওদের অনেক জমি-জমা খেত-খামার। হিন্দু হলে ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই দোল-দুর্গোৎসব হত। বর্ধমান শহরেও ওদের পাঁচিলঘেরা মস্ত বাড়ি। সেখানে আমার হামেশা যাতায়াত ছিল—নানারকম দেবদুর্লভ খাদ্যের লোভে।

সুলতানের মা পরদা মানলেও আমার সামনে বের হতেন। তাঁর মতো সুন্দরী আমি কখনও দেখি নি। আগেকার দিনের পটের দুর্গাপ্রতিমার মতো—ঠিক ওই-রকমের টানা-টানা চোখ, তার নীচে গভীর কালো সুরমা আঁকা। তিনি তন্বীও ছিলেন না, পৃথুলাও নন—বলা চলে দোহারা, আর তাতেই যেন তাঁর রূপ বেশি করে খুলেছিল। আজকের ছেলেদের মতো ওই বয়সে আমরা এত পেকে উঠতাম না। তাই স্ত্রীলোকের রূপের মোহিনী মায়ার রহস্য অল্প বয়সে জানা হয়ে যেত না। দোর্দণ্ড-প্রতাপ খানসাহেব কেন যে স্ত্রীর কাছে হাত জোড় করে থাকতেন, তা ওই বয়সে বুঝব কেমন করে?

ফতেমা বিবির ঠোঁট দুটি পানের রসে সব সময় লাল হয়ে থাকত। হাতের ছোট্ট রুমালখানি দিয়ে ঠোঁটের কোনাদুটো আলগা করে মুছে নিতেন। মোছবার ভঙ্গিটা ছিল অপূর্ব। রুমালটি আবার মাঝে-মাঝে যেন অবহেলাভরে ঘরের কোনায় ফেলে দিতেন। চোখের নিমেষে কোথা থেকে তাঁর পেয়ারের বাঁদি এসে পরিষ্কার রুমাল হাতে গুঁজে দিয়ে ফেলে-দেওয়া রুমালটি কুড়িয়ে নিয়ে যেত। ও'র একটা ব্যাপার অবশ্য আমার চোখে বিসদৃশ মনে হত। তিনি রূপো-বাঁধান আলবোলায় দীর্ঘ নল দিয়ে তামাক টানতেন, নলটি আগাগোড়া জরি দিয়ে জড়ানো, আর মুখের কাছটি সোনার। যখন আমার বয়স

বেড়েছে, তখন মনে হয়েছে পরাক্রান্ত খানসাহেব একমাত্র সোনার কাছেই হার মানতে রাজি হয়েছিলেন।

ফতেমাবিবির জীবনের প্রধান ব্যসন ছিল রন্ধনচর্চা। কোপ্তা, কালিয়া, টিকিয়া ইত্যাদি এবং পরোটার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাবাব, পোলাও থেকে বিরিয়ানি, মিঠা পোলাওর সঙ্গে ফিরনির অপূর্ব সমাবেশ। সব নাম এখন মনেও নেই। কিন্তু জাফরানের গন্ধটি এখনও নাকে লেগে আছে।

ফতেমাবিবি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আবু, তুমি যে মুসলমানদের বাড়িতে খাও, তা তোমার আব্বা জানেন তো?" আমি বলেছিলাম, "বাবা তো শহরেই থাকেন না, দেশেই থাকেন প্রায় সব সময়। বলব কখন?"

ওঁদের বাড়িতে একটি ছোটো খাটের উপরে চাদর বিছিয়ে খাওয়া হত। মধ্যিখানে বিচিত্র ধরনের সব বাসন, বিচিত্রতর খাদ্যবস্তু, তার চারপাশে আমরা। সুলতানের মা নিজের হাতে সবার প্লেটে খাবার তুলে দিতেন। একদিন একটা পাত্রে দেখলাম রুপোলি তবকে মোড়া একটি লোভনীয় খাদ্য। ফতেমাবিবি সেই পাত্র থেকে সবাইকে তুলে দিলেন, কিন্তু আমাকে দিলেন না। আমি বললাম, "বাঃ, আমি বাদ কেন?"

ফতেমাবিবি মৃদু হেসে বললেন, "ওটা খাবে না তুমি।"

"সবাই খাবে, আমি খাব না কেন?" কণ্ঠে আমার অভিমান।

সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে ফতেমাবিবি অসহায়ভাবে বললেন, "কী বিপদ দেখো তো।"

সুলতান বলল, "গাধা, তুই ওটা খাবি কী করে? ওটা কি বকরির গোস্ত!"

"কী তবে ওটা?"

"গোরুর গোস্ত। ওই নিয়েই তো তোদের সঙ্গে আমাদের যত ঝগড়া-মারামারি।"

সুলতানের মার স্নেহ-ভালোবাসায় আমি ও বাড়িরই ছেলে হয়ে গিয়েছিলাম। ওই পরিবারের সঙ্গে সর্বক্ষণ ওঠাবসা করে আমাদের বাড়ির গোঁড়া হিন্দু সংস্কারটা বোধহয় আমার মধ্যে থেকে অনেকখানি আলগা হয়ে খসে পড়েছিল। আমি বললাম, "দেখি না একটুখানি খেয়ে—কেমন খেতে!"

নরম মানুষটি যে শক্তও হতে পারেন, সেদিন প্রথম জানলাম। বললেন, "না বাবা, একথা জানাজানি হলে সবাই তোবা-তোবা করবে। শরমে আমার মাথা হেঁট হবে।"

সুলতান বলল, "আম্মাও তো খায় না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনি খান না কেন?"

"কী জানি বাবা, দিল চায় না, অত বড়ো একটা জানোয়ার! ভাবলেই—।"

কথা শেষ করলেন না। অন্য কথা টেনে বললেন, "এমনিতেই আমার ডর লাগে। মুসলমানের দানাপানি খেয়ে তোমার জাত গেল কিনা কে জানে। নামাজের সময় আমি খোদার কাছে দোয়া মাঙি।"

সুলতান ফিসফিস করে বলল, "চেপে যা রে, চেপে যা।"

আমি তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "যাক কাকিমা, আপনি যখন খান না, আমারও খেয়ে কাজ নেই। তার চাইতে আর দুটো টিকিয়া দিন আমাকে।"

ফতেমাবিবির মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "কাল তোমাকে আমি মুরগা-রেজাল্লা খাওয়াব। আর ইরানি পরোটা।"

সেই রেজাল্লা আর ইরানি পরোটার স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে। কোনো হিন্দু বাড়িতে কোনোকালে কেউ এমন বস্তু রাঁধতে পারবে না। সব-কিছুর জন্যেই একটা ট্র্যাডিশন চাই। উচ্চাঙ্গের রান্না উচ্চাঙ্গ সভ্যতারই একটা অঙ্গ।

আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নানারকম বাছ-বিচার ছিল আমাদের বাড়িতে। সবচাইতে পবিত্র জিনিস ছিল গোবর। তারপরেই তুলসীপাতা আর গঙ্গার জল। হিঁদুয়ানিটা ছিল বাড়াবাড়ির পর্যায়ে। মুরগিও ঢুকতে পেত না বাড়ির ত্রিসীমানায়—কি জীবন্ত কি মৃত। কোনোদিন কোনো মুসলমানকেও ঢুকতে দেখি নি। সুলতান হেসে বলত, "আবু, তোরা কী রে! ছোঁয়া লাগলেই খোয়া যায়!"

আমিও হেসে বলতাম, "স্রেফ কুসংস্কার। একদিন সব কাটবে।"

সুলতান বলত, "কুসংস্কার আমাদেরই কি কম! মেয়েরা চোখে ঠুলি লাগিয়ে বোরখা পরে। উপাদেয় কচ্ছপের মাংস খাওয়া চলবে না।"

"কেন, কচ্ছপের মাংস চলবে না কেন?"

"কী করে চলবে! কচ্ছপ কি কোরবানি হয়?"

সুলতান বিলেত চলে গিয়েছিল ডাকতারি পড়তে। আমি পড়াশুনো ছেড়ে ব্যাবসা ধরেছিলাম। তারপর থেকে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। বাবার সঙ্গে বিশেষ বনিবনা হত না বলে আমার দেশে যাওয়া হত না। খবর পেয়েছিলাম, ফতেমাবিবি দু দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। আমার মা তো অনেক আগেই গেছেন।

দু বন্ধুতে মিলে অনেক পুরোনো কথা, অনেক গল্প হল। লক্ষ করলাম, সুলতানের মুখখানা ম্লান। আগের মতো উজ্জ্বল হাসি নেই চোখে। সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, "কী হয়েছে রে তোর? মুখটা অত গম্ভীর কেন?"

সুলতান বিষণ্ণ হেসে বলল, "কিছুতেই প্র্যাকটিসটা জমাতে পারছি না। ঘরের খেয়ে কতদিন চলবে? তার ওপর আবার মেম বিয়ে করেছি। খরচও অনেক বেড়েছে।"

অবাক হয়ে বললাম, "সে কী রে! ডাকতারদেরই তো মরশুম এখন। তার ওপর তোর বিলেতের ডিগ্রি!"

সুলতান কেমন ঝাঁঝালো গলায় বলল, "ওই বিলেতের ডিগ্রি আর মেমসাহেব বউ হয়েই তো সর্বনাশ হয়েছে।"

"তার মানে?"

"তা নয়তো কী! এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি নিয়ে কোনো মুসলমান বস্তিতে চেমবার খুলে বসলে পসারের অভাব? আমরা যাদের ছোটোলোক বলতাম তাদের হাতে কি এখন কম পয়সা? ফিস কমিয়ে দু টাকা করতাম। আর বারো আনার ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিয়ে চার টাকা আদায় করতাম। ডাকতার সাহেবকে সালাম করত সবাই দু বেলা। বস্তির বাদশা বনতাম। কিন্তু বিলেতের ডিগ্রি যে—তার ওপর চাইলড স্পেশালিস্ট!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন হচ্ছে না বল তো?"

সুলতান হেসে বলল, "কারণটা শুনতে তোর ভালো লাগবে না।"

"বল্‌ই না।"

"তোরা—মানে হিন্দুরা—ভয়ানক কমিউনাল। কিছু-তেই ডাকবে না মুসলমান ডাকতার।"

"তোর এই ধারণা!"

"নিশ্চয়। দেখ, এটা নিজের দেশ ভেবে পাকিস্তানে পালাই নি আমরা। এই রাক্ষুসি কলকাতা ছেড়ে পৃথিবীর আর কোথাও মন বসে না। এটা সাঁতাকারের সেকুলার স্টেট। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের পাত্তা দেয় না, আর এই কলকাতা শহরে বিশিষ্ট লোক, ভদ্রলোক, বড়ো চাকুরে বলতে সবাই তো প্রায় হিন্দু। ঢোলা প্যান্ট আর বোতামখোলা বুশশার্ট গায়ে দিয়ে মুসলমান বস্তিতে বসতে হবে শেষ পর্যন্ত, নয়ত বিলেত পালাতে হবে।"

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, "শোন্, তোকে একটা কথা বলি।"

"কী কথা, উপদেশ দিবি নাকি?"

"না, তবে তোর কথাটা ঠিক নয়।"

"কোনটা? হিন্দুরা কমিউনাল নয় বলছিস? একশো বার কমিউনাল।"

"মোটামুটিভাবে কমিউনাল তো প্রায় সবাই।"

"কমিউনালিজমের দুটো ধরন আছে—একটা সমষ্টি-গতভাবে, আরেকটা ব্যক্তিগত জীবনে। মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে কমিউনাল। অনেকটা উগ্র ন্যাশনালি-জমের মতো। মুসলিম ইন ডেনজার শুনলেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ওরা খেপে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ওরা সেপারেটিসট হতে পারে, সেকটেরিয়ান হতে পারে, কিন্তু কমিউনাল নয়। হিন্দুদের ওরা ঘেন্না করে না। আর হিন্দুরা ঠিক উলটো—সমষ্টিগতভাবে হিন্দুরা কমিউনাল নয়। তাই এ দেশটাও হিন্দুরাজ্য নয়। এদেশের হিন্দুরাজারাও কখনো অহিন্দু প্রজাদের হিন্দু বানাবার চেষ্টা করে নি। তার কারণ অবশ্য হিন্দু-দের অহমিকা এতই সাংঘাতিক যে হিন্দু হয়ে না জন্মালে আর কেউ হিন্দু হতে পারে না। পৃথিবীতে আর কোথাও এমন অহমিকা দেখা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি-গত জীবনে অধিকাংশ হিন্দুই কমিউনাল।"

আমি চুপ করে সুলতানের কথা শুনছিলাম। শান্ত গলায় বললাম, "আর কিছু বলবি?"

"বলবই তো। হিন্দুরা মুসলমানদের সামনে না হলেও পেছনে নেড়ে, পাতিনেড়ে এসব বলে। অন্তর

থেকে তাচ্ছিল্য করে। এখনও মুসলমান শুনলেই বহু হিন্দুবাড়ির মেয়েদের রেপ-এর কথা মনে হয়। বল্ হয় কিনা?"

আমি হেসে বললাম, "তোর কথাটাকে একেবারে মিথ্যে বলতে পারি না। তবে সে তো ছোটোলোক মুসলমানদের বেলায়। ঠিক যেমন লখনৌর খানদানি মুসলমানরা গুন্ডা শুনলেই ভাবেন কাশীর হিন্দু গুন্ডা।"

সুলতান হেসে ফেলে বলল, "দেখ, আজকের দিনে এসবের কোনো মানে নেই। তুইও সকাল-সন্ধ্যায় গায়ত্রী পড়িস না। আমিও পাঁচবার নামাজ পড়ি না। তোরও টিকি নেই। আমারও নুন্নে নেই। তোরাও একটা বিয়ে করিস, আমরাও কিন্তু চারটে করি না। তোরাও অখাদ্য খাস। আমরাও খাই। তবু কেন এত ডিফারেনস বুঝতে পারি না।"

"নিতান্তই সংস্কার।"

"শুধু সংস্কার!"

"আরে সংস্কারকে অত তাচ্ছিল্য করিস না। একটা গল্প বলি শোন্।"

"বল্।"

"একজন ধনী হিন্দু বিধবার একটি মুসলমান উপপতি ছিল। তাকে ছাড়া বিধবা মহিলার একটি রাতও চলত না। কিন্তু প্রতিটি একাদশীর রাত্রে মুসলমানটি এলেই বিধবা বলত, "দেখ মিনসে, আজ একাদশী। যা খুশি কর, কিন্তু সাবধান, মুখটা এঁটো করে দিস না।"

গল্প শুনে সুলতান হো-হো করে হেসে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "আজকে যাই আবু।"

আমি সস্নেহে ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললাম, "দেখ, আমি তো কট্টর হিন্দু বাড়ির ছেলে। আমার ধারণাটা শোন্। হিন্দুরা ব্যক্তিগত জীবনে কমিউনাল হোক আর যাই হোক, আসলে বড় হুঁশিয়ার জাত। নিজের স্বার্থটি সবার ওপরে। যেখানে স্বার্থের ব্যাপার, সুবিধের ব্যাপার —সেখানে হিন্দুরা জাত-ধর্ম কিছুই মানে না। মুসলমান বাদশাদের অনেক গুণগান গেয়ে সংস্কৃত পন্ডিতরা আখের গুছোয় নি? তুই যদি সত্যি ভালো ডাকতার হয়ে থাকিস, তখন দেখবি তোকে নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে এই কলকাতা শহরে।"

তারপর সুলতানের সঙ্গে যোগসূত্রটি আবার হারিয়ে ফেললাম। বাস্তব জীবনে সময় যে কোনখান দিয়ে কখন পার হয়ে যায় তা কেউ টের পায় না—বিশেষ করে টাকার নেশায় যারা মশগুল। আমার জীবনে সাফল্য এসেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বালিগঞ্জে বাড়ি করেছি নিজে। কলকাতার সমাজ-জীবনের যেটা স্বপ্ন সে স্বপ্নও সফল হয়েছে। ক্যালকাটা ক্লাবের মেমবার হয়েছি।

যেদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার পর বোধহয় দশ বছর কেটে গেছে।

ক্লাবের পেছনের বারান্দায় বসে একদিন সন্ধ্যায় একাই মদ্যপান করছিলাম। এমন সময় ব্যারিস্টার ঘোষ তাঁর ঢিলেঢালা পোশাকে লম্বা পাইপে সিগারেট মুখে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কলকাতা হাইকোর্টের ডাকসাইটে ব্যারিসটার। আমাকে দেখে আমার টেবিলে এসে বসলেন। আমি বেয়ারাকে হুইসকি আনবার ইঙ্গিত করে ঘোষসাহেবকে প্রশ্ন করলাম, "ক দিন দেখি নি যে আপনাকে।"

ঘোষসাহেব তাঁর সুদীর্ঘ পাইপটি নামিয়ে বললেন, "একটা ইমপসিবল সিচুয়েশন হয়েছিল।"

"কী হল আবার?"

"ছেলেটার ক দিন ধরেই ভয়ানক অসুখ। নোবডি নিউ হোয়াট ওয়রু রঙ উইথ হিম। একটা ভালো ডাকতার নেই মশাই শহরে। আর যারা দু-একজন আছেন তাঁদের হাতে নাকি সময় নেই। তারপর নিজে গিয়ে সব এটিকেটের নিকুচি করে বগলদাবা করে ধরে নিয়ে এসেছি। বাস নিশ্চিন্ত। একেবারে সেফেস্ট হ্যানড। দু দিনের মধ্যে জ্বর ১০৪° থেকে ১০০°।"

"কার কথা বলছেন? ড. সেন?"

ঘোষসাহেব মুখ বিকৃতি করে গলা নামিয়ে বললেন, "ছ্যাঃ, কপালে করে খাচ্ছে। একটা টোটাল ব্লাফ।"

"তবে কে?"

"ড. সুলতান আহমেদ। অল্প বয়েস, মানে—অব ইয়ার্স এজ। সিম্পলি ব্রিলিয়ানট। নাম শোনেন নি?"

"শুনেছি।"

মনে মনে ভারি খুশি হলাম—আমার ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হয়েছে তাহলে। ঘোষসাহেবের কাছ থেকে সুলতানের ফোন নম্বরটা নিয়ে নিলাম।

রবিবার সকালবেলা টেলিফোন করলাম সুলতানকে। সুলতান বলল, "এত বছর বাদে মনে পড়ল বুঝি।"

আমি বললাম, "আর তুই তো সকাল-সন্ধে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস।"

"বিলীভ মী। তোর করপোরেশন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে। শুনলাম কোথায় বাড়ি করে চলে গেছিস। টেলিফোন গাইডে তো দেখলাম প্রায় গোটা পনেরো তোর নামের নাম। কোথায় খুঁজব বল্।"

আমি হেসে বললাম, "প্র্যাকটিস কেমন?"

দরাজ গলায় জবাব এল, "আল্লার মেহেরবানিতে ম্যালপ্র্যাকটিস করতে হচ্ছে না।"

"আজ তো রোববার। চলে আয় না।"

"অনায়াসেই আসতে পারতাম, কিন্তু একটা বিপদ হল যে।"

"বিপদ আবার কী?"

"না-না, বিপদ নয়, মানে আমার কয়েকজন মক্কেল সপরিবারে পিকনিকে যাচ্ছেন শহরতলিতে। আমাকেও যেতে হবে, কিছুতেই ছাড়বেন না।

"এরা সব মুসলমান না হিন্দু রে?"

ডাকতারসাহেবের উচ্চকণ্ঠের হাসি শোনা গেল টেলিফোনে, "হিন্দু রে, হিন্দু।"

আগামী রবিবার আসবে বলে ফোন রেখে দিল সুলতান।

দুটো রবিবার বাদ দিয়ে এল সুলতান। ওর সুন্দর চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। অন্তরের তৃপ্তির ছাপ পড়েছে মুখের প্রশান্ততে। বুদ্ধির আলোতে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। বললাম, "কেমন আছিস?"

হেসে বলল, "দেখতেই পাচ্ছিস।"

"তাহলে বিলেত চলে যাবার প্ল্যান আর নেই তো?"

"বেহেস্তেও যেতে চাই না এই কলকাতা রাক্ষুসিকে ছেড়ে।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "বল্, হিন্দুদের সম্পর্কে তোর ধারণা কি বদলেছে না বদলায় নি?"

উত্তরে সুলতান বলল, "আমার জীবনকাহিনীটা শোন্। তা থেকেই বুঝবি আমার ধারণাটা কী হতে পারে।"

সুলতান তার মোটা চুরুটটা ধরিয়ে গল্প বলতে শুরু করল—"বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি। তখনও আমার পশার তেমন জমে ওঠে নি। তবু হিন্দু-মুসলমান সব রকম রোগীই আসছে অল্প-বিস্তর। তখন রাত বারোটা কি একটা হবে, হঠাৎ কলিঙবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি আলুথালু বেশে এক ভদ্রলোক উদ্ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। আমাদের পাড়ারই একজন। চেহারায় চিনতাম, পরিচয় ছিল না। দরজা খুলতেই ভদ্রলোক বললেন, 'ডাকতারসাহেব, আমার ছেলেটা বোধহয় মারা যাচ্ছে। আসবেন একবার?' চলুন', বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে পাজামা পরেই বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখলাম, অবস্থা সুবিধের নয়। বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। বিলেতে হাসপাতালে পঁচ বছরে দুটো মাত্র এইরকম কেস দেখেছিলাম। ওষুধটা জানতাম। কিন্তু এদেশে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। ভয়ানক কন্ট পাচ্ছিল ছেলেটা। একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'গাড়ি আছে?'

'না।'

'ট্যাকসি ডাকুন শিগগির। ওষুধ আনতে হবে, আপনারা পারবেন না।'

ততক্ষণে মনে-মনে ভেবে নিচ্ছিলাম কোথায়-কোথায় এত রাতেও ওষুধটা পাওয়া যেতে পারে। ইনজেকশনটা তাড়াতাড়ি জোগাড় হলে বোধহয় বেঁচে যাবে ছেলেটা। ভদ্রলোক ঘুরে এসে শুকনো মুখে জানালেন, 'একখানাও ট্যাকসি নেই কোথাও।' আমার ছোটো গাড়িখানা বড়ো একটা বের করতাম না। সেটাই বের করে চললাম ওষুধের খোঁজে। ভদ্রলোকও এলেন আমার সঙ্গে। ও'র স্ত্রী ভয়ার্ত মুখে ছেলের পাশে বসে রইলেন।

কোথাও ওষুধ পাওয়া গেল না। অথচ তখন প্রতিটি মুহূর্তই ভয়ানক মূল্যবান। পি-জির একজন রেসিডেনট ডাকতার আমার বিলেতের বন্ধু। সে বলল, 'একটা নারসিং হোমে এই ইনজেকশনটা আছে আমি জানি। টেলিফোন করে দিচ্ছি। তুমি যাও। পেয়ে যাবে।' অত রাতে আবার ছুটলাম আলিপুরে নাক-উঁচুদের পাড়ায়। গাড়িতে কত তেল আছে তাও জানি না। কিন্তু তখন আর সেসব ভাববার সময় ছিল না। পেয়ে গেলাম দুটো ইনজেকশন। বুঝলাম বেঁচে গেল ছেলেটা। প্রচন্ড স্পীডে ফিরলাম। কিন্তু পাড়ার মোড় ঘুরতেই গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেল। গাড়ি ফেলে রেখেই ছুটলাম। ভদ্রলোক অসহায়ের মতো বললেন, 'গাড়ি চুরি হয়ে যায়

যদি।' আমি ধমকে উঠলাম, 'চুলোয় যাক গাড়ি, আপনি আসুন।'

ইনজেকশন দিয়ে নাড়ী ধরে বসে রইলাম। কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। ঘরের ভেতর রোগী আর আমরা তিনটি প্রাণী। ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ। আমরা যেন পরস্পরের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভদ্রমহিলা হঠাৎ ভেঙে পড়লেন। মাথা নীচু করে কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'ডাকতারবাবু, আমার ছেলে বাঁচবে তো।'

ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে রোগীর নাড়ীর গতি স্বাভাবিক বেগ নিচ্ছে। রোগীর হাত ছেড়ে দিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'বাঁচবে, আল্লাকে ধন্যবাদ দিন।' আমি বলতে যাচ্ছিলাম ঈশ্বর, কিন্তু আমি যে মুসলমান সেই কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যই বললাম—আল্লা। ভদ্রমহিলা মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কথা শুনে যখন মুখ তুললেন, তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু-বন্যা নেমেছে। কিন্তু মুখে একটুকরো শুভ্র হাসি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলে যাবেন না, এখুনি আসছি আমি।'

আমি আবার নাড়ী ধরে বসলাম। মনটা ভারি খুশি। নাড়ী স্বাভাবিক। ধোঁয়া-ওঠা কফির কাপ নিয়ে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। সেই থেকে ও বাড়ির এক নিকটতম আত্মীয় হয়ে উঠলাম আমি। ভালো-মন্দ রান্না হলেই আমার বাড়িতে আসবে। বাড়ির কর্তা সৌম্যেনবাবু পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও একবার আসেন চেম্বারে। এরপর থেকেই লক্ষ করলাম আমার পসার দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করল। কিন্তু তখনও কলকাতার উঁচু মহলের দরজা আমার কাছে বন্ধ। আর-একটি ঘটনায় সেই দরজাটি খুলে গেল। সেজন্যেও সৌম্যেনবাবুর কাছে আমি ঋণী।

গল্প বলতে-বলতে সুলতানের চুরুটটি নিভে গিয়েছিল। চুরুটটা আর-একবার জ্বালিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল। ওকে যেন গল্প-বলার নেশায় পেয়েছে।

সৌম্যেন একটা বিশালকায় ইংগ-ভারতীয় কোম্পানিতে চাকরি করে। হাজার-বারো শ টাকা মাইনে পায়। ওর মিষ্টি স্বভাবের জন্য বড়োসাহেবরাও ওকে পছন্দ করে। আমি আর এখন সৌম্যেনের কাছে ডাকতারবাবু নই, ডাকতার-সাহেবও নই। একেবারে সোজাসুজি দাদা। একদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে আমার চেম্বারে এসে বলল, 'কালকে সকালে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'আমাদের বড়োসাহেবের বাড়ি। মানে, আমাদের ম্যানেজিঙ্ড ডাইরেকটর এস. কে. রয়।'

'ওঃ বাবা। তিনি যে মস্ত লোক হে। কলকাতার উঁচু সমাজের হোমরা-চোমরাদের একজন। আমার মতো চুনোপুটি ডাকতারকে তাঁর কী দরকার ?'

'কলকাতার বড়ো-বড়ো রুই-কাতলা ডাকতাররা হার মেনেছে। এক বছরের ওপরে ভুগছে ওঁর ছেলেটা। দশ বছরের মোটাসোটা ছেলে শুকিয়ে একেবারে কাঠি। রায়-সাহেব তো সমস্তক্ষণ আগুন হয়ে আছেন। সাহেব মানুষ, তাও তাবিজ কবচ পরিয়েছেন। হোম-যজ্ঞতজ্ঞও হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাকে কেন ?'

সৌম্যেন বলল, 'আমি জানি দাদা আপনি ধন্বন্তরি। বেঁচে যাবে ছেলেটা। রায়সাহেবকে আমিই বলেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'যোলো টাকা ফীসের ডাকতারদের ওপর আস্থা হবে ওইসব ধনীদের ?'

সৌম্যেন ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল, 'এই রে, সে কথা তো আমার মনে ছিল না। আমি তো বত্রিশ বলেছি।'

ওর কথা শুনে আমি শুদ্ধু মুচকি হেসেছিলাম।

পরদিন নটা নাগাদ সৌম্যেনকে নিয়ে আলিপুরের সম্ভ্রান্ত পল্লীতে পৌঁছলাম। একটা বিরাট ড্রয়িঙরুমের পাশ দিয়ে রায়সাহেবের স্টাডিতে ঢুকলাম। ছিপছিপে চেহারার ভদ্রলোক, মুখখানা কিন্তু গুরুগম্ভীর। চোখে পুরু কাচের টরটয়েজ সেলের চশমা। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। মুখের ভাবে মনে হয়, দুনিয়াটা বুঝি পায়ের তলায়। পরনে সাদা রেশমের একটি হাফশার্ট। অত্যন্ত মূল্যবান কাপড়ের কালো ট্রাউজারস। বিরাটকায় একটি গদিমোড়া চেয়ারে বসে মুখে পাইপ লাগিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম, কাগজখানা স্টেটসম্যান বা টাইমস অব ইনডিয়া নয়। লন্ডন টাইমস। দূর থেকে অবশ্য তারিখটা দেখতে পেলাম না।

আমরা ঢুকতে উঠেও দাঁড়ালেন না, নমস্কারও করলেন না। চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'বসুন।' সৌম্যেনকে বললেন, 'বোসো।' তারপর কোনো ভূমিকা না করেই মোটা একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একবছরের পুরনো কেস। এর ভেতরে এনটায়ার কেস হিস্টরি আছে। পড়ে দেখুন।' আমি সযত্নে ফাইলটা পাশে রেখে দিয়ে বললাম, 'পরে দেখব। আগে রুগীকে দেখি।' রায়সাহেবের মুখ দেখেই বুঝেছিলাম তিনি বিশেষ বিরক্ত হলেন, মুখে বললেন, 'কেস হিস্টরিটা দেখে নিলে পেশেনটকে একজামিন করতে সুবিধে হত না ?'

আমার একটু রাগ হলেও বিনীতভাবে বললাম, 'আজ্ঞে না, বরং প্রেজুডিসড হয়ে যেতে পারি।' ভদ্রলোকের মুখের ওপর থেকে কালো পাতলা পরদা যেন সরে গেল। তিনি আমার বক্তব্য বুঝতে পারলেন।

রায়সাহেব আমাকে নিয়ে ওপরে উঠলেন। আগাগোড়া লাল কারপেটে মোড়া প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। রোগীর ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটিও বিরাট। একদিকে সোফা-কাউচে বসবার ব্যবস্থা, অন্যদিকে জানলার কাছে খাট, বেডসাইড টেবিল প্রভৃতি। ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। মোটা সিলকের বড়ো-বড়ো পরদা ঝুলছে। প্রায় অন্ধকার ঘরখানায় একটি বিজলি বাতি। ঘরে এয়ার-কনডিশনের ঠান্ডা এবং ইউডিকোলনের গন্ধ। খাটের পাশে আরামকেদারায় বসে বুঝতে পারলাম রায়গৃহিণী। হাত-পিঠ আর গলা-কাটা অতি সূক্ষ্ম সাদা রঙের ব্লাউজ। হালকা সবুজ রঙের সিলকের শাড়ি। রূপকে রাখা-ঢাকার কোনো প্রয়াস নেই। রূপ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রুক্ষতাও কম নয়। স্বামীর অর্থ এবং পদমর্যাদার গৌরব আর নিজের রূপের গরিমায় মনের যে অহংকার, তারই প্রলেপ পড়েছে মুখে। চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছেলেকে ইংরেজি গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ঘরের এক-পাশে একটি চেয়ারে একজন নার্স।

আমরা ঢুকতেই নার্সটি উঠে দাঁড়াল। শ্রীমতী রায় কেবল বসবার ভঙ্গিটি পরিবর্তন করলেন। আমি বহুক্ষণ ধরে ছেলেটিকে পরীক্ষা করলাম। দু-চারটে কথাও বললাম তার সঙ্গে। বেশ চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে। তবে ভারি ক্লান্ত। আমার কী একটা কথায় খুব হাসল। বুঝলাম প্রথম পদক্ষেপে জয় হয়েছে। রোগীর পছন্দ হয়েছে ডাকতার।

রোগী-দেখা শেষ করে নার্সকে বললাম, 'জানলাগুলো সব খুলে দিয়ে পরদাগুলো সব টেনে দিন। আর এ. সি.টা বন্ধ করে দিন।'

দোতলার ল্যানডিঙ-এর সামনে প্রশস্ত জায়গা জুড়ে স্থিতীয় একটি ড্রয়িঙরুম। সেখানেই বসতে বলে রায়সাহেব কেস হিস্টরির ফাইলটা আবার এগিয়ে দিলেন। আমি যখন মনোযোগ দিয়ে ফাইলটা পড়ছিলাম, তখনই বোধহয় শ্রীমতী রায় স্বামীর পাশে এসে বসেছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার একটা কথাও হয় নি। তবে তিনি যে ভ্রূ কুঁচকে আছেন, সেটা বোঝার জন্য তেমন প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না।

আমি পড়া শেষ করে ফাইলটা বন্ধ করতেই রায়সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারলেন কিছু ?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'বুঝেছি।'

'কী সেটা ?'

'সবটা আপনাদের বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তবে সামান্য একটা জিনিসকে ভুল করে বিপজ্জনক করে তোলা হয়েছে।'

রায়সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'ইয়ু মীন রঙ ডায়াগনোসিস।'

আমি সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

রায়গৃহিণী বিরক্তি চাপবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বললেন, 'এত বড়ো-বড়ো সব ডাকতার, সবাই ভুল করলেন ?'

আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলাম, 'ভুল হয় না শয়তানের। মানুষমাত্রেই ভুল হয়, তা ছাড়া...'

রায়গৃহিণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কী তা ছাড়া ?'

আমি হেসে ফেলে বললাম, 'ধনী মানুষের বাড়িতে ধৈর্যের অভাবে চিকিৎসা-বিভ্রাট ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়।'

রায়সাহেব বললেন, 'আপনি কী ভাবছেন ?'

আমি বললাম, 'অল্প সময়ের মধ্যেই সেরে যাবে। এক্ষেত্রে ওষুধের চাইতে ডায়েটটাই বেশি ইমপরটানট। কী খেতে দিচ্ছেন ?'

রায়গৃহিণী বললেন, 'প্র্যাকটিকালি কিছুই না। মেইনলি দুধ আর টোস্ট। অনেকগুলো টনিক।'

'ওষুধগুলো আর দুধটা একেবারে বন্ধ করে দিন। টনিকের কোনো দরকার নেই। হালকা করে মাছ-চিকেন আর অল্প ভাত। এই ওষুধটা লিখে দিচ্ছি—দুবেলা খাবার পরে দেবেন।'

প্রেসক্রিপশন লিখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রায়গৃহিণী বললেন, 'প্লীজ! ডোনট মাইনড ডকটর। রোগা

শরীরে মাছ-ভাত খেয়ে যদি খারাপ হয়! জ্বরেও তো পুরো রেমিশন হয় নি।'

'কিছু খারাপ হবে না।'

'আপনি কী করে বুঝছেন যে আপনারও ভুল হচ্ছে না।'

'আমার যে ভুল হচ্ছে না, পাঁচ-ছ দিন গেলে আপনারাও বুঝতে পারবেন।'

রায়গৃহিণী কিছু বলবার আগেই নারসটি এসে জানাল যে খোকা ডাকতারসাহেবকে ডাকছে।

সে কথা শুনে রায়সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! খোকা তো ডাকতার দেখলেই চোখ বুজে থাকে।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্লীজ, গো অ্যানড সী হিম ডকটর।'

রায়গৃহিণীর মুখে বিরক্তির ছাপ অধিকতর স্পষ্ট হল। আমি খোকার ঘরে চলে গেলাম। খাটের কাছে যেতেই খোকা আমার হাতখানা ধরে বলল, 'আমি একটা চকলেট খেতে চাই।'

হেসে প্রশ্ন করলাম, 'চকলেট, না টফি।'

খোকাও হেসে জবাব দিল, 'চকলেট—অনলি ওয়ান প্লীজ, ডকটর।'

আমি ওর গালটা একটু টিপে দিয়ে বললাম, 'শিয়োর।'

বাইরে এসে রায়সাহেবকে বললাম, 'খোকাকে একটা ছোটো ক্যাডবেরি চকলেট আনিয়ে দিন।'

রায়গৃহিণী আঁতকে উঠলেন, 'আর ইয়ু ম্যাড! চকলেট খাবে ও!'

আমি বিনীতভাবে হেসে বললাম, 'মাদাম, রেসপনসিবিলিটি ইজ মাইন।'

রায়সাহেবের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'অলরাইট।'

গাড়িতে উঠে সৌমোনকে বললাম, 'কী হে সৌমোন, বত্রিশ টাকা দূরে থাক, ষোলো টাকাও তো দিল না।'

সৌমোন হো-হো করে হেসে উঠল, 'দাদা কিছুই জানেন না এখনো। আজকালকার সত্যিকারের ধনীরা সব রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো। হাতে টাকা ছোঁয় না। আপনি অফিসে বিল পাঠিয়ে দেবেন। আপনার কাছে চেক পৌঁছে যাবে।'

যাই হোক, খোদার দোয়ায় ছেলেটা ভালো হতে লাগল। রায়গৃহিণীও ক্রমশই সদাশয় হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রয়োজন না হলেও নিয়ম করে সপ্তাহে একবার যেতেই হত। আমি বলতাম, 'এখন আর বারবার আসার দরকার নেই।'

কিছুতেই শুনতেন না সে কথা। তা ছাড়া কখনও কখনও হঠাৎ টেলিফোন আসত রায়গৃহিণীর, 'কী, খুব বিজি আছেন না কি?'

'কেন বলুন তো?'

'না, মানে, খোকা আপনাকে আসতে বলছে একবার।'

আমি টেলিফোনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে ফেলতাম—সম্পর্কটা তো তখন অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বলতাম, 'খোকার মা বাবা বলছেন না তো?'

ভদ্রমহিলাও হেসে ফেলতেন 'এই নিন, খোকার বাবার সঙ্গে কথা বলুন।'

রায়সাহেব টেলিফোন নিয়েই উদার কণ্ঠে বলতেন, 'ডক, ইউ হ্যাভ ওন এভরিবডিস হার্ট, প্লীজ ডু কাম ফর আ লিটল হোয়াইল।'

এমনি করে খোকাও সম্পূর্ণ সেরে উঠল। আর রায়পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও পাকা হল।

রায়গৃহিণী খোকাকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনে চলে গেলেন মাসখানেকের জন্য।

সকাল থেকেই খুব ঠান্ডা পড়েছিল সেদিন। বাড়ির সামনের ফুটপাথে সুন্দর রোদ পড়েছিল। আমি আলোয়ানটি বেশ ভালো করে জড়িয়ে সেখানে পায়চারি করছিলাম। হঠাৎ বিরাট একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই গাড়ি থেকে নামলেন রায়গৃহিণী।

বললাম, 'কবে এলেন?'

'কাল। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলব নাকি।'

"না-না, ভেতরে আসুন।"

সসম্ভ্রমে ওঁকে নিয়ে ভেতরে বসালাম। বিনা ভূমিকাতেই রায়গৃহিণী বললেন, 'কালীঘাটে গিয়েছিলাম পুজো দিতে। প্রসাদ এনেছি। আপনার নিতে আপত্তি নেই তো।'

বললাম, 'প্রসাদটা মনের ব্যাপার। সন্দেশটা রসনার। সন্দেশে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।'

বিরাট একবাকস সন্দেশ হাজির করল ড্রাইভার। ড্রাইভার চলে যেতেই রায়গৃহিণী দু হাত দিয়ে আমার ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরলেন। ওঁর দু চোখ ছলছল করে উঠেছে তখন। ধরা গলায় বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করতে হবে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কী!'

রায়গৃহিণী বললেন, 'মুসলমান বলে প্রথমে কোনো দাম দিই নি আপনাকে। আমি তো কল দিতেই রাজি ছিলাম না। আর প্রথম দিনের ব্যবহারটা হয়তো মনে আছে।'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।

'এই কনফেশনটা না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না মনে।'

সেই থেকে রায়গৃহিণী আমার দিদি হলেন। প্রথমে রানীদি, তাতেও হল না—এখন শুধু দিদি ডাকি। ভাই-ফোঁটায় ফোঁটা নিতে হয়। ওঁর নিজের কোনো ভাই নেই। এখন আমিই ওঁর ভাই। রায়সাহেব আমাকে রহস্য করে ডাকেন, 'মুসল সম্বন্ধী।' আজ যে বড়োলোক-মহলে আমার এত প্র্যাকটিস, তার মূলে ওই রায়-দম্পতি। সত্যি, এত ভালোবাসা যে তোলা ছিল আমার সে কথা কখনও ভাবি নি।'

গল্প শেষ হলে আমি বললাম, "তা হলে এতদিনে মত পালটেছিস নিশ্চয়?"

"কোন্ মত?"

"এখন তো আর বলতে পারবি না যে হিন্দুরা কমিউনাল।"

সুলতান মাথা নেড়ে বলল, "আব্বু, তোর ছোটো-বেলায়ও বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না। আর এখনও হল না।"

আমি বললাম, "এত সব ঘটনার পরও তুই হিন্দুদের কমিউনাল বলবি?"

"আলবত বলব। ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে কিনে ফেলতে পারে ওরা। ভাবো একবার, আমি মুসলমানের ছেলে। আমাকে কালীপুজোর প্রসাদ খাওয়ায়। ভাই-ফোঁটা দেয়। বিজয়াদশমীর দিন ওদের ছেলে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।"

আমি বললাম, "তাতে কী প্রমাণ হল?"

সুলতান বলল, "ওরে গর্দভ, ওরা এত কমিউনাল যে ওরা আমাকে মুসলমান বলে ভাবতেই চায় না। হিন্দুই করে ফেলেছে প্রায়।"

আমি হেসে বললাম, "তা হলে তোর ধর্মরক্ষার উপায়?"

সুলতান গম্ভীর হবার চেষ্টা করে উত্তর দিল, "সকাল-সন্ধ্যা কোরান পড়ছি, নামাজ পড়ছি দিনে পাঁচ-বার, আর একটা পারশিয়ান ফেজ অর্ডার দিয়েছি।"

সোনা, ডলার আর দরিদ্র দেশ

ইন্দ্র সেন

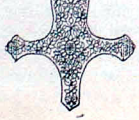

বেশি দিনের কথা নয়—গত বছর জুলাই মাসের মাঝামাঝি মাদরাজের মীনাম্বাকম বিমানবন্দরে এক ব্রিটিশ নাগরিক প্রচুর-সোনা-সুদ্ধ ধরা পড়ল।

সোনার চোরাকারবার কিছু নতুন নয়। এক সময় বেআইনি আমদানির ভিতর সোনারই ছিল প্রাধান্য। কিছুদিন আগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিদেশে সোনার দাম অত্যন্ত বেশি উঠে গেলে লাভের অঙ্কে টান পড়ে। মুনাফা ঠিক রাখতে হলে এদেশে যে দামে সোনা বিক্রি করতে হয়, সেই দামে যথেষ্ট সংখ্যায় ক্রেতা পাওয়া শক্ত। এমনিতেই বিয়ের সময় সোনার গহনা দেওয়ার পরিমাণ কমেছে। কাজেই, চোরাকারবারিরা হাত লাগায় সিনথেটিক কাপড়ে, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রে। তবে মাদরাজে সম্প্রতি এক যাত্রীর কাছে যে সোনা পাওয়া যায়, তার পরিমাণ কম নয়—১২ কিলো। অতি সম্প্রতি, কলকাতার বিমানবন্দরেও কয়েক বার সোনা-পাচারি গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে কি সোনার আদর বাড়ছে চোরা-কারবারিদের কাছে? অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আন্দাজ—এখন মাসে পাঁচ থেকে দশ টনের মতো সোনা আসে চোরা-চালানে।

সাম্প্রতিক কালে ইনদোনেশিয়ার অভিজ্ঞতাও এরকম ইঙ্গিত দেয়। জুলাই মাসে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে সিঙ্গাপুর থেকে বেআইনি সোনা আমদানির। ধরা পড়ে সিঙ্গাপুরি নাগরী-বিমানকর্মী, ইনদোনেশিয়ার অফিসার-সহ জাহাজকর্মী, আর সিঙ্গাপুরবাসী নরওয়ের এক জাহাজ-পরিবহণ-বিশেষজ্ঞ। সোনার পরিমাণও প্রতি ক্ষেত্রেই ভালো। একটি ঘটনায় সোনা ছিল ২১ কিলো।

সিঙ্গাপুর থেকে সোনা-পাচার বহুদিন থেকে চলে আসছে। ওখানকার লোকে সোনার গহনা বেশি কেনে না। সোনার দামও বরাবরই কম। জুলাইয়ের শেষে আরও কমেছে। কারণ, বিদেশের বাজারে সোনার দাম পড়তির দিকে। ডিসেম্বরে প্রতি আউনসের দাম বিদেশের বাজারে ছিল ৩২৮ ডলার। অর্থাৎ দশ গ্রাম সোনার দাম ১২৭৬ টাকা। ভারতের তুলনায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কম। কোনো ভারতীয় সিঙ্গাপুরে সোনা কিনলে সে প্রতি তোলা ৬০০ টাকা সস্তায় পাবে।

একুশে ডিসেম্বর কলকাতায় দশ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১৮৬০ টাকা। দিল্লী আর মাদরাজে ভালোরকম বেশি। কেবল বোমবাইতে কিছু কম। কিন্তু বিদেশে

গহনা বেচলে ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক যে সোনা রপ্তানি করবে তাকে বেচবে আন্তর্জাতিক মূল্যে। দশ গ্রামের ১৩৪৩ টাকা হিসাবে। এ দুই দামের পার্থক্য প্রায় ৫২০ টাকার মতো। এক তোলা এগারো আর বারো গ্রামের মাঝামাঝি। কাজেই তোলায় দামের ফারাক ৬০০ টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ, সিঙ্গাপুরে সোনা কিনে এদেশে গোপনে আমদানি করলে মুনাফা দাঁড়াবে তোলায় ৬০০ টাকা।

এর সবটাই অবশ্য হজম করা যায় না। বাহকরা ধরা পড়লে, সোনা বাজেয়াপ্ত হয়। বিচারের সময় ভালো উকিল-ব্যারিসটার দিতে পয়সা লাগে প্রচুর। অবশ্য এ খরচ অনেকটা পুষিয়ে যায় বাহকদের ছাড়িয়ে আনতে পারলে। ওদের পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য টাকা দিতে হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, বিদেশের বাজারে সোনার দাম বেশ কিছুদিন থেকে পড়তির দিকে। গত জুলাই মাসে কয়েক দিনের ভিতর দাম ৩০ ডলারের মতো কমে যায়। পরে কিছু ওঠে। অকটোবরে সোনার আন্তর্জাতিক দাম ছিল প্রতি আউনসে ৩৪৭-৮ ডলার, নভেম্বরে ৩৭৫ ডলার, ডিসেম্বরে ৩২৮ ডলার।

সোনার এ দুর্গতির কারণ—ডলারের দাম চড়েছে। তার কারণ, সুদের হার বেড়েছে। যার উদ্বৃত্ত টাকা আছে সে ডলারই কিনছে—সোনা কিনছে সামান্যই। কেননা, ডলার কিনলে সুদ পাওয়া যায় কার্যত শতকরা সাত-আট ভাগ। সুদের হার হল—সুদের হার থেকে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির হারের বিয়োগফল। সোনার দাম পড়ার কারণ ক্রেতার আপেক্ষিক অভাব—সরবরাহ হঠাৎ বেড়ে-যাওয়া নয়। কারণ যাই হোক, বেআইনি সোনা আমদানিতে লাভ বাড়তির দিকে।

অন্য দীর্ঘমেয়াদি কারণের ফলও হয়তো ফলতে শুরু করেছে। সত্তরের দশকে সোনার দাম খুবই বাড়ে। ফলে, সোনার খনি আবিষ্কারের কাজে হাত দেওয়া হয় ভালো-ভাবে। এতে পশ্চিমের দেশগুলির সোনা-উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়েছে বছরে ১০০ টনের মতো। দু-তিন বছরের মধ্যে হয়তো সোনার সরবরাহ বেড়ে যাবে ৫০ টনের মতো।

তবে কেন বিদেশের বাজারে সোনার দাম আরও বেশি কমে নি? একটা কারণ এই—১৯৮৩ সালের আগের তুলনায় সরবরাহ কিছুটা কম ছিল : ১৩১৫ টনের জায়গায় ১২৪০ টন। তবে আরও বড়ো কারণ—ওয়াল স্ট্রীটের ধারণা, ১৯৮৫ সালে বা তার পরের বছরে দেখা দেবে মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধি। আর সেই কারণেই কিছু লোক এখনও সোনা কিনছে। ক্রেতার সংখ্যা একে-বারে নগণ্য নয়। আরও একটি কারণ এই হতে পারে যে, কিছু লোকের হাতে লগ্নি থেকে আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তারা সোনার গহনা কিনছে বেশি করে।

এখন দেখা যাক, মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার কারণ কী? কারণটা অবশ্য একটু অসাধারণ। কয়েক মাস আগেও আমেরিকার আর্থিক ব্যবস্থা চলেছে অভাবনীয় রকম ভালোভাবে। ১৯৮৪-র শেষ তিন মাসে অর্থনৈতিক বিকাশের হার ছিল ২·৮ শতাংশ—আগের তিন মাসের তুলনায় অনেক ভালো। তখন হার ছিল ১·৬ শতাংশ। বছরের শেষের দিকে উন্নতি হলেও প্রথম আর দ্বিতীয় তিন-মাসের তুলনায় বেশ কম। প্রথম তিন মাসের হার ছিল ১০·১ শতাংশ, দ্বিতীয় তিন মাসের ৭·১ শতাংশ। এ-সমস্ত পরিসংখ্যানই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিহার বাড়তির ভাগ বাদ দিয়ে হিসাব করা।

১৯৮৪ সালের বিকাশের হার ধরা হয় শতকরা ৬·৭। রেগন সরকারের হিসাবে ৭·৯২ শতাংশ। ১৯৮৫ সালে হয়তো বৃদ্ধির হার আরও কমবে। কমলেও বিকাশের হার একেবারে কম হবে না। মূল্যবৃদ্ধি খুবই সামান্য। বেকারি কেবল বাড়তে শুরু করেছে। লগ্নি এখনও খারাপ নয়। আর বিকাশের হার কমা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ কমতি অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। না-কমার কারণ হয়তো রাজনৈতিক।

বিকাশের হার উঁচু রাখার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছে বাজেটের বিরাট ঘাটতি—যার হার হল বছরে ২০০ বিলিয়ন ডলার। ভবিষ্যতে হয়তো এ-হার ৩০০ বিলিয়ন ডলারে উঠবে। অন্তত রেগনের কর-উপদেষ্টা এরকম মনে করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালে রেগনের নির্বা-চনী প্রতিশ্রুতি ছিল ১৯৮৩ সালে বাজেট ঘাটতি দূর হবে। উপায়—খরচ কমানো। কল্যাণমূলক কাজের জন্য খরচ কিছু কমানো গেলেও প্রতিরক্ষার খরচ বেড়েছে অনেক বেশি। আর এর সঙ্গে ট্যাকস কমানো হয়েছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমত। ফল যা হওয়ার তা হয়েছে—বিরাট বাজেট ঘাটতি।

ঘাটতি পূরণের জন্য চাই বিপুল ঋণ। আর সে

ঋণ পাওয়ার জন্য সুদের হার বাড়াতে হয়েছে প্রচণ্ড-ভাবে। এক হিসাবে দেখা যায়, ব্যক্তিগত আয়কর হিসাবে যা পাওয়া যায় তার এক-তৃতীয়াংশ যায় জাতীয় ঋণের বাৎসরিক সুদ দিতে। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। সুদের হার চড়া বলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে টাকা আসছে অপর্যাপ্ত। এ সব দেশই মারকিন মুলুকের মতো ধনী নয়। কিন্তু তারা সবাই চায় আমেরিকায় সম্পত্তি কিনতে, মারকিন মাল কিনতে নয়। ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ এখন আর মূলধন রপ্তানি করছে না। অন্যান্য দেশের সঞ্চয় এখন চলে যাচ্ছে মারকিন মুলুকে। ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী লগ্নি বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নিকে ছাড়িয়ে যায়। একটু-আধটু নয় ; এ দুয়ের পার্থক্য হল ৪৩·৬ বিলিয়ন ডলার। কিছু বৈদেশিক সম্পত্তি মারকিনদের বিক্রিও করতে হয়েছে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি এবং বাজেট ঘাটতি মেটাতে।

বাজেট ঘাটতির ফলে সুদের হার বাড়াতে হয়, আগেই বলেছি। সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক সঞ্চয়ের আগমন মারকিন মুলুকে। এর ফলে ডলারের চাহিদাবৃদ্ধি আর তার মূল্যবৃদ্ধি। ডলারের মূল্যবৃদ্ধি মানে বিদেশে মারকিন জিনিসের চড়া দাম। কাজেই, ওদেশের মাল বিদেশে কাটছে কম। আর-এক ফল হল, ওদেশে আমদানিকরা মালের দাম কমা। তাতে একদিকে বাণিজ্যঘাটতি বাড়ছে, অন্যদিকে দুর্বল মারকিন শিল্প প্রতিযোগিতা সামলাতে না পেরে আমদানির উপর বিধি-নিষেধ চাপাবার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। সফলও হচ্ছে। ১৯৮০ সালে আমেরিকার বাণিজ্য-ঘাটতি ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮৩ সালে তা ৬০ বিলিয়ন ডলারে উঠে যায়। ১৯৮৪ সালে তা দাঁড়াতে পারে ১০০ বিলিয়ন ডলারে। মারকিন মুলুকে বিদেশী পণ্যের আমদানি কমাবার জন্য অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির।

এসব দেশ আর আগের মতো শিল্পজাত সামগ্রী আমেরিকায় রপ্তানি করতে পারছে না। আবার ডলারের দাম বাড়ার জন্য এসব দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ গেছে অসম্ভব বেড়ে। বৈদেশিক ঋণের বেশির-ভাগই ডলারে হিসাব করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৮৫ ভাগই ডলারে হিসাব করা হয়। ১৯৮৩ সালের শেষে এই ঋণের পরিমাণ হল ৮১০ বিলিয়ন ডলারে। ১৯৮২ সালের শেষে এটা ছিল ৭৬৬ বিলিয়ন ডলার—এক বছরে বৃদ্ধি ৪৪ বিলিয়ন ডলার। এর সমস্তটাই বলতে গেলে সুদের হারবৃদ্ধির ফল। এ ঋণ পরিশোধ করা বা সে বাবদে সুদ দিতে হলে উন্নতিকামী দেশগুলির এখন আগের থেকে অনেক বেশি রপ্তানি করা দরকার। ডবল কারণে—ঋণের পরিমাণ বাড়া, এবং দরিদ্র দেশের টাকার দাম কমা। কিন্তু আমেরিকা এবং অন্য উন্নত সব দেশ এখন শিল্পসংরক্ষণনীতির পূজারি। তারা অন্য দেশ থেকে আমদানি কমাতে ব্যস্ত। আর, দরিদ্র দেশে রপ্তানিযোগ্য জিনিসের সরবরাহও রাতারাতি বাড়ানো যায় না। রপ্তানির আয় কম (ডলারে) আর আমদানির ব্যয় বেশি (ডলারে)। কাজেই, উন্নতিকামী দেশগুলি দেউলিয়া হবার মুখে ; তাদের আর্থিক প্রগতিও এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের প্রগতি শ্লথ করতে বাধ্য করছে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি কমাবার অজুহাতে।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার যে অভাবনীয় সংকট চলছে, তার কারণ যা বলা হল, তার সমর্থন পাওয়া যায় বিশ্বব্যাঙ্কের ১৯৮৪ সালের বিশ্বের উন্নতি-সংক্রান্ত রিপোর্টেও। কিন্তু তাতেও মারকিন সরকার তার কর-নীতি আর অর্থবিষয়ক নীতি বদলাবে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। অবশ্য কোষাগারের আনডার-সেক্রেটারি ব্যারিল প্রিংকেল সম্প্রতি বলেছিলেন যে, বছরের শেষে সুদের হার নামবে। তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতির হার অপেক্ষাকৃত মন্থর হবে, আর টাকার বাজারের কর্তারা বুঝতে পারবেন যে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি-প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের কাছে ধার চাওয়ার পরিমাণ আগের মতো দ্রুতহারে আর বাড়ছে না। সুদের হার যে এখনও যথেষ্ট কমে নি, তার কারণ ব্যাঙ্ক এবং অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে সরকার দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি একেবারে বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু একথা আমেরিকায় কেন, ব্রিটেনেও অনেকে মেনে নেবে না। বিলাতি 'ফিনান-সিয়াল টাইমস' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। এই দৈনিকের মতে, এমন কোনো লক্ষণ নেই যাতে মনে করা যেতে পারে মারকিন সরকার সক্রিয়ভাবে সুদের হার কমাবার

চেষ্টা করবে। তার মানে, চাহিদা আর সরবরাহ মারফত সুদের হার বাড়তে দেওয়া। প্রিংকেলের কথার মধ্যে উহ্য আছে সুদের হারের ব্যাপারে সরকারি নিষ্ক্রিয়তা। সরকার যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তবে ধারের বর্তমান চাহিদা সুদের হার বাড়াবেই—অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকাশমুখী গতি এখনও যথেষ্ট মন্থর নয়।

এখন কিছু মারকিন অর্থনীতিবিদের মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁদের ধারণা, ১৯৮৫ সালে সুদের হার ০·৫ থেকে ৩·৫ শতাংশ বাড়বে আমেরিকায়। হেনরি কাউফমানের মতে, সুদের হার ২০ শতাংশের উপর যেতে পারে ১৯৮৪ সালের শেষে বা ১৯৮৫ সালের গোড়ায়। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন বিরাট বাজেট ঘাটতি আর বেসরকারি ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির সমাবেশ।

নতুন রেগন সরকার অবশ্য ঘোষণা করেছেন যে সুদের হার আর বৈদেশিক বাণিজ্য-ঘাটতি কমাবার জন্য ডলারের মূল্যহ্রাসের চেষ্টা করা হবে। উপায় বাজেট ঘাটতি কমানো। কিন্তু কার্যত ঘাটতি এখনও কমে নি। অবশ্য এত অল্প সময়ে তা সম্ভবও নয়। ডলার ১৯৮৪ সালে তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ব্রিটিশ পাউন্ড তার ডলার দামের শতকরা ২০ ভাগ হারিয়েছে। এটাই সর্বাপেক্ষা বেশি অবমূল্যায়ন। জাপানি ইয়েনের ডলার দাম কমেছে শতকরা ৫ ভাগ। এটাই সর্বাপেক্ষা কম অবমূল্যায়ন।

ভবিষ্যতের কথা এখন থাক। বর্তমানে বিকাশের হার খুব খারাপ নয়। দ্রব্যমূল্যস্ফীতির হার সামান্য, বেকারি কমেছে। কিন্তু তাতে শেয়ার বাজারে তেজিভাব আসে নি, বরং মন্দাভাব দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বিকাশের পরিমার্জিত হার জানা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শেয়ারের দাম পড়েছে অনেক সময়। সালটা ১৯৮৪। অরওয়েলের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। ভালো খবর নিশ্চয়ই খারাপ খবর। সরকারের ইচ্ছা যাই হোক, দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধির দিন খুব বেশি দূর, এ-কথা শেয়ারের কেনাবেচা যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই মনে করেন না। সরকারি বাজেটের ঘাটতি মেটাতে ঋণ নিতেই হবে, আর বেসরকারি লগ্নির জন্যও চাই ঋণ। ফলে টাকার চাহিদা বাড়তে থাকায় সুদের হার বাড়বেই। তাতে আজ হোক কাল হোক, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সস্তায় বিদেশী জিনিস আমদানি করতে পারায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সংযত রাখতে পারা গেছে কিন্তু আমদানি-বৃদ্ধির ফলে দেশের কোনো-কোনো শিল্প ঘা খাবে। তার ফলে শিল্প-সংরক্ষণনীতির সমর্থকরা আরও চাপ সৃষ্টি করবেন সরকারের উপর। ফলে, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে, আর তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য মেশিনপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির আমদানি পড়ে যাচ্ছে ডলারের অভাবে। এতে মারকিন বাণিজ্যের ক্ষতি হতে বাধ্য।

নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বাজেট-ঘাটতি কমাবার কথা ওঠা স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত সাতটি উন্নত দেশের শীর্ষসম্মেলনে রেগন নির্বাচনের পর বাজেটে খরচ কমানো আর আয়বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগে কিছু করা সম্ভব নয়, তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু পরেও তাড়াতাড়ি কিছু হওয়া অসম্ভব। খরচ কোথায় কমানো যায় আর ট্যাকস কোথায় বাড়ানো যায়, এ নিয়ে রিপাবলিকান আর ডেমো-ক্রেটিক পার্টির মতভেদ প্রবল এবং প্রচুর। প্রতিরক্ষার ব্যয় কমানো উচিত, না কল্যাণমূলক কাজের খরচ কম করা যেতে পারে? কোন্ কর বাড়ানো চলে, অপ্রসংখ্যক ধনীর উপর, না বহুসংখ্যক অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের উপর 'চাপ না ফেলা করের' বৃদ্ধি কাম্য। এ ছাড়া আছে বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত লবি। কাজে-কাজেই ঘাটতি কমাবার পথ ঠিক করতে সময় লাগবে অনেক।

এ ব্যাপারের ফয়সালা হতে দেরি হলেও সুদের হার একরকম থাকবে না, বাড়তেই থাকবে। কমন বাড়বে পরে বলছি। তার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘা খেতে বাধ্য। অর্থনৈতিক বিকাশের হার প্রথম কমতে আরম্ভ করবে, পরে দেখা দেবে আর্থিক মন্দা বা খুদে মন্দা।

নির্বাচনের পর অর্থনৈতিক বিকাশের হার কমলেও সুদের হার সঙ্গে-সঙ্গে কম হওয়ার আশা কম। আমে-রিকায় এ বিকাশের হার খুব বেশিতে উঠেছিল। কমতে-কমতেও হার একেবারে নগণ্য হয়ে যাবে না রাতারাতি। কিন্তু পড়ে-যাওয়া বিকাশের হার আর বিরাট বাণিজ্য-ঘাটতির যোগাযোগে বিদেশী ধনীদের ডলারের উপর আস্থা অটুট না থাকতে পারে, বিদেশী সঞ্চয় আমেরিকায় আসা কমতে পারে, এমনকি বন্ধ হতে পারে। এতে

ডলারের দাম অন্য দেশের মুদ্রায় কমে যাবে। তখন আমেরিকা বাধ্য হবে সুদের হার আরও বাড়াতে যাতে বিদেশী ধনী প্রত্যক্ষ হয় আমেরিকায় লগ্নি করতে। এতে মন্দা ডেকে আনা হবে না কি?

অর্থনৈতিক বিকাশের হার যদি স্থায়িভাবে কমে, বেকারি বাড়বে। আর সুদের হার বাড়ালে দ্রব্যমূল্য থাকবে উর্ধ্বে। সে হবে স্ট্যাগফ্লেশন—অর্থাৎ, বিকাশ-বন্ধের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির বিরূপ-সমাবেশ। তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও একথা বলা চলে যে, ১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকের অর্থনৈতিক বিকাশ অস্বাভাবিক দ্রুত, এবং এ হার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আর মন্দা লাগার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা সরকারের কাছে আশা করা যায় না। শেয়ার বাজারের লোকেরা তাই সন্ত্রস্ত।

বলা বাহুল্য, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির কিছুতেই কোনো সুবিধার লক্ষণ নেই। মারকিন সুদের চড়া হারে তারা দেউলে হতে চলেছে। হার আরও বাড়লে তাদের আরও মুশকিল। এখন প্রাইম রেট (অর্থাৎ যে সুদে ব্যাঙ্ক তার সবচেয়ে বিশ্বাসী পার্টিকে ধার দেয়) হল ১০·৭৫ শতাংশ। এটা একটু কমানোর ফল—আগে ছিল ১১·২৫ শতাংশ। ভবিষ্যতে সুদের হার যদি আরও বাড়ে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নাভিশ্বাস উঠবে। আর, যদি আমেরিকায় মন্দা দেখা দেয়, তাহলে সুদের হার না বাড়ালে আমেরিকায় বিদেশী সঞ্চয়ের বিনিয়োগ বন্ধ হতে পারে। ফলে, ডলারের দাম পড়তে থাকবে। কিন্তু উন্নতিকামী দেশগুলি তাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তাদের কৃষিপণ্যের দাম হু-হু করে পড়ে যাবে, আর তাদের শিল্পপণ্যের রপ্তানি আমেরিকা আর অন্যান্য উন্নত দেশে ভীষণভাবে ব্যাহত হবে।

এই পরিণতি যে অনিবার্য হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আন্তর্জাতিক প্রয়াসে এখনও প্রতিরোধের সময় আছে। এই প্রয়াসের ফল হওয়া উচিত নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ধনী দেশগুলির এই মুহূর্তে যা করা উচিত তা হল—দরিদ্র দেশ থেকে পণ্য আমদানি বৃদ্ধি, আর তার জন্য শিল্পসংরক্ষণনীতি বর্জন। দ্বিতীয় কর্তব্য : দরিদ্র দেশগুলির ঋণের ভার লাঘব করা, আর বৈদেশিক আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্যবিধানে তাদের সাহায্য করা। ধনী দেশগুলি এসব কাজ যেন দানখয়রাত হিসাবে না করে—নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের খাতিরেই যেন করে। দরিদ্র দেশগুলিতে বৈষয়িক উন্নতির কাজ যদি ভালোভাবে চলে, তাহলে ধনী দেশগুলি তাদের উৎপন্ন মেশিনপত্র ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান বাজার পাবে। তাতে তাদের দেশেও বৈষয়িক অগ্রগতি হবে, বেকারি কমের দিকে যাবে।

এখন ফেরা যাক গোড়ার কথায়—সোনার দামে। সোনার দাম যে আরও পড়ে যায় নি, তার কারণ, যাদের হাতে লগ্নি করার মতো উদ্বৃত্ত টাকা আছে, তারা ভরসা রাখতে পারছে না ভবিষ্যতের উপর। কাজেই, শেয়ার বাজারে মন্দাভাব, আর সোনার দাম পড়তে-পড়তে মধ্যপথে এক জায়গায় আটকে যাওয়া। এ দুটো ঘটনা একই মুদ্রার দু পিঠ।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

দুহাতের মুঠোয় একগাদা ঝিনুক নিয়ে ডুস করে মাথা ওঠায় মালেক, মাথা ভার। বেশিক্ষণ ডোবালে এমন হয়, চোখের রঙ ধূসর হয়ে যায়। এখন আর ভালো লাগছে না, ডিঙি প্রায় অর্ধেক ভরেছে। আজকের মতো এতেই চলবে। শরীর না চাইলে ও জোর করে কাজ করে না, শরীরের গরজ আগে। ভিজে বালুর ওপর চিতপাত শুয়ে পড়ে। সূর্য আড়াআড়িভাবে অনেকটা উঠে এসেছে। সাগরের ঢেউ বদরমোকামের বালুময় তীরে আছড়ে পড়ছে। ও কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে শুয়ে সাগরের গর্জন দুকান ভরে মনোযোগ দিয়ে শোনে।

শরীর আজ বড়ো তাড়াতাড়ি বিগড়ে গেল। অথচ ও তো জানে, পুরো ভাদ্রই ঝিনুক তোলার মৌসুম, এরপর আর সময় থাকবে না। ঝিনুক তুলতে যত কষ্ট, সেই পরিমাণ আয় নেই, বেশির-ভাগই খালি যায়। কটাই বা মুক্তো হয়? তবু সময় নষ্ট না করে ও ঝিনুক খোঁজে। দূরে শাহপরি দ্বীপের নারকেলগাছ ঘন সবুজ, যেন দ্বীপটাকে মমতায় বেষ্টন করে রেখেছে। মালেকের মনে হয় বদরমোকামে এলে শাহপরি দ্বীপের সৌন্দর্য বোঝা যায়। টেকনাফের মাটি পাথুরে বলে সবুজ কম, কিন্তু সাপেরি দ্বীপ সবুজের চকমকি। মালেকের অলস মুহূর্তে প্রাণবন্ত করে। ভাদ্রমাসের ঝলমানো রোদ হলেও এখনো তত চিড়চিড়িয়ে ওঠে নি, শরীরের পক্ষে সহনীয়, ওর ভালোই লাগে। পায়ের কাছে ঢেউ এসে ভিজিয়ে দেয়, বাতাসের ধাক্কায় ডিঙি দোলে। মালেক অনেক দূরে বার্মার মুণ্ডা শহরের পাহাড়ের নীলাভ মাথা দেখে, সেই সঙ্গে সবুজ গাছগাছালি। সাফিয়া ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। ডিঙিবোঝাই ঝিনুক দেখলে খুশি হয়, অর্ধেক ডিঙি খালি থাকলে মুখে কালো ছায়া পড়ে। রাগ প্রকাশ করে না, কিন্তু ভাবে বুঝিয়ে দেয়। আজও সাফিয়া রাগ করবে। কিন্তু রোজগারের জন্যে শরীরকে পিষে ফেলতে ও রাজি নয়। ওর যুক্তি হল, শরীর ঠিক থাকলেই রোজগার হবে। বিছানায় পড়ে গেলে তখন কে দেখবে? নাফ নদীর সরু খাল যেখানে বাঁক নিয়ে প্যারাবনে ঢুকে গেছে সেই বাঁকের ওপর সাফিয়ার ঘর। ওরা মা মেয়ে দুজনে থাকে।

২৫.১.৮৫.

মুণ্ডার নীলাভ পাহাড়ের মাথায় মালেকের দৃষ্টি আটকে থাকে। ছোটোবেলায় একবার সারাদিন ডিঙি বেয়ে চলে গিয়েছিল মুণ্ডায়। তখন ওর বয়স বারো। মুণ্ডায় পৌঁছে কোনো জ্ঞান ছিল না। অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল নদীর কিনারে। এ নৌকার মাঝি, সে নৌকার মাঝি থেকে খবর নিয়ে ওর বাবা ওকে উদ্ধার করে এনেছিল। জল আর ডাঙার সীমানার দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ানোর নেশা এখনো ওকে অস্থির করে রাখে, তখন ও পারিপার্শ্বিকের চিন্তা ভুলে যায়। বাবার মৃত্যুর পর একবার তোরাব আলীর নৌকা নিয়ে পালিয়েছিল বলে তোরাব আলী ওকে নারকেলগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। ভালো একটা পিটুনি দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওর মার কান্নাকাটির জন্যে শেষ পর্যন্ত ধমকে-ধামকে ছেড়ে দিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ওর একটুও ভয় করে নি, বরং জেদ বেড়েছিল। বলেছিল, দেখিস আঁই ফলাইউস। আঁরে আর খুঁজি ন পাবি।

—অ বাবা, আঁরে আর দুখ ন দিস।

সাগরকলমীর ওপর দাঁড়িয়ে মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। হো-হো করে হেসেছিল মালেক। তখন জোয়ারের সময়। হু-হু করে জোয়ার এসে ভেড়ি-বাঁধের গায়ে আছড়ে পড়ে। প্যারাবনে বসে ডাকে কাদা-খোঁচা পাখি। ছোটোবেলার কথা মনে পড়লে মালেকের বুক কেমন করে। এখন ওর বাবা নেই, অন্ধ মা প্রতিদিনই মৃত্যুর দিন গোনে। বাবা ছিল দুঃসাহসী জেলে। সাগরের জোয়ার-ভাটা, ঝড়-বাদল, মাছের-ঝাঁক ইত্যাদির খোঁজ রাখত। ডাঙার চাইতে সাগরই ভালোবাসত বেশি। অনেকদিন পেরিয়ে গেলে ফিরত, শুঁটকি বানাত কোনো নির্জন চরে গিয়ে। এখনো মনে আছে মা গুনগুনিয়ে কাঁদত। এখনো কাঁদে। বড়ো অল্পে কাঁদতে পারে মা। বদরমোকামের বালু গরম হয়ে উঠেছে। এখনো যারা ঝিনুক খুঁজছে ওরা পানি থেকে হাঁক ছাড়ে।

—মালেক ভাই, বই গেলা যে!

—বালা ন লাগেরে।

—হাঙর মারন তোঁয়ার নেশা, তোঁয়ার কি এইউন ফোষায়? বলতে-বলতে মিজান আবার ডুব দেয়। গোল-গোল ঝকঝকে ঝিনুকগুলো দেখতে খুব সুন্দর, রোদে চকচক করে। ও খেয়াল করে হুড়হুড়িয়ে জোয়ার আসছে। ও ডিঙি ছেড়ে দেয়। শাহপরির দ্বীপই এই দেশের শেষ মাটি। এরপরই সাগর, তারও অনেক পরে সেনট মার্টিন, মালেকের বড়ো প্রিয় জায়গা। নৌকা সাফিয়ার ঘরের কাছে রেখে লগি পুঁতে লাফ দিয়ে নামে। সাফিয়া বারান্দায় বসে চুরুট টানছিল। ওর মা জয়গুন তোরাব আলীর বাড়িতে কাজে গেছে।

—আজুয়া ক্যান উডাইলা?

—বেশি ন, শরীল বালা ন।

—ও। অইন তো মৌসুম ফ্রায় শ্যাষ। অইন ন খাডিলে মুক্তা কি ফয়ন যাইব?

—সাফিয়া, আঁর শরীল বালা ন। মালেক একটু চেঁচিয়ে বলে।

—ন চিল্লাইও।

সাফিয়া মুখঝামটা দেয়। মালেকের মন খারাপ হয়ে যায়। ওর শরীরের মূল্য সাফিয়ার কাছে নেই, ঝিনুক ওঠাতে পারলেই খুশি। উঠোনের কোনা থেকে ঝিনুক আনার ঝাঁকা নিয়ে নৌকার কাছে যায়। ঝাঁকাভরতি ঝিনুক এনে উঠোনে ঢেলে রাখে। সাফিয়া চুরুটে শেষ টান দিয়ে দা নিয়ে ঝিনুক খুলতে বসে। ঝিনুকের একটা ছোটখাটো পাহাড় হয়েছে। এ বছর সবচেয়ে বেশি ঝিনুক তুলেছে ও, তবু সাফিয়া খুশি নয়। শরীর খারাপ বললেও কিছু যায় আসে না, ঝিনুক কম এসেছে এতেই বিরক্ত। দু ঝাঁকাবোঝাই ঝিনুক এনে ঢালে। সাফিয়া একমনে দা দিয়ে ঝিনুক ফাঁক করে মুক্তোর দানা পানির মধ্যে চালান করে দিচ্ছে। মালেকের সঙ্গে কথা বলে না। ও জানে মালেক ওকে ভালোবাসে, কিন্তু মালেককে সাফিয়ার পছন্দ নয়। যাকে ভালো লাগে না তাকে কি জোর করে ভালোবাসা যায়? এই জেলেপাড়ায় মালেক দাপটে পুরুষ। হাঙর ধরে, মাছ মারে, ঝিনুক তোলে, ঘরে ছাউনি দেয়। এত কাজ আর কেউ পারে না। তবু সাফিয়ার কাছে ওর ঠাঁই নেই। কেননা ওর একটিই দোষ যে নিজের স্বার্থ বোঝে না। ওই এক জায়গায় বড়ো বেশি সরল আর বোকা।

ঝাঁকাটা উঠোনের এক কোণে রেখে মালেক বেরিয়ে যায়। সাফিয়া দায়ের ফাঁকে ঝিনুক খুলে পানির মধ্যে ডোবাতে থাকে। দানাগুলো সাতদিন পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এর মধ্যে সবগুলোর ভেতর মুক্তো থাকে না, প্রচুর ঝিনুক ফাঁকাই যায়। সাতদিন পর মুক্তোগুলো মসুরের ডালের মতো ধুয়ে ফেলতে হয়।

বেশ কয়েকবার ধুলে ফাঁকা দানাগুলো পানির সঙ্গে ভেসে যায়। আসল মুক্তো নীচে পড়ে থাকে। সেগুলো সংখ্যায় খুব কমই হয়। অনবরত ঝিনুক খুলতে-খুলতে সাফিয়ার হাতের নখ শাদা হয়ে যায়। খাটুনির তুলনায় আয় কম। মালেকের সঙ্গে ওর আধাআধি বখরার চুক্তি। ও দু-একটা মুক্তোর দানা মালেককে না জানিয়ে লুকিয়ে রাখে। বেশ কিছু জমলে একদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে বিক্রি করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। ভালো করে ঘর বানাবে, সোনার নাকফুল গড়বে, মুণ্ডা শহর ঘুরে আসবে। ওর অনেক দিনের শখ।

ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই মালেকের মা সাড়া দেয়।

—ও বাবা, আইস্যোম না?

—অ মা, আঁই আইলেই তুঁই ক্যানে টের ফ?

—চোক না থাইলে কী অইব, কান তো আছে।

—হুদা চোক কান ন, তোঁয়ার আরো কিছু আছে যিয়ান দি তুঁই ব্যাকগুন বুজিত পার।

—ভাত ন খাবি?

—অকুইন্যা ন। শরীল বালা ন লাগের।

মালেকের মা সারাদিনই প্রায় ঘরের কোণে বসে তসবি টেপে। ফাঁকে-ফাঁকে ছেলের সঙ্গে কথা বলে।

—উকুইন্যা ঘুমাবি না?

—মাথা ভার, ঘুম ন লাগে।

—অ্যাতো ঝিনুক উডানোর কোনো কাম নাই। আঁরর দিন তো কাডি যায়।

—অ মা, বাবা য্যানত সাগরত থাইকত তোঁয়ার খারাপ ন লাইগত?

—হ, লাইগত।

ওর মা নিশ্বাস ফেলে।

—মানা ন কইরতা?

—কত ঝগড়া করাগি, কত কান্দি, কে কার কথা হুনে।

—বাবার রক্তের মদ্যে সাগরর নেশা আছিল।

—তোর মদ্যেও আঁই এরম্যা ডাক হুনি।

মালেক মার কাছে এসে বসে। মা ওর পিঠে হাত বুলোয়।

—তোরা য্যানত সাগরত যাস আর আঁই কোনো খবর ন পাই অ্যাঁতে মনত অয় আঁই মরি যাই।

মালেক মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

—সালেক কডে?

—লবণর খেতে গিয়ে। যাইতে ন চায়। মহাজনের মানুষ ডাকি লই গিয়ে।

—আলেক কডে, মা?

—হিতে গিয়ে ইচাগুড়া ধইত্তে।

—হিতার ওই এক ব্যারাম। মানুষ সাগরত যায় পাঁচ মন ওজনর কৈয়া ভোল ধইত্তে, আর হিতে হুদা ইচাগুড়া মারে।

—হিতার আর বয়স কী?

—তুঁই তো কইবাই। হিতার তুন কম বয়সে আঁই নৌকা লই পলাই ন গেলাম না?

—ওই কতা মনত ন করিস, বাপ। ভাবলে রক্ত ঠাণ্ডা হই যায়। তোর মতো দস্যি পোয়া য্যান আর কারো ন অয়।

—অ মা, আঁরে লই তোঁয়ার কষ্ট হয় ন?

—কষ্ট কডে? তুই ন থাইলে কি আঁই বাঁইচতাম?

—তুঁই বাবার কথা খ মাগো। বাবার কতা হুনতে বালা লাগে।

—তোঁয়ার বাবা মানুষটার বুকে একফোঁটা ভয়ডর ন আছিল। ঝড়-জল-রোদ-বৃষ্টি কোনোকিছুই না মাইনত।

—মাগো মা, অ্যান মানুষ আঁই আর ন দেখি।

মালেক হো হো করে হাসে।

—তুঁই আর কউয়া মানুষ দেইখ্যো, মা। ছোটতুন দেখি আইস্যো তোঁয়ার বাবারে, আর বড়ো হই দেইখ্যো আঁর বাবারে। তুঁই তো আর মানুষ ন দেইখ্যো, মা।

—ঠিক কইয়স। দুয়া পানিভাত খা, বাবা!

—উকুইন্যা ন, আরেককানা ঘুমাই লই।

মালেক তেলচিটচিটে বালিশটা টেনে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে। ঘুম আসতে চায় না, কেবলই সাফিয়ার মুখ ভেসে ওঠে। মালেক জানে সাফিয়ার জন্যে ওর যত টানই থাক, সাফিয়া ওকে তেমন পছন্দ করে না। ওর সঙ্গে ওর ব্যাবসার সম্পর্ক। জেলেপাড়ায় মালেক সবচেয়ে বেশি ঝিনুক ওঠাতে পারে আর সাফিয়া খুলতে পারে সবার আগে। ও চোখ বোঁজে, ঘুম আসে না। চোখের সামনে মুণ্ডার পাহাড় দেখে—দেখে নারকেলগাছ-শোভিত শাহপরি দ্বীপের ছোট্ট ভূখণ্ডের সবুজ চাতাল। যেন পুরো মাটিকে ছাদের বিস্তার দিয়ে রেখেছে। ও পাশ ফিরে শোয়, ঘুমুতে চেষ্টা করে। তখুনি একগাদা কুচো-চিংড়ি খলুইয়ে ভরে ঘরে ঢোকে আলেক।

—মাগো, আজয়া আর মাছর দুখ নাই। বহুত মাইছি।

মালেক মুখ না ফিরিয়েই বলে, বৌল কইরা ভত্তা বানাইও, উডিয়ারে পানিভাত খাইয়ুমে।

—কিন্তু রাঁধিব কন? আন্ধুর মা তো আজয়া ন আইয়ে।

—মা, আই আন্ধুর মারে ডাকি আনি।

আলেক খলুই রেখে জলটা বাইরে রোদে দিয়ে লুঙ্গি মালকোচা মেরে দৌড়ে আন্ধুর মার ঘরে গিয়ে তাকে ডেকে আনে। মাছগুলো নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না মালেকের মা। এইটুকুই তার আনন্দ। ছেলেটা ভালোই মাছ ধরতে শিখেছে।

—সুজার ঘরত চাল নাইরে, মালেক।

—কনে খবর দিয়ে?

—পটলা আসিল। দুই সের আন্দাজ দি।

—ইতারার ছাঁদা কনে বন্ধ করিব? যত দিবা ততই বাড়িব।

—ক্যান করিবি? হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান হয়?

মালেক আর কথা বাড়ায় না। ও নিজেও জানে দশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে সুজার সংসার চলে না, অভাব লেগেই থাকে। তোরাব আলীর ট্রলারে মাছ ধরে সুজা, মাছমারা চমৎকার বোঝে। এজন্যে তোরাব আলী তাকে পছন্দও করে। অবশ্য যতটা মুখে ততটা পয়সা দিয়ে নয়। সুজার নাকি মাছের ভাগ্য ভালো, জাল ভরে ওঠে। কিন্তু সে ভাগ্যে তোরাব আলীর থালা ভরে, ওর নিজের জন্যে ভাঙা কপাল। মালেক হাই তোলে। ঘুম আসি-আসি করেও আসে না।

এর মধ্যে আন্ধুর মা বেশ কিছু মাছ মাটির তাওয়ায় ঢেলে নিয়ে ভরতা বানিয়েছে। মালেকের মনে হয়, টেকনাফ গেলে মন্দ হয় না। ভাত খেতে-খেতে হয়তো নোয়াবের জীপ এসে যাবে। টেকনাফ থেকে শাহপরি দ্বীপ পর্যন্ত যে জীপ চলাচল করে তা চালায় নোয়াব। থাকেও টেকনাফে। তবে দিনে দুবার আসা-যাওয়া করতে হয়। মালেকের ইচ্ছে হলেই নোয়াবের জীপে টেকনাফ যায়। সেখানে রানী আছে। যত খন্দেরই আসুক ও মালেককে দেখলে ব্যাকুল হয়, পয়সা কম দিলেও আপত্তি নেই। ওকে কি রানী ভালোবাসে? মালেক হো-হো করে হেসে ওঠে। বাজারের মেয়েলোকের আবার ভালোবাসা কী?

—হাসর ক্যা, বাপজান?

—মাইজ্যা ভাইয়র হগেও ভূত আছে। অ মা, জানো নি মাইজ্যা ভাই মাঝে-মাঝে অনে-অনে কথা কয়।

—এককানা দোয়াদরুদ পড়িয়া রে বুকের মদ্যে ফুঁ দে।

—আঁর লাই তুঁই এককানাও ন ভাইব্যো, মা। আঁই বালা আছি। কোনো ধান্দাবাজির মইদ্যে নাই।

—ইতার লাই তো মানুষে তোঁয়ারে গাথা কয়।

—দাঁত ফালাই দিয়ম, আলেক।

মা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যায়।

—বহুত দিন ধরি নোয়াব ন আইয়েরে মালেক। তুই টেকনাফ ন যাস?

—বহুত দিন ন যাই। ইতে য়্যানতে জীপ লই আঁইয়ে অ্যাতে কি কথা কয়ন যায়? বাস্ত থাকে।

—থাক, বালা থাইকলেই বালা।

—আইচ্ছা মা, তুই অ্যাতো বালা ক্যান? নোয়াব যে তোঁয়ারে এককানা দেইখত ন আইয়ে, ভালোমন্দ কিছু কিনি ন দেয়, তোঁয়ার রাগ ন লাগে?

—নারে বাপ, রাগ কিয়র?

ও মার বুক ফুঁড়ে যে নিশ্বাস আসে তা মালেক শুনতে পায়। ও আর কথা বাড়ায় না। আন্ধুর মার ভরতা হয়ে গেছে, আলেক একথালা পান্তা এনে মার সামনে রাখে।

—অ মা, খ।

ও মার হাতে ভাতের থালা ধরিয়ে দেয়। দু ভাই মার পাশে গোল হয়ে বসে। মা যে কেন অন্ধ হয়ে গেল, মালেক বুঝতে পারে না। বাবার জন্যে কাঁদতে-কাঁদতে কি? একদিন ভীষণ অন্ধকার রাতে ও শুনতে পাচ্ছিল নাফ নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আসা ঝড়ের গর্জন। সে কী গর্জন, কান ফাটার উপক্রম। ও কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। মা জায়নামাজ থেকে ওঠে নি। কখনো জোরে-জোরে দোয়াদরুদ পড়ছিল। সে রাতে কখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন ঝড় থেমেছিল, ও কিছুই জানতে পারে নি। পরদিন দুপুরে জেগেছিল ওর বাবা যে ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়েছিল তার সঙ্গে আরো সাত-আটটা ট্রলার একসঙ্গে ডুবে গেছে। নসু সিকদার অনেক

চেষ্টা করেও কোন খোঁজখবর পায় নি।

—মাইজ্যা ভাই, ন খাও ক্যান?

—ক্যান জানি বাবার কথা মনে পইজে।

—বাজানের কথা আঁর কিছু মনত নাই।

—তুই আতি পাঁচ বছরর।

—অ মা, ঐ দিনকার কথা এককানা কও না?

—অ বাবা, তোরা ভাত খা। ভাত খওনের সময় কথা না কইস।

—ঠিক।

মালেক মায়ের মনোভাব আঁচ করে আলেককে আর কথা বলতে দেয় না। অথচ বাবার এইসব কথাগুলো শুনতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। সুযোগ পেলেই মাকে ধরে। কিন্তু সেই ঝড়ের রাতের কথা বলতে মার খুব কষ্ট হয়। চোখ দিয়ে জল ঝরে, গলা বন্ধ হয়ে আসে। অথচ সেই লোকটা যে সমুদ্রে থাকতে বেশি ভালোবাসত, ডাঙায় ফিরলে পান থেকে চুন খসলে বউকে বেধড়ক পেটাত, ছেলেগুলোর সঙ্গে যার ভালো সম্পর্ক ছিল না, তার কথা আলেক শুনতে চায়। সে মানুষটার চেহারা আলেকের মনে পড়ে না। তার রক্তে সমুদ্রের ডাক ছিল নিশির মতো। ডাঙায় ফিরলে পনেরো দিনও থাকতে চাইত না। আবার ছুটত সাগরে। ওর নিজেরও মনে হয়, পুরুষমানুষের আবার ঘরের টান কী? সাগরে মাতন আছে—বিস্তার আছে—গভীরতা আছে—অবাধ জলরাশির সীমাহীন দিগন্তরেখা আছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মাথা কেমন ঝাঁকিয়ে ওঠে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ভাত খেতে-খেতে মালেকের বুকের ভেতর সাগরের গর্জন ঘনিয়ে ওঠে। হাঙর ধরার মৌসুম এসে পড়ল বলে, দেরি নেই। ঝিনুক তোলার সময় প্রায় শেষ।

—কালুয়া, তুই আঁর হগেও ঝিনুক তুলিত যাবি।

—না, আই ন যাইয়ম।

—ক্যা?

—আঁই ছোড খালত চোঁগুড়া ধইজম। বোদার মোকামত যাই ঝিনুক তুলিতাম আঁর বালা না লাগে।

—ন যাইস।

মালেক রেগে উত্তর দেয়।

—তোঁয়ার হগেও আঁই সাগরত যাইয়ম মাইজ্যা ভাই।

ঘরে গুনগুন কান্নার শব্দ ওঠে। ওরা দুভাই মুহূর্তে চুপ হয়ে যায়। ওরা যেন অনেকদূর থেকে ওদের মার কণ্ঠ শুনতে পায়।

তুই আবার ওকেও ডাঙা থেকে নিয়ে যাবি। তোর বাপ আমার একটা কথাও শোনে নি। তোরাও শুনলি না কেউ। বিয়ার পর থেকে আমি চেয়েছিলাম যে তোর বাবা ডাঙায় কাম করুক। কত রকমের কামই তো আছে। শোনে নি একদিনও। নতুন বউ ঘরে রেখে মানুষ যে সাগরে ঘুরতে পারে সে কেবল তোর বাপই।

যেন মার কণ্ঠ নয়, যেন অন্য কেউ কথা বলছে। কথাগুলো মুখ থেকে বেরুচ্ছে না, বেরুচ্ছে বুক থেকে। নাফের ওপর দিয়ে উড়ে-উড়ে আসছে ওদের কাছে। আলেক বাবার কথা শোনার জন্যে মার পাশ ঘেঁষে বসে। মালেক মার ওইসব কথা সইতে পারে না। কথাগুলো ওর জন্যে খুব কষ্টের, যার ভাষা ও বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। সাগরের ডাক ওর রক্তেও প্রবল। ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘরের সামনে দুটো নারকেল-গাছ। একটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরায়। সামনেই আমবাগান। সেটি পেরিয়ে আর-একটু গেলেই ভেড়িবাঁধের ওপরে ওঠার সরু রাস্তা। বাঁধের নীচে প্যারাবন। গাছগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জোয়ারের জল ঢুকছে। জলের আসা-যাওয়া দেখতে ভালো লাগে মালেকের। অনেক দিন গেছে ও জোয়ার এবং ভাঁটির সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে। পা সুড়সুড় করলে ভালো লাগত। ও হাঁটতে-হাঁটতে বাঁধের ওপর উঠে আসে। সাগরকলমী বালুর মধ্যে বিছিয়ে আছে, পাতা-গুলো চমৎকার। নীল-বেগুনি ফুল যখন গাদা ধরে ফোটে তখন ভেড়িবাঁধের এই অংশ অপূর্ব হয়ে যায়। অনেকেই এর দিকে ঘুরেও তাকায় না। জেলেপাড়ার সবাই রোদের সময় বালু তেতে উঠলে যখন হাঁটতে কষ্ট হয় তখন কলমীলতার ওপর দিয়ে হাঁটে। একবার সুকুর ওই বেগুনি ফুলের গুচ্ছ মাড়িয়ে ওকে শাসিয়েছিল। ন্যাম্পি খেয়ে মাতাল হয়ে বলেছিল, সাফিয়া আমার। ওর দিকে নজর দিলে তোর কল্লা দুই ফাঁক করে ফেলব। সুকুর নামকরা গুন্ডা। গোটাকয়েক খুন করার পরও দিব্যি চলাফেরা করে। লোকে ওকে সমীহ করে। সেদিন মালেক ওকে কিছুই বলে নি। ও জানে, সাফিয়ার জন্যে ওর যত টানই থাক, সাফিয়া ওকে ভালোবাসে না। তাহলে কার জন্যে সুকুরের সঙ্গে মারামারি? তবে মালেক কিছু

না বললেও ন্যাপির আমেজে চুরুট ধরাতে গিয়ে বালুর মধ্যে পা হড়কে পড়ে গড়াতে-গড়াতে একদম প্যারাবনের কাদায় গিয়ে ঠেকেছিল। ও নিঃশব্দে ঘরে ফিরেছিল সাগরকলমীর বেগুনি ফুলগুলোর জন্যে জলভরা চোখ নিয়ে।

মালেক ভেড়িবাঁধের কোনায় এসে দাঁড়ায়। এখানেই মাটি শেষ, তারপর সাগর। অনেক দূরে সেনট মার্টিন। বদর-মোকাম থেকে সেনট মার্টিন সাত মাইল। নাফের মোহনায় বদরমোকাম একটা বালুর চড়া, কয়েকটা নারকেলগাছ আছে মাত্র। একটাও ট্রলার নেই, আজ আর ওখানে যাওয়া যাবে না। বিডিআর-এর সীমান্ত-ফাঁড়ি পেরিয়ে ও আরো সামনে এগিয়ে যায়। এখান দিয়ে ঢালু নেমে গেছে, ঢালুর নীচে নোয়াবের জীপ এসে থামে। এখন পর্যন্ত জীপ আসে নি। ঝিনুকের খোলে ভরে উঠেছে আশপাশ। যে যেখানে পারছে ফেলছে। জীপের চাকায় গুঁড়িয়ে বেশ সুন্দর একটা সাদা রেখা হয়েছে পথের ওপর। কদিন পর বাতাসে পচা ঝিনুকের দুর্গন্ধ ছাড়বে। ঝিনুকের শাদা খোলের ওপর লাল নীল রঙের রেখা সূর্যের আলোয় চকচক করে। ও সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে ভেড়িবাঁধের ওপর দিয়ে লবণের ভার নিয়ে সালেক আসছে। পাঁচ ভইজেয়ের মধ্যে ওর শরীরটাই বেশ জোয়ান-তাগড়া। দারুণ স্বপ্নবিলাসী, শাহপরি দ্বীপের তোরাব আলী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। শ দেড়েক ট্রলার, গোটা বিশেক জাল, লবণের চাষ, লক্ষ টাকার শুঁটকি, চোরাকারবারি ব্যাবসায় আরো কত কি! সালেক মালেকের কাছে এসে ভার নামিয়ে দাঁড়ায়।

—তোরাব আলীর লবণের গোলা ভইজ্যে না?

মালেক মৃদু হাসে। কপালের ঘাম মোছে।

—ইতারার গোলা কি কোনো সময় ভরে, মাইজ্যা ভাই?

মালেক ওর উত্তরটা বুঝতে পারে। কথাটা ওর নিজের মনেরও। তাই অন্য প্রসঙ্গে যায়।

—এইবারর দানা সব বড়ো-বড়ো লাগের দেখি।

—আঁরার কী? হিতে বুজিব।

সালেক দাঁতের মাড়ি বের করে হাসে, কিছুটা অবজ্ঞার হাসি।

—এক সপ্তার মদ্যে নুনর কাজ শ্যাষ হইব। ইতারপর আঁরে বদরমোকাম পাঠাইব।

—শুঁটকির লাই?

—হ, গোলপাতার ঘর উঠাইয়ে।

—তুই সব কাজ পারস।

—কামই তো চাই, মাইজ্যা ভাই। কাম করি একদিন তোরাব আলী হইয়ম।

সালেক হাসতে-হাসতে চলে যায়। মালেক হাসতে পারে না। ও জানে সবাই একা-একা বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পুরো জেলেপাড়ার জন্যে কেউ ভাবে না। তখুনি একরাশ ধুলো উড়িয়ে নোয়াবের জীপ এসে থামে। তোরাব আলী নামে একগাদা মালপত্র নিয়ে। নোয়াব ওকে ডাকছে টেকনাফ যাবার জন্যে। ও এগুতেই তোরাব আলী পিছন থেকে ডাকে।

—আই মালেক?

—কী কন।

—হাঙর মারার সময় তো আইসো।

—আইজও দিন পনেরো বাকী, উত্তর দিককার বাতাস আইজও ন ছাড়ে।

—হ, তুই তো আবার বালা বুঝিস। ল শিয়লউন বালা করি দেখিবি।

—টেকনাফ যাইয়ম।

—টেকনাফ গিয়া কাম কী। আঁর হগ্গে ল।

নোয়াবকে না করে দিয়ে তোরাব আলীর সঙ্গে যায় ও। জীপ ভরে গেছে, গরগর শব্দে ধুলো উড়িয়ে নীচ থেকে বাঁধের ওপর উঠছে। ক্লাচ প্লেট ঠিক করা হচ্ছে, ওই জায়গাটা বেশ বিপদজনক। তবে নোয়াব দক্ষ ড্রাইভার, কোনোদিন অ্যাকসিডেনট করে নি। মাস ছয়েক আগে হামিদের জীপ ব্রেক ফেল করে গড়িয়ে প্যারাবনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। বারোজনের একজনও বাঁচে নি। ভাবলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। দুটো লাশ টেনে ওঠানোর পরই শরীর ঝিম ধরে যায় মালেকের। বাকী লাশ-গুলো উঠিয়েছিল সুকুর। লোকটা হৃদয়হীন বলেই ওর পক্ষে ওই থাঁতলানো মানুষগুলো ওঠানো সম্ভব হয়েছিল। মালেকের বুক ঠেলে কান্না ভেঙে আসছিল। চারদিকের সেই কান্নাময় ধ্বনি শাহপরি দ্বীপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখনো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে মালেকের বুকের ভেতর কান্নার শব্দ বেজে ওঠে, মানুষের কান্না শুনতে ওর ভীষণ খারাপ লাগে। তোরাব আলীর বাড়িতে হাঙর ধরার শিকলগুলো দেখে আসার সময়

তোরাব আলীর বউ ওকে পোড়ানো গানজা শুঁটকির দু টুকরো দেয়। ও খেতে-খেতে বেরিয়ে আসে। আম-বাগানের সরু পথ দিয়ে সুজার বাড়ির দিকে এগোয়। সুজার বাড়ি বেশ ভেতরে। একদম জেলেপাড়ার শেষ প্রান্তে, খালের ধারে। সাফিয়াদের ঘরের কাছাকাছি। ততক্ষণে ওর শুঁটকি খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরে সুজা নেই। কাঞ্চন চুলোয় ভাত চাপিয়েছে। বড়ো মেয়ে রুপা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। পরি-পাটি করে চুল আঁচড়িয়েছে। মালেকের মনে হল ওর বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু বিয়ে দেয়ার সংগতি কই সুজার? মালেক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঞ্চন আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রান্নাঘর থেকে উঠে আসে।

—ভাইজান কডে ভাবি?

—কডে আর, ট্রলারে।

—ফোলাপান?

—মাছ টোকাইতে গিয়ে। বইও, চা আনি।

এখানকার ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ট্রলারে মাছ কুড়োতে যায়। সমুদ্র থেকে ট্রলারগুলো ফিরে এলে ব্যাপারিরা যখন মাছ কিনে বরফের ট্রলারে ওঠায়, তখন অনেক মাছ এদিক-সেদিক পড়ে যায়। ছেলেমেয়েরা জলকাদা থেকে সে মাছ কুড়িয়ে নেয়। সুজা হাজার হাজার মাছ ধরে, সুজার ছেলেমেয়েরা মাছ কুড়োতে যায়। একটা মাছের জন্যে অন্যদের সঙ্গে মারামারি করে। রুপা এসে কাছে দাঁড়ায়।

—কাকু, আপনি গানজা শুঁটকি কডেত্নন খাইয়ন?

—কিয়র লাই?

ও অবাক হয়।

—তোঁয়ার মুখত্নন গন্ধ আইয়ের।

—তোরাব আলীর বউ দিয়ে।

—গানজা শুঁটকি খাইতে আঁর বালা লাগে।

—আবার দিলে তোর লাই কোমরে গুঁজি রাইখাম।

—হাছা?

রুপা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কাঞ্চন একমগ চা আর কিছু মুড়ি নিয়ে আসে।

—খ।

—চা খাইয়ম ভাবি। মুড়ি ন খাইয়ম। ছোটকারর লাই রাখি দাও।

কাঞ্চন বাক্যব্যয় না করে মুড়ির বাটি উঠিয়ে নিয়ে যায়। একটু পরপরই ছুটকা, মনা, শিউলি, দুদু আর সন্টু একগাদা মাছ লম্বা ঘাসের দড়ি কানকোর মধ্যে ঢুকিয়ে দোলাতে-দোলাতে এসে উপস্থিত হল।

—বহুত তো?

মালেক বিস্ময় প্রকাশ করে। ওদের হাতে পায়ে কাদা। ভাটির প্রায় সিকি মাইল পথ জলকাদা ভাঙতে হয়। তখন একদম বাঁধের গোড়ায় ট্রলার আসে না। ওদের হাতে অত মাছ দেখে কাঞ্চন খুশি হয়ে ওঠে।

—মা-গো-আ্যা-তো?

—শুঁটকি বানাই থোও।

—হ, ইতা কজ্জস।

মালেকের কথায় সায় দেয় কাঞ্চন। রুপা বঁটি নিয়ে মাছ কাটতে বসে। ছুটকা ওর বাহিনী নিয়ে খালের পানিতে গোসল করতে যায়। দুটো নারকেলগাছের গুঁড়ি ফেলে সুজা বেশ ঘাটের মতো বানিয়েছে। এই বাড়িটা ভালো লাগে মালেকের। এখানে দাঁড়ালে নাফের দৃশ্য চমৎকার দেখায়।

—আই যইগাই ভাবি।

—দশউয়া টেঁয়া দ না।

শার্টের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে দশ টাকা হয় না। মালেক ছয়টা টাকা কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেকেন্দারের চায়ের দোকানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেবে।

[ক্রমশ

গ্রন্থসমালোচনা

গ্রামবাংলার ইতিকথা—উইলিয়ম উইলসন হান্টার। অনুবাদ অসীম চট্টোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯। প'য়তাল্লিশ টাকা।

ইংরেজ আমলের 'রৌদ্রদগ্ধ সিভিলিয়ান' এবং পানাসক্ত বদমেজাজি সামরিক কর্মচারীরা প্রধানত শাসন আর শোষণের কাজেই নিযুক্ত থাকতেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁদের লেখা বহু মূল্যবান গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতবাসীকে জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করেছিল এবং পরবর্তী কালের গবেষণা-কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁদের রচনায় ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতি এবং শোষকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই সুপ্রাচীন দেশের সভ্যতার প্রতি তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শ্রদ্ধা ছিল এবং শোষিত প্রজাদের জন্য সহানুভূতি-প্রকাশ বিরল ছিল না।

উইলিয়ম উইলসন হানটার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনডিয়ান সিভিল সারভিসের সদস্য ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সেকালের বাঙলা প্রেসিডেনসি। রুটিনমাফিক প্রশাসনিক কাজ ছাড়া তিনি অন্যান্য নানারকম কাজের ভার পেয়েছিলেন। গেজেটিয়ার সম্পাদনা বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ' (স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউনট অব বেঙ্গল, ২০ খন্ড) বাঙলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। অনুবাদক অসীম চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দিয়েছেন তাতে তাঁর 'ইনডিয়ান মুসলমান্‌স্' নামক বহুবিতর্কিত বইটির উল্লেখ নেই। বড়োলাট লর্ড মেয়োর নির্দেশে বইটি রচিত হয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহ এবং ওয়াহাবি আন্দোলন দমনের পর ইংরেজ সরকার মুসলমানদের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রশাসনিক ব্যাপারে মুসলমান-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তাই লর্ড মেয়ো মুসলমানদের অসুবিধা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের আবশ্যকতা অনুভব করেন। হানটারের বইটিতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। বইটির নামে 'ইনডিয়ান' শব্দটি থাকলেও হানটার প্রধানত বাঙলার মুসলমানদের সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ওয়াহাবি আন্দোলন ইংরেজ-বিরোধী ছিল, হানটারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন উত্তরভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উদীয়মান নেতা সৈয়দ আহম্মদ। যাই হোক, মুসলমানদের অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করে হানটার তাদের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই সরকারি নীতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল, মুসলমানদের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই নতুন নীতির সমর্থকরূপে সৈয়দ আহম্মদ দ্বিজাতিতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। ভারতবিভাগের ইতিহাসে হানটারের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হানটার লর্ড মেয়োর জীবনী এবং ভারতসাম্রাজ্য সম্বন্ধে বর্ণনামূলক একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ (দি ইনডিয়ান এম্পায়ার : ইটস্ পিপল, হিস্টরি অ্যান্ড প্রোডাক্‌টস্) রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখায় মাঝে-মাঝে ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে অসুবিধাজনক মন্তব্য থাকত। একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি মণিপুরকে স্বাধীন (ইন্ডিপেনডেনট) রাজ্যরূপে বর্ণনা করেছিলেন। মণিপুরে বিদ্রোহের পর টিকেন্দ্রজিতের বিচারের সময় একটি জটিল আইনের প্রশ্ন উঠেছিল : একটি স্বাধীন রাজ্যের সেনাপতির বিচার করার অধিকার ইংরেজ সরকারের আছে কিনা। টিকেন্দ্রজিতের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে প্রখ্যাত ব্যারিসটার মনোমোহন ঘোষ এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন। অবশ্য ভারত সরকার এই আপত্তি গ্রাহ্য করে নি। তখন মর্টিমার ডুরান্ড লিখেছিলেন : "হানটার তাঁর জীবনে কখনও একটি সঠিক বাক্য লেখেন নি।" এই রূঢ় মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট ঐতিহাসিক যুক্তি ছিল।

হানটার শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। লর্ড রিপন-কর্তৃক নিযুক্ত এডুকেশন কমিশনের তিনি ছিলেন সভাপতি। এই কমিশনের রিপোর্টে বাঙলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য এবং সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে বেসরকারি স্কুলে ও কলেজে সরকারি অনুদান দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

'অ্যানাল্‌স্ অব রুরাল বেঙ্গল' (গ্রামবাংলার ইতিকথা) বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। হানটার তখন তরুণ সিভিলিয়ান, তাঁর বয়স মাত্র ২৭-২৮ বৎসর। বাঙলাদেশ তথা বাঙালি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা তখন খুবই কম, ইতিহাসরচনার পদ্ধতি তিনি তখনও আয়ত্ত করেন নি। বইটি যে কাঁচা হাতের লেখা, তার প্রমাণ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের রচনায় যে সুসংহত বর্ণনা আর বিশ্লেষণ আশা করা যায়, তা এখানে নেই বললেই চলে। বোধহয় সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) স্মৃতি এবং উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের (১৮৬৬) ভয়াবহ রূপ তরুণ সিভিলিয়ানের মনে দাগ কেটেছিল। তিনি দৈনন্দিন কাজে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জীর্ণ কীটদষ্ট সরকারি কাগজপত্র থেকে পুরোনো কাহিনী উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, তাঁর এই বইটি প্রথম প্রকাশের শতাধিক বর্ষ পরেও বাঙালির কাছে 'অতিপরিচিত বইগুলির অন্যতম'। ইতিহাসে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, বহু নতুন সূত্র আর নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে; কিন্তু এখনও গবেষকের কাছে হানটারের বইটির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

অনুবাদক বলেছেন, হানটারের এই বইতে 'বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মধ্যভাগ, বিশেষ ক'রে বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলের জনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।' এই দাবি মেনে নেওয়া কঠিন। ইতিহাসে জনজীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে হানটার সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন : "প্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তৃত বিবরণ...ইংরেজ সরকারের দলিল বা ভারতে ইংরেজ গভর্ণরদের জীবনী, কোনোটিই ভারতীয় জনগণের ইতিহাস নয়। লক্ষ লক্ষ মূক, নিপীড়িত ভারতীয়দের কোনো ইতিহাস রচয়িতার সন্ধান আজো মেলে নি।" বইটির উপসংহারে তিনি বলেছেন : "বিগত শতাব্দীর উত্তর ভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজের বহির্বিশ্লেষণ এক্ষণে সমাপ্ত হল..."। (পৃ ৩, ২৩২)। কিন্তু বাঙলার এক প্রান্তে অবস্থিত দুটি জেলার কথাই তিনি আলোচনা করেছেন; সমগ্র বাঙলার কথা দূরে থাক, এই বিশাল প্রদেশের কোনো বৃহৎ অংশের অবস্থাও তিনি আলোচনা করেন নি। ভৌগোলিক বিচারে বইটির নাম বিভ্রান্তিকর। এই দুটি জেলার 'গ্রামীণ সমাজের বহির্বিশ্লেষণ'ও বইটিতে পাওয়া যায় না। ঈসট ইনডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে জনজীবনের ছবির ধূসর ছায়া ভেসে এসেছে; কিন্তু সাধারণ মানুষের আয়, খাদ্য, বস্ত্র, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই। কেবলমাত্র সাঁওতালদের বিবরণে হানটার জনজীবনের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বাঙলার গ্রামীণ অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় কোম্পানির কর্মচারী এইচ. টি. কোলব্রুক-রচিত এবং ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে (রিমার্ক্‌স অন দি প্রেজেনট স্টেট অব দি হাস্‌ব্যানড্রি অ্যানড কমারস অব বেঙ্গল)। হানটার এই বইটির নাম উল্লেখ করেন নি।

হানটারের বইয়ের ভৌগোলিক কেন্দ্র বীরভূম-বিষ্ণুপুর, অন্য কয়েকটি জেলার উল্লেখ নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। যেমন, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর। কালক্রমের দিক থেকে বইটির কোনো ঐক্য নেই। প্রধান আলোচ্য দুটি বিষয়ের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ) মধ্যে কোনো কার্যকারণগত সম্বন্ধ নেই। এই দুটি ঘটনার মধ্যে ৮৫ বৎসরের ব্যবধান। দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একসূত্রে আবদ্ধ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ পাওয়া যায় না।

'রাজরাজড়াদের কুলপঞ্জী' সম্বন্ধে হানটারের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বীরভূমের রাজাদের সম্বন্ধে দুটি পরিশিষ্ট আছে (প্রায় ১৫ পৃষ্ঠা)। বৃহত্তর অংশ 'স্থানীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও দেশীয় পারিবারিক নথিপত্র হতে' এক পন্ডিত-কর্তৃক হানটারের জন্য লিখিত হয়েছিল। তিনি এই বিবরণীর সত্যাসত্য যাচাই করার চেষ্টা করেন নি। রাজাদের বংশতালিকা সংকলিত হয়েছিল ফারসি ভাষায় লেখা একটি পান্ডুলিপি থেকে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের বিবরণীও ঐ পন্ডিত প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু সেটি 'রাজার আদেশে প্রস্তুত ফারসি পান্ডুলিপির ও রাজার দফতরের কাগজপত্রের সাথে তুলনামূলকভাবে পরিমার্জিত' হয়েছিল। বাঙলার অন্য কোনো জেলার কোনো জমিদারবংশ সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণী হানটার সংগ্রহ করেন নি।

বীরভূম-বিষ্ণুপুরের রাজস্ব এবং প্রশাসনিক ব্যয় সম্বন্ধে দুটি পরিশিষ্ট রয়েছে। জনজীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্য এখানে পাওয়া যায় না।

'পরিচায়িকা' অধ্যায়ে হানটার গ্রামের 'রেকর্ডপত্র' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু কাজটি যে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার স্বার্থেই করা দরকার, তা তিনি গোপন রাখেন নি। তিনি বলেছেন : "প্রাপ্ত তথ্যাদির সহায়তায় ভারত সরকার আজ পর্যন্ত অবহেলিত দুটি কর্তব্য সমাধান করতে পারবেন। প্রথমত স্বজাতির প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ বাঙলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র আনুষঙ্গিক বিবরণী রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত—অন্য জাতিগুলির প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ পাশ্চাত্য দুনিয়ার সম্মুখে ভারতের লক্ষ-লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত করা।" এই 'প্রকৃত চিত্র' যে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, এমন সম্ভাবনা তাঁর মনে উদিত হয় নি। আর 'প্রাপ্ত তথ্যাদির সহায়তায়' প্রশাসনের দুর্বলতা তথা ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সরকার সাধারণ মানুষের দুর্দশার প্রতিকার করতে পারেন, এমন কথাও তিনি ভাবেন নি।

ব্রিটিশ শাসন যে ভারতের জনগণের পক্ষে উপকারী, এ বিষয়ে হানটারের কোনোই সন্দেহ ছিল না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য অগ্রাহ্য করে বিকৃত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "১৭৬৫ সনের চুক্তি কোম্পানিকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেয় এবং এই কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও

বিবেচনার সাথে সম্পাদিত" (পৃ. ২০৭)। ১৭৬৫-১৭৯৩ সালের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষার ফলে প্রজাদের বহু দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। "ইংরেজ বাসিন্দাদের কেন বাংলায় স্বাগত জানানো উচিত" তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হানটার বলেছেন, "তারা ভালোভাবে কাজকর্ম করতে সরকারকে বাধ্য করে এবং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, শুরু থেকেই জনগণের উপর ব্রিটিশ বাণিজ্যের ফলাফল মঙ্গলকর হয়েছে।" ইংরেজ নীলকর এবং অন্যান্য বণিকেরা কিভাবে "ভালোভাবে কাজকর্ম করতে সরকারকে বাধ্য করে" তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন হানটার, তবু তিনি এই মন্তব্য করেছেন (পৃ. ২২৯)। তাঁর মতে, ব্রিটিশ "পুঁজির প্লাবন" ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার "কর্ম-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে" এবং "জীবনধারণের জন্য গ্রাম বাংলার ভূমি-নির্ভরতা বন্ধ হয়েছে।" (পৃ. ২৩০)। কুটিরশিল্প গ্রামবাংলার ভূমিনির্ভরতা-জনিত দারিদ্র্য অনেকটা হ্রাস করত, কিন্তু ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ কুটিরশিল্প ধ্বংস করা হয়েছিল। এই নিষ্ঠুর সত্যকে হানটার এক জমকালো পোশাকে ভূষিত করেছেন।

গ্রামবাংলায় ব্রিটিশ বণিকের অভ্যুদয়ের ফলে এক নতুন অভিজাত-গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। এই বণিকেরা পুরানো বাঙালি জমিদারের মতোই সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তাঁদের একটা বাড়তি সুবিধা ছিল : মফঃস্বলের কোন আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেত না, কেবলমাত্র কলকাতার সুপ্রীম কোর্টেই তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশের বিচার হত। কোনো প্রজার পক্ষে এই বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হত না, জমিদারদের পক্ষেও সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা সহজ ছিল না। ১৮৪৬ সালে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখক মন্তব্য করেছিলেন, মফঃস্বলবাসী ইংরেজরা নিকৃষ্টতম জমিদারদের মতোই নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী। মেকলে এবং বেথুন বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সদস্য রূপে এই বিচারব্যবস্থা সংশোধনের জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সাফল্যলাভ করতে পারেন নি।

হানটার এরকম অপ্রীতিকর ব্যাপারের আলোচনা করেন নি। তিনি বীরভূমের "একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ মালিক" সম্বন্ধে বলেছেন : "বাংলার জেলা নিবাসী প্রতিটি ইংরাজের মতোই তাঁরও স্থানীয় সরল জনগণের জন্যে এক ধরণের মোটা দাগের পিতৃপ্রতিম ভালোবাসা জন্মে।" তাঁর বাসস্থানের বর্ণনা করেছেন হানটার : "ময়ূরাক্ষীর তীরে উচ্চভূমিতে মনোরমভাবে এই অট্টালিকা অবস্থিত, সুবিশাল আলম্ব দ্বারা নদী হতে সুরক্ষিত এবং উচ্চ বহুকোণী প্রাকার বেষ্টিত—ক্ষুদ্র এক শহরের জন্য স্থান সংকুলানে সক্ষম।" তিনি "বীরভূমের সমগ্র উত্তর-পূর্ব জঙ্গলব্যাপী ছোট ছোট রেশম কারখানা গড়ে তোলেন" এবং সেখানে গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় (পৃ. ২৩০)। এটাই "স্থানীয় সরল জনগণের জন্য" তাঁর "পিতৃপ্রতিম ভালোবাসার" পরিচয়। এই ভাগ্যবান কর্মীরা কত মজুরি পেত, তারা কিভাবে জীবনযাপন করত, তাদের শ্রমজাত সম্পদের কত অংশ দয়ালু ইংরেজ বণিকের প্রাসাদনির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল—'গ্রামবাংলার ইতিকথা' রচনায় হানটার এসব অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে হানটারের বিবরণ এখনও ঐতিহাসিকেরা ব্যবহার করেন, কারণ তিনি সরকারি নথিপত্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই বিবরণ নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ। আলোচনা প্রধানত হানটারের নির্বাচিত অঞ্চল, অর্থাৎ বীরভূম-বিষ্ণুপুর, অঞ্চলে সীমাবদ্ধ : সমগ্র বাঙলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপের তারতম্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের স্থানীয় কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেন নি। কোম্পানির সরকার, কোম্পানির স্থানীয় কর্মচারীরা এবং মহম্মদ রেজা খাঁ—এঁরা কে কতখানি দায়ী ছিলেন, সে সম্বন্ধেও তিনি ভাসা-ভাসা কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। শুধুমাত্র হানটারের লেখা পড়লে পাঠক ওই মন্বন্তরের সামগ্রিক রূপ দেখতে পাবেন না।

সাঁওতালদের সম্বন্ধে হানটার অতি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'বীরভূমের পাহাড়িয়া জাতি' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ সুস্পষ্ট, কিন্তু বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের 'পাহাড়িয়া জাতি' সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। সাঁওতালদের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা তথা ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা মূল্যবান। তাদের ভাষা সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মূল্য ভাষাতাত্ত্বিকরা যাচাই করবেন। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি 'কমপারেটিভ ডিকশনারি অব নন-এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজস অব ইনডিয়া অ্যান্ড হাই এশিয়া' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়েছিল কিনা জানি না। হানটার ভাষাতাত্ত্বিকরূপে গ্রীয়ারসন দূরে থাকুক, বীমস-এর পর্যায়েও স্থানলাভ করেন নি।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে হানটারের বিবরণ মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে কিছু নতুন ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং নতুন তথ্য পাওয়ার ফলে বিদ্রোহের প্রকৃতি নতুন ভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সিধু-কানুর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গরূপে গণ্য করার প্রবণতা এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার একটি প্রধান রাজপথের নতুন নাম দিয়েছেন সিধু-কানু ডহর। যে ভ্রান্ত নীতির ফলে নিরীহ সাঁওতালদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল হানটার তার মৃদু সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রশাসনিক অযোগ্যতাই সাঁওতালদের বিচ্যুতির প্রধান উৎস...।" (পৃ. ১৫৪)। সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল স্থানীয় জমিদার, মহাজন, দোকানদার প্রভৃতি শোষকের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাজ্য গঠন তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হানটার আশাবাদী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আজকের বাঙালিদের দেখে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না" যে "সকল ভারতবাসী হবে এক জাত, এক জাতি।" তবে "তাদের বর্তমান প্রয়োজন হচ্ছে সামাজিক সমন্বয় সাধন"—বিভিন্ন জাতির "পুনরুজ্জীবন" (পৃ. ৮২)। মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন জাতীয়তাবাদ অতি স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মনে অঙ্কুররূপে লুক্কায়িত ছিল।

ভাষান্তরীকরণ সম্বন্ধে অনুবাদক যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সেজন্য তিনি বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন। তবে দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমত, মাঝে-মাঝে তিনি ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে বাঙলা ভাষায় অচল বাক্য রচনা করেছেন। যেমন : (১) "মুসলমান রাজবংশ এই সুযোগের (অর্থাৎ দেওঘরের মন্দিরে বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী সমাগমের) সদ্ব্যবহার করে কাফেরদের মূল্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে" (পৃ. ১৭২)। (২) "তিনি (লর্ড কর্ণওয়ালিস) প্রকৃতই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিজয় অর্জন করেছিলেন" (পৃ. ১৯২)। (৩) "আইন গঠনের উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোনস-এর আলোকপ্রাপ্ত প্রয়াস" (পৃ. ২০৩)। (৪) "লর্ড কর্ণওয়ালিস করণীয় সম্বন্ধে মহত্তর ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে পর্যন্ত, ব্যবসা ও অর্থ উপার্জন প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত ছিল... (পৃ. ২০৮)। দ্বিতীয়ত, 'আবাসিক প্রতিনিধি' (পৃ. ১৪), 'তত্ত্বাবধায়ক' পৃ. ৫৪), 'ব্রিটিশ ও বিদেশী বাইবেল সমিতি' (পৃ. ১৭৫), 'পরিভ্রমণকালীন আদালত' (পৃ. ১৯৮), 'প্রতিনিধি', 'বড় ব্যবসায়ী', 'ছোট ব্যবসায়ী', 'কুঠিয়াল', 'সহ-কুঠিয়াল' (পৃ. ২২০), 'হুজুর জেলা' (পৃ. ২৪৭)—এইরকম বহু শব্দ তথা শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ছাড়া কোনো সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। অনুবাদক যদি পাদটীকায় সংক্ষেপে এগুলির ব্যাখ্যা করতেন তবে বইটি আরও সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য হত।

বইটির প্রধান ত্রুটি একটি ভূমিকার অভাব। কোম্পানির শাসনযন্ত্রের কাঠামো, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যব্যবস্থা রাজস্বব্যবস্থা, আইন-ও বিচার-ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত করে অনুবাদক পাঠককে সাহায্য করতে পারতেন। অনুবাদটি সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, মুষ্টিমেয় গবেষক ইংরেজিতে লেখা মূল বইটিই পড়তে পারেন। হানটার যেসব বিষয় আলোচনা করেছেন সেগুলি সঠিকভাবে বুঝতে হলে যত খানি ইতিহাস জানা দরকার তা সাধারণ পাঠকের জানা নেই। হানটারের আলোচনাপদ্ধতি এবং ভাষা সরল নয়।

অনুবাদক আশা প্রকাশ করেছেন, "অতি সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চায় বর্ধিত আগ্রহে এই অনুবাদ সহায়তা করবে।" কিন্তু হানটারের বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে 'অতি সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চার' ফল তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুটি ঘটনা সম্বন্ধে নতুন তথ্য এবং সিদ্ধান্ত দুটি পরিশিষ্টের মাধ্যমে পাঠকদের উপহার দেওয়া যেত। এই দুটি ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণাভিত্তিক বইয়ের নাম সংযোজিত হলে উৎসাহী পাঠক সেগুলি পড়তে পারতেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হানটারের তথ্যনির্বাচন এবং মন্তব্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বইটির মূল্যবৃদ্ধি হত। শতাব্দীর অধিক কাল আগে লেখা বইয়ের মূল বা অনুবাদ প্রকাশ করতে গেলে সম্পাদনা এবং সংযোজন আবশ্যক।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আঠারো টাকা।

বাংলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা—মনসুর মুসা। বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কুড়ি টাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নানা আলোচনাগ্রন্থ এর মধ্যেই আমাদের আগ্রহ তথা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাঁর লেখা মূলত তথ্যমূলক নয়, একটি পূর্বগৃহীত কল্পসূত্র বা হাইপোথিসিস ধরে নিয়ে তিনি তার ব্যাখ্যা আর উদাহরণ হিসেবে তথ্য, গ্রন্থ বা অন্যান্য সূত্রের উল্লেখ করেন। ফলে তাঁর লেখা বক্তব্যপ্রধান, বিষয়ভারাক্রান্ত নয়। তাঁর বলবার ভঙ্গিটিও মনোগ্রাহী। ছোটো-ছোটো বাক্যে, খানিকটা অন্নদাশংকরীয় কথোপকথনের ভঙ্গিতে তাঁর

বলবার কথাকে সাজিয়ে যান তিনি, ক্রিয়াপদটিকে আগে বসিয়ে তার মূল প্রসঙ্গকে বাক্যের শেষে আনেন সকলের নজর কাড়বার জন্য। ফলে তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য থাকলেও পাণ্ডিত্যের ভারাচ্ছন্নতা থাকে না, তাঁর কথা তরতর করে এগিয়ে চলে। তিনি সেই বিরল প্রাবন্ধিকদের একজন, যাঁর গদ্যে একটি সচেতন স্টাইলের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রচনায়, যা মূলত সন্দর্ভজাতীয়, এই স্টাইল খুব কাজে লাগে।

এ বইটির বক্তব্যও খুব অভিনব। তাঁর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্য মূলত মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করেছে, তা বৃহত্তর জনজীবনের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। এ কথাটি তাঁর একটি ব্যাপকতর সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। তাঁর মতে, উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের যে রেনেশাঁস—তা "একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে সামন্তবাদ—এ দুয়ের যুগপৎ তৎপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাইরে থেকে একটা আলো এসেছে, কিন্তু ভেতরের অন্ধকার যে পরাভূত হবে তা হয়নি। শ্রেণীস্বার্থের প্রহরাধীনতায় জনজীবন-বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে সামাজিকতার নিয়মাবলী। সৃষ্টি হয়েছে একটি সামাজিক ব্যাকরণ। সেই ব্যাকরণ স্বাভাবিকভাবেই আপন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ওই-কালেই-গড়ে-ওঠা বাংলা গদ্যের ওপর" (ভূমিকা)।

তৃতীয় বিশ্বে, এবং অধিকাংশ প্রাক্তন উপনিবেশে, পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদের যে-কোনো উত্তরাধিকারকেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, এ দৃষ্টিভঙ্গি ইদানীংকালে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। এ সন্দেহের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। একথা খুবই ঠিক যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ইস্কুল-কলেজ, রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ আর ডাকব্যবস্থা, কোর্ট-আদালত, থানাপুলিশ যা-ই বসিয়ে থাকুক, তার মূলে উপনিবেশ-শাসন এবং শোষণ করার একটা সচেতন পরিকল্পনা ছিল, 'সভ্যতা-বিস্তার'-টা উপরকার খোলস মাত্র। এই সভ্যতাবিস্তারের প্রথম আলো যারা পেল তারা অনেকটা একবার ঠেলে-ঠুলে রেলের কামরায় উঠে পড়া প্যাসেনজারদের মতো অন্যদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখবার চেষ্টা করেছে, একথাও কিয়দংশে সত্য।

লিপির প্রচলনের ইতিহাস থেকে এই বিষয়টা পরোক্ষভাবে অনুমান করবার চেষ্টা করেছেন গুডি আর ওয়াট নামে দুজন গবেষক 'দ্য কনসিকোয়েনসেস অব লিটারেসি' নামক এক প্রবন্ধে। যারা লিখতে জানত তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যে জিনিসটা মন্ত্রগুপ্তির মতো করে রাখত, বাইরের কাউকে শেখাত না বিশেষ, ফলে বাইবেলে স্ক্রাইবদের বিষয়ে প্রচুর গালমন্দ আছে। তা ছাড়া পৃথিবীর বহু জায়গায় ভাষায় লিপির প্রচলন সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের ভূমিকা প্রস্তুত করেছে। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পুঁথি থাকত শেকলে বাঁধা, কিংবা শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না—এসব দৃষ্টান্তও শ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থ অব্যাহত এবং সীমাবদ্ধ রাখার অনুমানকেই সমর্থন করে চলে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং তার নতুন আবিষ্কার বাঙলা গদ্য—উভয়কে এই দায়ে চিহ্নিত করেছেন—দুইই সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের তোষণ করেছে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দিকে সহযোগিতা আর উপকারের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। বস্তুত এই তাঁর 'পূর্ব-মীমাংসা' (মনসুর-মুসা-কৃত 'হাইপোথিসিস'-এর বাঙলা পরিভাষা), এবং এটিকে প্রথমে ধরে নিয়ে তিনি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করে মূলত দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, "এই যে গদ্যের চর্চা চলল উদ্যম, উৎসাহ ও সৃজনশীলতায়, তার ভাষা বক্তব্যের মতই দূরে রইল জনজীবন থেকে। সাহেবরা তবু গরীবের ভাষা জানতো, দেশী পণ্ডিতেরা জানতেন না পাণ্ডিত্যের কারণে" (৮৭ পৃ.)।

শুধু ভাষা দূরে রইল, একথা বলেই লেখক থামেন নি অবশ্য। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, অনেক লেখকই গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী হয়েছেন—যেমন রামমোহন—"রংপুর ছেড়ে কলকাতায় এলেন, কলকাতা ছেড়ে গেলেন লন্ডনে। সেই যে গেছেন আর ফেরেন-নি" (২৭ পৃ.)। ওই না-ফেরাটা—অর্থাৎ বিদেশে মৃত্যু—রামমোহনের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত কোনো স্পষ্ট 'ডিজাইন'-এর অন্তর্গত—এমন ইঙ্গিত দেখে চমকে উঠি একটু। লেখক কি তাই চেয়েছেন? বিদ্যাসাগরও না কি সেভাবে গ্রামে ফিরে যান নি, মানে মাঝে-মাঝে গেলেও "গ্রামের কিছু এসে যায় নি। গ্রামে তিনি থাকেন নি।" বিনয় ঘোষের মতো এ লেখকও হয়তো বলবেন, বিদ্যাসাগর দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটা জেলায় প্রত্যেকটিতে গুটি পাঁচ-ছয় করে যে 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেছিলেন তাতেও গ্রামের কিছু এসে যায় নি, কারণ তিনি তো এঁদো পাড়াগাঁয় গিয়ে বসান নি স্কুল, বসিয়েছেন শহরে বা আধা-শহরে।

এই ধরনের বিস্ময়কর রকমের একবগ্গা আর টানা সিদ্ধান্তে (সুইপিঙ জেনারেলাইজেশন-এ) প্রায় পুরো বইটি ভরতি, এবং সে সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপ্তবাক্যের আত্মীয়তা খুব বেশি। লেখক মীর মশাররফ হোসেনকে ব্যক্তিগত বিবর্তনের মধ্যে যতটা ধরবার চেষ্টা করেছেন অন্যদের ক্ষেত্রে ততটা ধৈর্য দেখান নি, আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ ছাড়া সকলকে একশ্রেণীভুক্ত করে দেখানোর আগ্রহে প্রত্যেকের জীবনেতিহাসের বিভিন্নতাকেও তেমন গুরুত্ব দেন নি। নইলে রামমোহনের শহরমুখিতা আর বিদ্যাসাগরের শহরমুখিতার বা 'জনজীবনবিচ্ছিন্নতার' চরিত্র এক হয় কী করে? আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর সুস্পষ্ট শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা অন্তত গদ্যরচনায় কী করে উত্তীর্ণ হলেন তার কোনো সমাজবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন নি। মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের মডেলে যাকে ভিত্তি (বেস) আর অধিকাঠামো (সুপারস্ট্রাকচার) বলা হয়েছে সে দুয়ের বড়ো বেশি সরল আর একমুখী সম্পর্ক দেখাতে আগ্রহী শ্রী চৌধুরী।

ফলে, অসংখ্যবার তাঁকে স্ববিরোধী এমন-কি ভ্রান্ত উক্তির ফাঁদে পা দিতে দেখে পীড়িত বোধ করি। যতিচিহ্নের সঙ্গে শ্রেণী-ব্যক্তিত্বের একটা সম্পর্ক তিনি লক্ষ করেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বত্র সমতা রক্ষা করে না। ভবানীচরণের ভাষা 'যতিবিহীন' সেজন্য সপ্রশংস লেখকের মনে হয় "যেন তার মাত্রা নেই, স্থিতি নেই"; (১৩ পৃ.); আবার রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে বলেন, "উপযুক্ত যতি-চিহ্নের অভাবে তাঁর গদ্যের চল একটানা, এক ঘেঁয়ে তার গতি, এগোয় একটিমাত্র রেখা ধরে।" তাঁর একটি কথা এই—"বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষই বাঙলা জানত না; জানে না আজও।" (২৭ পৃ.) চমকপ্রদভাবে একটা সাধারণ কথা বলতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ভাষাজ্ঞান আর লিপিজ্ঞান ('লিখতে-পড়তে জানা')—এ দুটি ভিন্ন ক্ষমতাকে এক করে দেখেছেন। তা দেখা উচিত নয়। 'সাধু' আর 'চলতি'র অতিশয় গভীর বিভাজন তাঁর মতে না কি রামমোহনই সৃষ্টি করে গেছেন। এ কথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ এবং ভ্রান্ত। 'সাধু' গদ্য রামমোহনের আগেই তৈরি হয়েছিল, তিনি তার সংগঠন ও উপজীব্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনর্বিন্যস্ত এবং বিস্তারিত করেছেন মাত্র। অন্যত্র 'আপন আপন' না লিখে 'আপন২' লিখেছেন বলে লেখক রামমোহনের "স্বশ্রেণীর আলস্য" লক্ষ্য করেছেন। বাংলা পুঁথিতে এই প্রথা বিভিন্ন লিপিকর কয়েক সহস্রবার অনুসরণ করেছেন, এখনও প্রাচীনপন্থীরা চিঠিপত্রে এই অশ্মীভূত প্রথা মান্য করেন,—এঁরা সকলেই তাহলে রামমোহনের "স্বশ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত? মধুসূদন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে "জমিদারদের দুর্দশার সংবাদে উল্লসিত হন।"—লেখকের আরেকটি উক্তি এইরকম। এইরকম শাদা যুক্তিতে তো 'মেঘনাদবধ', 'হেকটর বধ' 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' 'মায়াকানন'-এ মধুসূদনের রাজতন্ত্রের প্রতি অচলা ভক্তিও প্রমাণ করা যায়! 'জমিদারের দুর্দশা' আর 'লম্পট আর ভক্তবিটেল জমিদারদের দুর্দশা'—এ দুয়ের মধ্যে লেখক যে তফাত করেন না, সেখানেই এ বইয়ের প্রধান দুর্বলতা। লেখক নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে বড়ো বেশি ব্যগ্র, বড়ো বেশি সরল ছকের মধ্যে সমস্ত উদাহরণকে ঠেসে ভরতে চান, এমন-কি সেই উদ্দেশ্যে নিজের বক্তব্যের পক্ষে বেশি পীড়াদায়ক দৃষ্টান্তগুলিকে তাঁর আলোচনার বাইরেই নির্বাসন দেন। যেমন আনেন নি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে, তাঁর গদ্যের চাল নিজের টানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলবে না বলেই। হরপ্রসাদ হিন্দু এবং ভট্টপল্লীর পণ্ডিত হয়েও যে 'ইসলামী শব্দ' বর্জনের প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন তাও লেখকের স্বীকৃতি পায় নি।

একজায়গায় লেখক বলেছেন, পয়ার ছন্দ গদ্যের উদ্ভবকে বাধা দিয়েছে—"যেমনা কি না মধ্যবিত্ত বাধা দেয় সামাজিক বিপ্লবকে" (১৭ পৃ.)। অথচ এই গদ্যের বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকারই আলোচনা তাঁর সমগ্র বইয়ে! বইয়ের শেষে আবার বলেন, "কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যটি পুরাতন, বৌদ্ধ গান ও দোহা থেকে শুরু করে জনজীবনের ভাষাকে অবলম্বন করে। গদ্য তৈরি হয়েছে পরে, তৈরি হয়েছে জনজীবনবিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই।" (৯৩ পৃ.)—এ দুটি কথার মধ্যে সংগতি কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রেণী-বদ্ধ'তার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে লেখক বঙ্কিমের উক্তি উদ্ধার করেছেন, "যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।" (৬০ পৃ.) আমি সিরাজুল সাহেবের নিজের ভূমিকা থেকে এ অংশটি তুলে দিচ্ছি—"আজকের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক অর্জন ও ব্যর্থতার ভিত্তি সেই ঐতিহাসিক সময় যখন একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যস্ততার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং একটি অপরিচিত ও বিজয়ী সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে নানা গ্রন্থিতে আবদ্ধ করেছে।"

এ যদি "কথনের ভাষা" হয়, এবং লেখক নিজে যদি "লিখনের ভাষা" এবং "কথনের ভাষা" একাকার করে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এমন মনে করতে চান (যে কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর মহারথীরা পারেন নি বলে তিনি সমালোচনা করেন) তাহলে তাঁর বিভ্রান্তির পরিমাণ অল্প নয়। তাঁকে হয়তো এ কথা মনে রাখতে হবে যে, "লিখনের ভাষা" আর "কথনের ভাষা" হাজার কাছাকাছি এলেও তার মধ্যে প্রথা আর প্রকরণের কিছু পার্থক্য থেকেই যায়, এবং দ্বিতীয়ত, গদ্য আদিতে যে-শ্রেণীই সৃষ্টি করুক, তা দিয়ে কালে বিপ্লবের ইশতেহারও লেখা যায়। শ্রেণীর দুরভিসন্ধি ব্যাপক মুদ্রণ এবং মিডিয়া-বিস্তৃত যুগে গদ্যকে কেবল তারই ক্রীতদাস করে রাখতে পারে না।

মনে রাখতে হবে আরো একটি কথা। কেবল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষাই 'গদ্য' নয়, গদ্য ছিল গত শতাব্দীর নাটকের সংলাপে, উপন্যাসে, গল্পে, সাময়িকপত্রে, সংবাদপত্রে। গদ্যের ফাঙশন-এর এই বৈচিত্র্য তেমন করে নজর করি না বলেই 'সাধু' আর 'চলতি' গদ্যের বিরোধকে আমরা বড়ো বেশি ফাঁপিয়ে দেখি। এ দুয়ের মধ্যে থিসিস

অ্যানটিথিসিস গোছের চূড়ান্ত বিপ্রতীপ সম্পর্ক দাঁড় করানো সংগত নয়। 'সাধু' গদ্য অত্যন্ত সুবোধ্য আর সহজ হতে পারে, আবার চলতি গদ্যও অত্যন্ত দুরূহ আর দুষ্পাচ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন্‌টা বেশি করে 'জনজীবনবিচ্ছিন্ন' বলে গণ্য হবে?

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক বায়ুস্রোতের যতটা কাছাকাছি, নিছক অঙ্গরাজ্য হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ততটা নয়। বাংলাদেশের অনেক বেশি ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক বিদেশে যান, এবং নানা বিষয়ে সদ্যতন ধারণা আর চিন্তাগুলিকে সংগ্রহ করে ফেরেন। অনেকেই সেসব থেকে দীক্ষা আর প্রেরণা নিয়ে নতুন নতুন ভাবনায় নিজেরা উদ্দীপিত হন। ফলে তাঁরা সহজেই একটি বিষয়কে গতানুগতিক পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে গিয়ে দেখতে পারেন এবং ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচনা করে আমাদের বোধের ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। সব প্রকাশনাই সমান মূল্যবান বা প্রতিটি গ্রন্থই স্মরণীয় হয়, এমন কথা বলি না, কিন্তু বাংলাদেশের অনেক বইয়ের মলাটে-আঁকা শিরোনাম দেখেই যে আমরা অনেকে ভাবি 'বাঃ, এ বিষয়েও এমন আস্ত একখানা বই লেখা যায়!', সে কথা মিথ্যে নয়। সে বই সে প্রাথমিক উচ্ছ্বাসকে আগাগোড়া সমর্থন না করলেও ওই উচ্ছ্বাসটুকু তার সংগত উপার্জন। বিষয় বা দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবতা বা মৌলিকতা, কখনও বিদেশী মডেল থাকলেও, বাংলাদেশে প্রকাশিত অনেক বইকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে।

মনসুর মুসার এ বইটিও প্রথমে সেভাবেই বিস্মিত করে। সত্যই তো, পরিভাষা নিয়ে বাঙালি প্রায় দেড়শ-পৌনে দুশো বছর ধরে ভাবছে, কাজ করছে, তর্ক করছে, কিন্তু পরিভাষার গঠন আর গ্রহণ, নির্মাণ আর মূল্যনির্ধারণ সম্বন্ধে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনার বইয়ের জন্য এতদিন অপেক্ষা করতে হল আমাদের? একটা ভাষার যখন মান্যতাপাদন বা স্টানডার্ডাইজেশন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন তার লেখ্যরূপকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার দরকার হয়ে পড়ে। একটা উপায় তার শব্দভান্ডারের সম্প্রসারণ। ক্রমে এ ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানধর্মদর্শনের নানা সূক্ষ্ম বিষয় এবং তত্ত্বের বিচার বিতর্ক আলোচনা হবে, ফলে তার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দাবলি একে গড়ে তুলতে হবে। গদ্যকে তথ্য, যুক্তি ও বিচারের সমৃদ্ধ বাহন করে তুলতে হলে পরিভাষা বিশেষ করে দরকার, কারণ এ কাজে আবেগ বা অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালির জায়গা নেই, সন্দিগ্ধ বা দ্বৈধ অর্থেরও ভূমিকা অবাঞ্ছিত। পরিভাষা মানেই হল একটি সুনির্দিষ্ট ব্যত্যয়হীন অর্থওয়ালা শব্দ, যেখানে যেভাবেই বসানো যাক তার অর্থ সর্বত্র এক এবং অনড় থাকবে।

অপণ্ডিতের তৈরি পরিভাষা আর পণ্ডিতের তৈরি পরিভাষা এক নয়। দুয়ের সৃষ্টির ক্ষেত্রও আলাদা। অপণ্ডিত যখন অন্য সংস্কৃতি থেকে ধারকরা বস্তু, উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন সে যদি অন্য সংস্কৃতি এবং ভাষার, অর্থাৎ উৎসের নাম সরাসরি ব্যবহার না করে, কিংবা, ট্রেজারিকে 'তেরজুরি' করার মতো ভেঙেচুরে নিজের ভাষায় হজম করে না নেয়, তখন সুবিধেমতো একটা শব্দ নিজেই তৈরি করে ফেলে। তার মূলে যে খুব গভীর চিন্তা বা সজ্ঞান পরিকল্পনা থাকে, তা নয়। এইভাবেই সে তৈরি করেছে টর্চ-এর বদলে 'টিপবাতি', গ্রামোফোনের বদলে 'কলের গান', রেফ্রিজারেটরের বদলে 'ঠান্ডা মেশিন' ইত্যাদি। এতে টরপেডো থেকে 'তলপেটা'র মতো, (আজকের ভাষায় 'তল-পেটো' হলেই যেন ভালো হত) কিংবা শান্তিনিকেতনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিলডিং-এর রিকশাচালকদের মুখে 'হেডমিস্ত্রি বিল্‌ডিং' হওয়ার মতো লোকনিরুক্তিও আছে।

মনসুর মুসা বাঙলা পরিভাষা সৃষ্টির ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টার একটি গ্রহণযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন, বিশেষত প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন মনীষী আর বুদ্ধিজীবীর অতিশয় বিশদ, সম্পন্ন সব মতামত উদ্ধার করেছেন। পূব পাকিস্তান আর বাংলাদেশের উপর সংগত কারণেই তাঁর নজর বেশি, কারণ সাম্প্রতিক দু-তিন দশকে এ নিয়ে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের চেয়ে অনেক বিস্তৃতভাবে ভেবেছেন। তবু মুসার আলোচনায় দু-একটি ফাঁক থেকে গেছে—পরিভাষা-নির্মাণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিশেষ গুরুত্ব তথা মূল্য আছে, এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা আর মুক্ত দৃষ্টি দুই বাঙলার কাছেই সমান প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত ছিল। মুসা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সূচীপত্রে তাঁর নামোল্লেখমাত্র করেছেন। হরপ্রসাদের শিষ্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও নানা প্রাচীন পরিভাষা উদ্ধার এবং প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু হরপ্রসাদের মতো পরিভাষা নিয়ে বিশেষ চিন্তা গত শতাব্দীতে খুব কম লোকই করেছেন। তেমনই এ শতাব্দীতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এ বইয়ে কেবল সূচীপত্রের উল্লেখ হয়ে আছেন। অর্থাৎ মুসার আলোচনায় সব সময় যথাযোগ্য জায়গায় ন্যায্য গুরুত্ব পড়ে নি। প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত সরকারি প্রশাসন-সংক্রান্ত পরিভাষার সেমিনারটির খবর নিশ্চয়ই তাঁর কাছে পৌঁছোয় নি, সে বিষয়ে উল্লেখ থাকলে ইতিহাসের দিকটা পূর্ণতর হত।

পরবর্তী 'সমস্যা' অংশে পশ্চিমদেশে জনপ্রিয় 'কোয়েশ্চেনেয়ার'-রীতিতে মুসা পরিভাষাগুলির বিচার, মূল্য-নির্ধারণ এবং গ্রহণীয়তা-বর্জনীয়তা সম্বন্ধে অতঃপর কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছেন। এ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের নয়, উত্তরদাতাদের উত্তরের ভিত্তিতে তৈরি। পঞ্চাশ জন বহুলাংশে উচ্চশিক্ষিত উত্তরদাতাকে তিনি কতকগুলি পরিভাষা দিয়ে তিনি পরিচিতির মাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেকটিতে নম্বর দিতে বলেছিলেন, তাতে একই বস্তুর বা ভাবনার একাধিক পরিভাষার মধ্যে কোন্‌টি বেশি পরিচিত, কোন্‌টি কম—তা বেশ স্পষ্ট হয়। এই ভাবে পরিভাষার গ্রহণযোগ্যতা, যথার্থতা, সহজতা-কাঠিন্য, সৌন্দর্য-অসুন্দরতা তিনি যাচাই করেছেন—মূলত ভোটাভুটির সাহায্যে। সমস্যা হল, অসংখ্য ব্যক্তির এতৎসংক্রান্ত মতামত তিনি তুলে দিয়েছেন বইয়ের শেষ দিকে, কিন্তু তাদের মতামতের উপর নিজের বিশ্লেষণ আরোপ করে আলাদা করে আমাদের দেখিয়ে দেন নি যে পরিভাষা কেন গ্রহণযোগ্য, কেন যথার্থ, কেন সহজ বা কঠিন, কেন সুন্দর হয়ে ওঠে। অসংখ্য মতামতের, প্রায়শই পরস্পরবিরোধী মতামতের জঙ্গল থেকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তুলে আনা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সারভে এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল পদ্ধতির একটা গুণ এই যে, অসংখ্য ব্যক্তিগত সাবজেকটিভ মতামতের মধ্য থেকে তার সাহায্যে একটা বাস্তব বা অবজেকটিভ মানচিত্র তৈরি করা যায়। মুসার গ্রন্থে সেই মানচিত্রটি কেবল রেখাঙ্কিত হয়েছে, বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে নি। বস্তুতপক্ষে যথার্থতা, সহজতা এবং সৌন্দর্যকে আলাদা আলাদা তিনটি চল (ভেরিয়েবল) হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এ তিনের পরস্পরনির্ভরতার সূত্রটি তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল।

এর আগে অপণ্ডিতের পরিভাষা সৃষ্টির কথা বলেছি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ঋণ, আত্মীকৃত ঋণ (ওই ট্রেজারি—তেরজুরি), এবং লোকনিরুক্তি ছাড়া 'টিপকল', 'টিপবাতি' 'কলের গান', ইত্যাদি পরিভাষা নিছক বর্ণনামাত্র, এবং খুব প্রাথমিক, সরল বর্ণনা। পণ্ডিতদের পরিভাষা-নির্মাণ অত সহজ নয়। তাতে মূল শব্দের এমন-কি শব্দাংশের প্রতি আনুগত্য, অর্থের প্রতি আনুগত্য, কখনও কখনো ধ্বনিরূপের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন থাকে—এবং সেই সঙ্গে মূল পরিভাষা (আমাদের ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজি থেকে) সরাসরি আত্মসাৎ করব, না নিজেরা তার আদলে নতুন শব্দ তৈরি করব, নতুন শব্দ তৈরি করলে কোন্ সূত্র থেকে কোন্ নীতিতে করব,—এইসব সমস্যা দেখা দেয়। পরিভাষা তৈরির আগেকার সমস্যা এসব। পরিভাষা তৈরি হলে তারপর তার গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা দেখা দেবে। মুসা তাঁর আলোচনায় সমস্যার এই পর্যায় ভাগ করলে এবং পণ্ডিত-অপণ্ডিতের পরিভাষা-নির্মাণের ক্ষেত্র এবং চরিত্র আলাদা করলে ভালো হত; তাঁর অন্তত বলা উচিত ছিল যে, পণ্ডিতের পরিভাষা মূলত উচ্চবিদ্যার সূক্ষ্ম ধারণা তথা তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকবেই।

যেখানেই মুসা নিজের মন্তব্য করার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তিনি কিছু সংশয়ও তৈরি করেছেন। যেমন 'উপসংহার' অংশে। তাঁর মন্তব্য: "প্রত্যেকটি পারিভাষিক শব্দের জন্য একটি নতুন শব্দ-নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়।" এ কি সম্ভব, না এ কোনোকালে কোনো ভাষায় হয়েছে? তাই যদি হত তাহলে ইংরেজির মতো একটি অতি-সমৃদ্ধ ভাষায় হাজার হাজার লাতিন, প্রচুর ফরাসি এবং বেশ কিছু জারমান, ইতালিয়ান ইত্যাদি শব্দ হুবহু গৃহীত হত না। তাঁকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অসংখ্য গাছপালার নামের কথা স্মরণ করতে বলি—সেগুলির কোনো ইংরেজি 'পরিভাষা' সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আর তাঁর ভাষাবিজ্ঞানে ablaut, umlaut, Sandhi, সমাজবিজ্ঞানে Gemeinschaft, Gesellschaft, সংগীতে sonata, contralto, soprano ইত্যাদি কত শব্দকে যে ইংরেজি আত্মসাৎ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই অবিশ্বাস্য "বাঞ্ছনীয়তা"র জন্য তাঁর যুক্তিও খুব অস্বাভাবিক। তাঁর মতে, "অভিধানে কোনো শব্দকে বোঝাতে হলে সমার্থক শব্দের প্রয়োজন।" প্রথমত, সমার্থক শব্দ বলে কিছু আছে কি না তাই বলা মুশকিল; দ্বিতীয়ত, কেবল সমার্থক শব্দ দিয়েই কি শব্দের অর্থ বোঝানো যাবে? 'ঘোড়া'-র অর্থ যদি আমি 'অশ্ব' লিখি তাহলে কে বুঝবে, অন্তত যারা 'ঘোড়া" কথার মানেটাই জানে না? অভিধানে অর্থ যে ব্যাখ্যানমূলকও হতে পারে প্রতিশব্দকে সম্পূর্ণ পরিহার করে, এবং পরিভাষার অর্থ অভিধানে অনেকটা সেভাবেই দেওয়া হয়, মুসা যেন তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। ফলে, পরিভাষার প্রতি-পরিভাষা নির্মাণ না করে মূল পরিভাষা ঋণ করার মধ্যে কোনো তাত্ত্বিক অসুবিধে নেই। ঋণ শেষপর্যন্ত নিজেরই সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়, সে পরিভাষা ফিরিয়ে দিতে হয় না। মুসা "অভিধানিক প্রয়োজন" আর "ব্যবহারিক ভাব-বিনিময়"-এর মধ্যে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন, বলেছেন প্রথমটির জন্য 'দূরালাপনী' এবং দ্বিতীয়টির জন্য 'টেলিফোন' চালু রাখতে হবে। এ খুব অভিনব আর অবাস্তব কথা। টেলিফোন কথাটির মানেই যে জানবে না, সে 'দূরালাপনী' প্রতিশব্দটি দেখে ঐ বস্তুটি কী তা কেমন করে বুঝবে? যদি ধরি সে 'দূর' আর 'আলাপনী' জুড়ে একটা মানে খাড়া করে নেবে—সে মানে যে 'দূর থেকে চেঁচিয়ে কথা বলা' নয়—তার কী গ্যারানটি আছে?

এইসব অস্পষ্টতার ফলে মুসার বইটি তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও যথেষ্ট উপকারজনক হয়ে উঠতে পারে নি। মনে হয়, ইতিহাসে পুরো নজর দিয়ে তিনি সেদিকটি আরো সমৃদ্ধ করতে পারতেন এবং তার সূত্র বিশ্লেষণ করেই নিজের আর

পাঠকের ধারণাকে স্বচ্ছতর, শাণিততর করে তুলতে পারতেন। আলোচনাকে একটি বৈজ্ঞানিকতার জমি দেওয়ার জন্য তিনি নিজে বেশ কিছু বিদেশী পরিভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্গানুবাদ-সহ, কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নগুলি বিশেষ আলোকিত হয়ে ওঠে নি। পরিভাষার ব্যাকরণ এবং ব্যুৎপত্তি নিয়ে তিনি নিজে প্রায় কিছুই আলোচনা করেন নি, ফলে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি নিজে কী ভাবছেন তা খুবই অস্পষ্ট। যেখানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দু-একটি তাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে তাঁর দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট। পরিভাষা-সমস্যাকে language universal হিসেবে দেখা language universal-এর প্রবক্তাদের প্রমোদিত করবে সন্দেহ নেই। আর ভাষার অধিকার বা competence প্রসঙ্গে তিনি 'চমস্কি : ১৯৫৭'—এই উল্লেখ করেছেন কেন? ১৯৫৭-র Syntactic Structures পুস্তিকায় চমস্কি কমপীটেন্স প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি—এ তত্ত্ব তাঁর ১৯৬৫-র বই 'Aspects of the Theory of Syntax'-এর। এসব দেখলে একটা অতিব্যস্ত প্রদর্শনপ্রিয়তা ও name-dropping-এর বোধ জেগে ওঠে। মূসা উৎসাহী গবেষক, তাঁর কাজের ব্যাপ্তিও কম নয়। গৃহীত ধারণাগুলিকে একটু থিতিয়ে নিলে তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ বাড়ত।

বইটিতে ছাপার বেশ কিছু ভুল চোখকে পীড়া দেয়। আর দেখে বিস্ময় লাগে যে, একজন বাঙালি লেখক লেখেন 'প্রসারতা' (প্রসার), (৯ পৃ.), 'ভাষা-তিরেক' (ভাষা-অতিরেক), কিংবা 'চ্যালেঞ্জ' কথাটি লিখে পাশে ব্র্যাকেটে ইংরেজিতেও কথাটি ছেপে দেন। দেখে বেদনা হয় যে, অসংশোধিতভাবে এ বইয়ে 'সায়ণভাষ্য', হয়েছে "স্বায়ংভাষ্য", 'বাজসনেয়ী সংহিতা' হয়েছে "বাজসনই" (বাজসেনীয়)", 'আপস্তম্ব' হয়েছেন "আপস্তন", 'শ্রৌতসূত্র' প্রথমে হয়েছে "শ্রোতসূত্র", তারপর বইয়ের শেষে সংশোধনে দাঁড়িয়েছে "স্তোত্রসূত্র"। ২০ পৃষ্ঠায় এসব উল্লেখ আছে, আর সেখানে 'কাপস্তায়ন' বলে একটি নামও আছে, তার উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নেই। এ কি 'কাপিষ্ঠলায়ন'-এর বিকৃতি? আর একজন ভাষাবিজ্ঞানী লিখবেন 'লাইবনিৎচ' (লাইবনিৎস)?

ফলে বিষয়ের গুরুত্ব, তথ্যের বহুলতা এবং মতামতের বিপুলতা সত্ত্বেও বইটি খুব অতৃপ্তিকর হয়ে থাকে। এ বইটি থেকে লেখক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পাই, তিনি নিশ্চয়ই তার চেয়ে উঁচু ধারণার যোগ্য।

পবিত্র সরকার

অক্ষয়কুমার বড়াল ও বাংলা সাহিত্য—মানস মজুমদার। প্রকাশক জ্যোতিশ্রী প্রকাশন কলকাতা-৬৪। পরিবেশক সারস্বত লাইব্রেরি কলকাতা-৬। মূল্য কুড়ি টাকা।

ডক্টর মানস মজুমদারের গবেষণাগ্রন্থটি সম্যকরূপে আলোচনা করতে গিয়ে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়া গেছে। খারাপ বইকে খারাপ বলার মধ্যে কোনো চমক থাকে না, এমনকি খারাপ বইকে ভালো বই বলার মধ্যেও কোনো কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। কিন্তু ভালো বইকে ভালো বই বলার মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ এসে যায়, এবং তার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি প্রদর্শনে সেই দায়িত্ব বাড়ে বই কমে না। সেজন্য শেষের সিদ্ধান্তটি আগে নিয়ে এসে বলতে হচ্ছে—অক্ষয়কুমার বড়াল সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গপ্রায় বই বোধকরি আমাদের হাতে ইতোপূর্বে আসেনি এবং গবেষণাগ্রন্থে অবশ্যপ্রাপ্য জড়তা থেকেও এই বই অনেকাংশে মুক্ত। মহৎসৃষ্টির মধ্যেই সূত্র থেকে যায়, আবার বিস্ময়ও অনেকখানি বর্তমান থাকে। এটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এমন রায় দেওয়া মুশকিল। সাহিত্যের মূল্যবোধে মাঝে-মাঝে কালগত পরিবর্তন ঘটেই যায়। নতুন তথ্যের আবিষ্কারও পুরনো তথ্যকে প্রতিষ্ঠা বা অপ্রস্তুত—দুই-ই করতে সমর্থ।

অক্ষয়কুমারের জন্মসন নিয়ে সন্দেহ থাকলেও মোটামুটি তিনি রবীন্দ্রযুগেরই কবি, যদিও তাঁর কাব্যচর্চা রবীন্দ্রনাথের পরেই আরব্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রযুগের এই কবি তৎকালীন সমালোচকের চোখে কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষতার সম্মান পান নি। নব্যভারত পত্রিকা ১২৯৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার এক-স্থানে তাঁর স্থান অন্যান্য দুজন কবির সঙ্গে 'রবীন্দ্রবাবুর নীচে' বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। এতে বিতর্ক ওঠার কথাই নয়। কিন্তু তা বলে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব কণ্ঠের মাধুর্যও শ্রবণযোগ্য নয় ভেবে নিলে অবিচার হবে। বস্তুতপক্ষে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। বাঙলার এই জনপ্রিয় কবির বিধিবদ্ধ শিক্ষালাভ বেশিদূর এগোয় নি। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন স্বয়ংশিক্ষিত। কবিতাচর্চায় তাঁর আদিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী। উল্লেখ করার বিষয়, অক্ষয়কুমার যে সময়ে বিহারীলালের কাছে যাওয়া-আসা করতেন, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর সুহৃৎ প্রিয়নাথ সেনও সে সময়ে বিহারীলালের কাছে যেতেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার সতীর্থ। কিন্তু চারিত্রে পার্থক্য ছিলই তাঁদের।

বিহারীলালের পরই তিনি বঙ্কিম-পরিবেশের আনুকূল্য পান। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর পর পর পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ—প্রদীপ (১২৯০), কনকাঞ্জলি (১২৯২), ভুল (১২৯৪), শঙ্খ (১৩১৭) ও এষা (১৩১৯) প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের জীবনে ওঠা-পড়ার এমন ইতিহাস নেই—যাকে উল্লেখ করা যায় তাঁর কাব্যজীবনপ্রসঙ্গে। রবীন্দ্র-সূর্যের দিগন্তোদ্ভাসিত ছটা ছিল, ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ঈর্ষাকাতর মনের নিঃসঙ্গতা, ছিল কিছু মানুষের অকারণ বিরোধিতা। আর ছিল পত্নীপ্রেমের অসীম বৈভব। সেই বৈভবের চ্যুতি বাঙলা সাহিত্যে আরও একটি শোককাব্যের জন্ম দিয়েছে। 'স্মরণে'র সঙ্গে 'এষা'কে পেয়েছি আমরা। এই সবই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ।

তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের তালিকায় কিন্তু যেটি বিশেষভাবে মূল্যবান ছিল তা তাঁর ভাবুকতা। সেই ভাবুকতায় ছিল রোমানটিসিজমের স্পর্শ, আবার বিদ্রোহের পদধ্বনিও। কোথাও তিনি প্রেমিক, কোথাও নারীজাতির গায়ক: কোথাও আধ্যাত্মিক, কোথাও সর্বব্যাপী গীতিকবি। জীবনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা 'দাও প্রেম—আরো প্রেম', চেয়েছেন—'আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি', প্রার্থনা করেছেন 'আত্মজয়-শক্তি' এবং 'ঈশ্বরে বিলীন' হতে। এই প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি, আত্মজয়-শক্তি এবং ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে কবি অক্ষয়কুমার—অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা। এসবই ডক্টর মজুমদার তাঁর বইটিতে তাঁর উপলব্ধিমতো আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণাগ্রন্থে শুধু অনুসন্ধান নেই, আত্মসন্ধানও আছে।

গ্রন্থকার তাঁর বইটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন আটটি অধ্যায়ে। অধ্যায়ের নামগুলি কবি-জীবনকথা, সাহিত্যচর্চা—নানাপ্রসঙ্গ, কাব্যপ্রবাহ, দৃষ্টিবৈচিত্র্য, রূপসৃষ্টি, ঐতিহ্যানুসৃতি, সমকালীন কবিগণ ও অক্ষয়কুমার এবং শেষ কথা। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজিতে যাকে বলে বাদামের খোলা (নাটশেল)-দ্বিতীয় অধ্যায়টি তাই। এটিতে কিছুক্ষণ সম্নিবদ্ধ হলেই বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। বোঝা যায়, পরিমাণগত সৃষ্টিতে নয়, গুণগত সৃষ্টিতে অক্ষয়কুমার কতোখানি স্ব-তন্ত্র। লেখক নিজস্ব-ভঙ্গিতে অক্ষয়কুমারের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের প্রায়-প্রতিটি কবিতার রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। তারই মধ্যে ঘটিয়েছেন শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং ব্যুৎপত্তিনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যকৃতির তুলনামূলক আলোচনায় অক্ষয়যুগটিকে যেমন স্পষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন, তেমনি সমকালীন কবিদের তুলনায় অক্ষয়কুমার কতখানি বিশিষ্ট, তাও তুলে ধরেছেন। ফলে প্রায় উপেক্ষিত এক কবি পুনশ্চ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স (জন্ম ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) প্রায় তেত্রিশ। অবশ্য এসব গবেষণার বিজৃম্ভণে অক্ষয়কুমারের কাব্যচর্চায় কিছুমাত্র হের-ফের ঘটে না।

ডকটর মজুমদার অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থগুলির সংস্করণ-পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন। সেটা কাজের কাজ। কিন্তু 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণে যে পরিমার্জনা লক্ষ করি, তাতে কবির ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রভাবও যে অনতিলক্ষ্য হয়ে রয়েছে, তাও বোধকরি উল্লেখ করার মতো। একদা রবীন্দ্র'বিরোধী' কবির এই প্রভাব অবশ্য উল্লেখ্য। কারণ ডকটর মজুমদার তাঁর বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত সম্পর্ক নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। একদা যে অক্ষয়কুমার 'ভুল' কাব্যগ্রন্থে (নামকরণ লক্ষণীয়) 'উপহার' কবিতায় বিহারীলালের কাছে উভয়ের গতায়াতের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন—

> রবি!
> এই জগতের দূরে—
> যে কোন মেঘ-পুরে
> তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া'—

তাঁর কাছে এই আত্মীকরণ খুবই স্বাভাবিক ছিল।

নতুন তথ্যের প্রতিষ্ঠা এই বইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। একটি উদ্ধার করি। নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর প্রবন্ধে 'কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা) সংশয় রেখেও অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতা হিসাবে (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৮৯) 'রজনীর মৃত্যু' কবিতার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার যথার্থই দেখিয়েছেন ১২৮৯ সনের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'পুনর্মিলনে' কবিতাটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতার দেহগত আলোচনার (ছন্দ, শব্দ ইত্যাদি) সঙ্গে কবিতার ভাবগত আলোচনার অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটিয়ে গ্রন্থকার আলোচনাগ্রন্থটিকে পূর্ণরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। পরিশিষ্টে অক্ষয়কুমারের রচনার তালিকা, অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান ও রবীন্দ্রনাথকৃত অক্ষয়কুমারের গানের স্বরলিপি দিয়ে সেই চেষ্টাকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন।

বারিদবরণ ঘোষ

বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান—রশীদ-আল ফারুকী। রত্না প্রকাশন। কলিকাতা-২৭। পঞ্চাশ টাকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রশীদ-আল-ফারুকী পশ্চিমবঙ্গেও মোটামুটি সুলেখক হিসাবে পরিচিত। বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সময়সীমা বেছে নিয়েছেন ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের

মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণের প্রকাশ ঘটে। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বীজও এই সময়ের মধ্যে রোপিত হয়। সুতরাং লেখকের মতে, "কি উপন্যাসের বিচারে, কি রাষ্ট্রিক জীবনপ্রবাহের বিশিষ্ট প্রকাশে এই কালকে খণ্ডিত করে দেখার যুক্তি রয়েছে।" তাছাড়া তিনি মনে করেন, "মীর মশাররফ হোসেনের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু'-ই (১৮৮৫-১৮৯১) বাঙালি মুসলমান-রচিত প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারে।" এই পথ ধরে উল্লেখিত কাল-সীমার মধ্যে আরো পঁচাত্তর জন মুসলমান ঔপন্যাসিক এবং তাঁদের রচিত প্রায় দেড়শ উপন্যাসের সাক্ষাৎ লেখক পেয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর মতে কাজী নজরুল ইসলামের রচনা (১৯৩০) দিয়ে বাঙালি মুসলমান-রচিত উপন্যাসের ধারার প্রথম পর্বের সমাপ্তি বলে গণ্য করা যায়।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে যেসব যশস্বী ব্যক্তির নাম অনায়াসে মনে আসে, উল্লেখিত কাল-সীমার উপর বিস্তারিত পর্যক্ষেণ তাঁদের আছে। ঐ সময়ের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টি-ভঙ্গিগত পার্থক্য যাই থাকুক, উপন্যাস রচনায় মুসলমানদের অবদান নির্ণয়ের প্রশ্নে ঔদাসীন্যের ব্যাপারটা কমবেশি এঁদের সবার মধ্যেই ব্যাপক। এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশের বঙ্গসাহিত্যের ইতি-হাসরচয়িতাগণ ব্যতিক্রম। কিন্তু এঁদের-ও কোনো আলোচনাতেই বাঙলা উপ-ন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত হয় নি।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাই এমন একটা বিষয়ে বিশদ গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার কৈফিয়ত হিসেবে বলেছেন, "উভয় বাঙলায় লিখিত সাহিত্যের ইতি-হাসে মুসলিমরচিত উপন্যাস অবহেলিত হয়েছে বলেই এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদিও আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যকে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাগ উচিত নয়,—তথাপি এসব সৃষ্টিকর্মকে অবলুপ্তির গহ্বর থেকে উদ্ধার করার অনুপ্রেরণা-তেই আমি একাজে হাত দিয়েছি। তা ছাড়া এসব উপন্যাস সমকালীন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র বহন করছে। বাঙলাদেশের সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্যেও এসব উপন্যা-সের ঐ সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য।" (পৃ. ৪) ৪)"

রশীদ-আল-ফারুকীর আলোচ্য গবে-ষণাগ্রন্থটি মূলত চারভাগ বিভক্ত : (ক) রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃ-তিক পটভূমিকা, (খ) বাঙলা উপন্যাসের ধারা ও মুসলিম প্রয়াস, (গ) মুসলিম-রচিত বাঙলা উপন্যাস এবং (ঘ) মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে জীবন-বোধ। এই গবেষণার মূল অংশে ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে লিখিত বা প্রকাশিত উপন্যাসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি মোট দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পাঁচজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিককে আলাদা করে নেয়া হয়েছে, কারণ লেখকের মতে মুসলিম ঔপন্যাসিকদের ভেতর এই পাঁচজনের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। পাঁচজনের নাম : মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট লেখকদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসগুলোকে ঐতিহাসিক, সামা-জিক, লোককাহিনীনির্ভর ও প্রতি-ক্রিয়াজাত—এইরকম চারভাগে ভাগ করা নেওয়া হয়েছে। উপন্যাসগুলোতে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বিশেষ-ভাবে পাঁচটি বিষয়ে : কাহিনীনির্মাণ-কৌশল, চরিত্রচিত্রনরীতি, এসব উপ-ন্যাসে সমকালীন হিন্দু ঔপন্যাসিক প্রভাব, ভাষা এবং সমাজচেতনাবোধ।

আলোচ্য বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার তাগিদে এইরকম সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়াস থাকায় অধ্যাপক রশীদ-আল-ফারুকীর বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থটি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের একটি অবহেলিত অধ্যায়ের ইতিহাসই হয়ে ওঠে নি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম জীবনের রূপান্তরপর্বের একটি সুসংবদ্ধ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গৃহীত হওয়ারও মর্যাদা অর্জন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে ডকটর রশীদ-আল ফারুকীর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হল : "পরিচ্ছন্ন গদ্যে যৌক্তিক পারম্পর্যের উপর ভিত্তি করে লেখা এই গবেষণাগ্রন্থ বাংলা উপন্যাস আলোচনা ও বিশ্লে-ষণের একটি স্মারকস্তম্ভ বলে বিবে-চিত হবে। একটি প্রায়ান্ধকার প্রদেশে শ্রীমান বসর সন্ধানী আলোকবর্তিকা জেলে দিয়েছেন, এজন্য উভয়বঙ্গের পাঠক-পাঠিকা তাঁকে অভিনন্দিত কর-বেন।" এখানে 'শ্রীমান বসর' বলতে বোঝানো হয়েছে খায়ের-উল-বসরকে যা রসীদ-আল-ফারুকীর প্রকৃত নাম।

আবদুর রউফ

দেশে বিদেশে

এ কেমন রাজনীতি ?

সাংঘাতিক রকমের অঘটন কিছু না ঘটলে, এই লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছবার দু সপ্তাহ আগে ভারতের জনসাধারণ দেশের অষ্টম লোকসভা নির্বাচন করে ফেলেছেন। সেই সভার চরিত্র কী হবে, কোন্ দলের অথবা দলসমষ্টির সরকারকে তাঁরা দেশ-শাসনের দায়িত্ব দেবেন, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা ফলাফল প্রকাশের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান দাপটে চলবে। তারপর হয়তো দেখা যাবে—সভাগৃহে যা শোভা পাচ্ছে তা সেই, সাবেকি আমলের ডাক্তারদের প্রেসক্রিপ-শনের ভাষায়, মিকশ্চার অ্যাজ বিফোর।

তা যদি নাও হয়, নতুন লোকসভায় যদি ক্ষমতার বিন্যাসে নতুনত্বই কিছু দেখা যায়, তবু ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র যে তাতে আমূল বদলে যাবে—এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। নতুন যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন (যদি নতুনেরা আসেন), তাঁদের প্রায় কেউই আনকোরা নতুন নন। ফরাসি ভাষায় একটা প্রচ-লিত কথা আছে—যতই বদলে যায় ততই একই থাকে। বদলে যাবার পরও আমাদের দেশের রাজনীতি যতদূর অপরিবর্তিত থাকবে বলে মনে হয় সেইটাই আমাদের এবারকার আলো-চনার বিষয়।

এ হল বাস্তব, ব্যবহারিক রাজনীতি, যাকে জারমান ভাষায় বলে, 'রিয়েল পলিটিক'। ধূলিমলিন নির্বাচনী ইসতাহারে যাকে মুখ মুছিয়ে, চুল আঁচড়ে, ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে লোকের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, এ রাজনীতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পথে নবাগত কে যেন একজন প্রেসিডেনট ট্রুম্যানের কাছে এর রীতিপ্রকৃতি হালচাল নিয়ে নালিশ করতে গিয়েছিলেন। ট্রুম্যান তাঁকে বলেছিলেন, "উনুনের আঁচ যদি সহ্য না হয়, হেঁসেল থেকে বেরিয়ে যাও।" অত সহজে যার গায়ে ফোসকা পড়ে, রাজ-নীতির রান্নাঘর তার জন্যে নয়। এক দিক থেকে দেখলে, যা দেশসেবার অধি-কার পাবার প্রতিযোগিতা, আরেক দিক থেকে তাই আবার ক্ষমতার জন্যে রেষা-রেষি। ক্ষমতাকে লক্ষ্যের বাইরে রেখে অনেক ভালো-ভালো কাজ করা যায়, কিন্তু রাজনীতি করা যায় না। নিজের জন্যে না হলেও নিজের দলের জন্যে, প্রত্যক্ষ শাসনক্ষমতা না হলেও পরোক্ষ-ভাবে অন্যকে প্রভাবিত আর নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা যাঁর অভীষ্ট নয়, তেমন ব্যক্তিও যাকে পাবলিক ওয়ার্ক বলে তা অবশ্যই করতে পারেন, এবং করেও থাকেন, কিন্তু তাঁর রাস্তা আলাদা, অরাজনৈতিক। আদর্শ রাজনৈতিক মানুষ বলে আমরা যদি একজনকে কল্পনা করি, তিনি অন্য সমস্ত দুর্বলতা জয় করতে পারেন, কিন্তু শাসনক্ষমতার হাতছানি উপেক্ষা করা তাঁর অসাধ্য। সেই ক্ষমতাই একজন রাজনীতিকের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার—অর্থও নয়, ইন্দ্রিয়সুখও নয়।

আমেরিকায় কোনো বড়ো শহরের মেয়রকে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করে-ছিলেন, "এই যে দিনরাত এত ঝামেলা-ঝনঝাট পোয়াচ্ছ, এত গালাগালি খাচ্ছ, কাগজওয়ালারা এত কুৎসা করছে, তবু কীসের লোভে মেয়র হয়ে বসে আছ? আবার তো ভোটের জন্যে দাঁড়াবে ?" বন্ধু উত্তরে বললেন, "নিশ্চয়ই দাঁড়াব। কেন, বলি শোনো। সকালবেলায় ঘুম ভাঙল, গত রাতে একটু অতিরিক্ত আমোদ-আহ্লাদ করার দরুন মাথাটা ধরে আছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে, মন-মেজাজ খুব খারাপ, বিশ্বসংসার বিষের মতো লাগছে। বিছানার পাশেই টেলি-ফোন। রিসিভারটা তুলে নিলাম, তার-পর বিছানায় শুয়ে-শুয়েই বলতে আরম্ভ করলাম, অমুককে চাকরিটা দিয়ে দাও, অমুকের কাজটা যেন আজই হয়ে যায়, অমুককে জানিয়ে দাও, কাল থেকে তার চাকরি নেই। টেলিফোন যখন নামিয়ে রাখলাম তখন দেখি শরীর ভালো হয়ে গিয়েছে, মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, বেঁচে থাকার সুখ আবার ফিরে এসেছে।"

বহুসংখ্যক মানুষের মনে ক্ষমতার তাগিদ ঠেলা মারে, তাই তাঁরা রাজ-নৈতিক দল গড়েন, ভোটের জন্যে দাঁড়ান, একবার হারলে আবার দাঁড়ান। দলাদলি থাকলেই রেষারেষি থাকবে, রেষারেষি থাকলেই আসবে প্রতিপক্ষকে কাবু করবার নানা কলাকৌশল। তার কিছু লোকচক্ষের সামনে ভাসে, কিছু নয়। একজন রাজনীতিকের জীবনের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে এইসব কাজকর্ম। বক্তৃতায় তার কথা বলা চলে না, কিন্তু তাকে বাদ দিয়েও চলা যায় না। আবার গণতন্ত্রও চলে না রাজ-নীতিক ছাড়া।

এ সবই মোটামুটি জানা কথা, সবিস্তারে বলার প্রয়োজন না থাক-লেও উল্লেখ করতে হল, যাতে ব্যব-হারিক রাজনীতির স্বভাব-চরিত্র চাল-চলন আগে কেমন ছিল, এখন কেমন দাঁড়িয়েছে, এসব নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা অসম্ভবের পেছনে ধাওয়া না করে। কে যেন বলেছেন, 'পলিটিকস ইজ দি আর্ট অব দি পসি-বল'—যা সম্ভবপর তাই নিয়েই রাজ-নীতির কারবার।

কিন্তু কী সম্ভব আর কী নয়, তার দেশকালভেদ আছে। যদি দেখা যায়, এমন রাজনীতি ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে, নাকে রুমাল না দিয়ে যার ধারেকাছে যাওয়া যায় না, তা হলে সেটা অবশ্যই একটা গুরুতর ভাবনার কারণ

হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তেমন অবস্থা এ-দেশে সাধারণভাবে এখনো আসে নি (দেশের কোথাও আসে নি, সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না), তবু নানা জায়গা থেকে যেসব খবর আসছে, তাতে মনে হয়, এখন থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

বিশেষ করে তিনটি রাজ্য নিয়ে আমাদের এখনকার ভাবনা। তার একটি দেশের মধ্যে অগ্রগতির দিক থেকে অগ্রগণ্য, মহারাষ্ট্র। এবং দ্বিতীয়টি অতিশয় পশ্চাৎপদ, আমাদের প্রতিবেশী বিহার। তৃতীয় রাজ্যটি উত্তর ভারতের যাকে হৃৎপিণ্ড বলা যায়—উত্তর প্রদেশ।

কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে অপরাধে লিপ্ত একাধিক শক্তিশালী চক্রের রাজনৈতিক প্রভাবপ্রতিপত্তির বিবরণ বেরিয়েছিল সারা দেশে বহুলপ্রচারিত এক দক্ষিণ-ভারতীয় ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। চোরাচালান, বে-আইনি চোলাই মদের কারবার, জুয়া, গণিকাবৃত্তি নিয়ে ব্যাবসা ইত্যাদি নানাপ্রকার অর্থকরী কারবার করায়ত্ত করে, অতঃপর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকেও তারা হাত বাড়িয়েছে। তার আগে অবশ্য ভূ-গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অর্জন করতে হয়েছে। কেউ গিরজা নির্মাণ করে দিয়েছে, কেউ বোমবাই শহরের সবচেয়ে সমারোহপূর্ণ গণেশ-উৎসব শহরবাসীকে উপহার দিয়েছে, কেউ মসজিদে, দরগায় দু হাতে টাকা বিলিয়েছে, দরিদ্রনারায়ণভোজন করিয়েছে। তা ছাড়া আছে সমাজসেবার আরও নানা প্রয়াস, অ্যামবুলেনস-সেবা সঙ্ঘ ইত্যাদি।

এইসব সৎকাজে একবার হাত দিলে তারপর সামাজিক সম্মান, সরকারি অনুমোদন আর পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বিনাবাধায় আসতে থাকে। ফিতে কাটতে, উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে রাজনৈতিক নেতারা, মন্ত্রীরা এবং তদীয় পত্নীরা সাগ্রহে হাজির হন। তারপর, সেখান থেকে আর-এক পা এগোলেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসনের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

অন্য পথে, (যাকে বলা যায় চোরাপথ) এদের অনেকে অবশ্য আগেই রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি এসে গেছে, এমনকি সে ক্ষমতায় ভাগ বসাতেও আরম্ভ করেছে। শুধু যে বিপুলপরিমাণে অর্থ তারা নির্বাচনী ভাণ্ডারে যুগিয়ে এসেছে তাই নয়, বিপুলসংখ্যক ভোটেরও নাকি তারা যোগানদার। বলা হয়েছে, এদের এক-এক জনের হাতে আছে বৃহদাকার ভোটব্যাঙ্ক, নির্বাচনের সময়ে বন্ধুভাবাপন্ন রাজনীতিকদের জন্যে সেখান থেকে প্রয়োজনমত ভোট তুলে আনা যায়। এমত অবস্থায় ক্ষমতাসীন কিংবা ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকের বন্ধুত্ব, এবং তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা কী করে দূরে থাকতে পারে?

সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে নামধামসহ এইসব অপরাধীদের কার্যকলাপের বিবরণ এবং তাদের রাজনৈতিক যোগসূত্রাদির সন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। সে বিবরণের কতটা যথার্থ, কতটা অতিরঞ্জিত, কতটা অনুমানমাত্র, তা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব; তবে, বোমবাইয়ের অপরাধজগতের একজন সর্বজনপরিচিত প্রধান ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা এবং তার পরেই খালাস করে দেওয়ার যে ঘটনা কিছুদিন আগে ঘটল, এবং তারপরে সেই ব্যক্তিই আবার কেমন অকুতোভয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারল, তাতে মনে হয় আইনের বেড়া ডিঙিয়ে রাজনীতিকের সঙ্গে অপরাধীর বন্ধুত্বপূর্ণ করমর্দন বিস্বাদজনক হলেও অনস্বীকার্য।

সবচেয়ে ভাবনার কথা, দেশের মানুষ আজ যত ব্যাপকভাবে রাজনীতিক এবং অপরাধীর এই সহযোগিতা, মূল সহাবস্থানের কথা বিশ্বাস করে, আগে কোনো দিন তা করত কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে একটি হিন্দি ফিলমের কথা উল্লেখ করা যায়।

'আজ কী আওয়াজ' নামে ফিলমটি সিনেমাশিল্পের এই দুর্দিনেও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর অতিশয় ভালোমানুষ আদর্শবাদী অহিংসাপন্থী নায়ক তার নিজের চোখের সামনে তার মা এবং বোনের ওপর বীভৎস অপরাধের অনুষ্ঠান হতে দেখে, এবং নিজের আগেকার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে, বুঝল পুলিসের সেপাই থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই অপরাধের সুতোয় গাঁথা। তখন সে নিজের হাতে দুষ্টের দমনের ভার নিল। এইবারে আইনের কল ঘুরতে আরম্ভ করল। প্রধান দুর্বৃত্তের খোঁচায় মন্ত্রী, এবং মন্ত্রীর খোঁচায় পুলিস সক্রিয় হয়ে উঠল—নায়ককে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। দর্শকের সহানুভূতি কার দিকে, আস্থা কার ওপর, বলা নিষ্প্রয়োজন। একটি ঘটনা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। এক দম্পতির বাড়িতে পুলিসের ইনসপেকটর এসেছেন, নায়ককে গ্রেপ্তারের সূত্রের খোঁজে। স্বামীর চোখের সামনে মহিলাটির ওপর যখন একদল দুর্বৃত্ত অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল তখন নায়ক এসে তাঁকে রক্ষা করে। সেই ঘটনার সূত্র ধরে ইনসপেকটর এসেছেন, বলছেন—তোমাদের রক্ষাকর্তার বিবরণ দাও। তার উত্তরে সেই মহিলা ইনসপেকটরকে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন। এঁকে গ্রেপ্তার করবে?" প্রেক্ষাগৃহে যে বিপুল করতালিধ্বনি সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাকে অভিনন্দিত এবং পুলিসকে ধিক্কৃত করল তা শুনলে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে থমকে যেতে হয়।

এই ফিলমে যেটা গভীরতম দুশ্চিন্তার কারণ, তা হল, এর প্রধান দুর্বৃত্তের হাতে যিনি প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বলে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত। অথচ তা নিয়ে কারো মধ্যে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না—না দর্শকদের, না ফিলমের সমালোচকদের। মনে হল, সকলের কাছেই এ অতি সাধারণ ব্যাপার।

সামাজিক সত্য আমাদের জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা কতটা প্রতিফলিত করে, সে সিনেমার প্রভাব জনমনে কতটা পড়ে—এইসব প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও, একটা বিষয় লক্ষ করা যায়। যতক্ষণ এই ফিলম চলে, প্রেক্ষাগৃহে বিরাজ করে এমন একটা মানসিক আবহাওয়া যা থেকে সহজেই বোঝা যায়, এর মূল বক্তব্য অবিসংবাদিত সত্য বলে সবাই মেনে নিয়েছে। দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে এই অবস্থা অতিশয় মারাত্মক।

অকটোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'ইনডিয়ান একসপ্রেস' পত্রিকায় লখনৌ থেকে প্রেরিত একটি বিস্তৃত রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তাতে ছিল, উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিকেরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমশই অর্থের জন্যে এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতার জন্যে অপরাধজগতের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। তার ফলে, অপরাধীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন জায়গা দখল করে বসেছে যেখান থেকে তারা অপ্রতিহত শক্তি খাটাতে পারে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা চেঁচামেচি আরম্ভ করেছেন, রাজনীতিতে অপরাধ-জগতের অনুপ্রবেশ রুখতে হবে।

কিন্তু এর মধ্যেই ব্যাধি অনেকদূর এগিয়েছে। 'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত গ্রামপ্রধানদের অর্ধেকের নামেই নাকি অপরাধের অভিযোগ নথিবদ্ধ' আছে। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে গোরখপুর, বালিয়া, ফৈজাবাদ, বড়বাঁকি ইত্যাদি স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেছে 'রাইফেল পার্টি' নামে অভিহিত দুর্বৃত্তের দল। পশ্চিমাঞ্চলে এটা জেলায় রাজনীতি নাকি সম্পূর্ণভাবে অপরাধ-কলুষিত, প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রধানদের মধ্যেই এমন ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের লম্বা ফিরিস্তি।

আর বিহারে? আগামী নির্বাচনে বিহারের ভোটদাতারা বহুলপরিমাণে অপরাধীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন, এমন আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে কলকাতার সংবাদপত্রে। পশ্চিম চম্পারন, রোটাস, বেগুসরাই, ধানবাদ এবং ভোজপুর জেলায় অপরাধীরা প্রাধান্য বিস্তার করবে ভোটদাতাদের ওপর। রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে—সাসারাম (তপশীলী) নির্বাচনকেন্দ্রের ফলাফল নির্ভর করবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বৃত্তদলের ওপর। ধানবাদে জনতা, কংগ্রেস-ই, বি জে পি এবং মার্কসবাদী কো-অর্ডিনেশন কমিটির চার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীই নাকি অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হবেন।

সংবাদে প্রকাশ, শিলিগুড়িতে এক নির্বাচনী সভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, "পুরানো দিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত কংগ্রেস আজ নেই। কংগ্রেস আজ দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর ও গুণ্ডাদের প্রতিষ্ঠান।"

শুধু কংগ্রেসের কথা নয়, সমস্ত রাজনৈতিক জীবন থেকে অপরাধী-সংসর্গ দূর করা আজ প্রধান জাতীয় সমস্যা। উত্তর প্রদেশে যে উদ্যোগের সূত্রপাত দেখা দিয়েছে, সারা দেশে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। নির্বাচনে কোন্ দল জিতল, কে হারল, তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন—সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই যেভাবে লোকের চোখে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে, তা রোধ করা যাবে কিনা।

১৫. ১২. ১৯৮৪

এখন সমাজতন্ত্রবাদ

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বছরের নির্বাচনে প্রেসিডেনট রেগানের জয়ের আকার এবং ব্যাপ্তি অনেকে এই বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন যে, এ শুধু প্রেসিডেনটের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, তাঁর সিনেমা-স্টারসুলভ লোকের মন কাড়বার ক্ষমতারই প্রমাণ। রিপাবলিকান দলের দক্ষিণপন্থী রাজনীতি তথা অর্থনীতির প্রতি জনসমর্থনের বৃদ্ধির কোনো প্রমাণ এতে পাওয়া যায় না। তা যদি না হবে, তবে কংগ্রেসের সদস্যদের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সাফল্য অত ছোটো আকারের হবে কেন? সত্যিই, সেনেটে রিপাবলিকানদের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকলেও, বিশেষ বাড়ে নি, এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে তাঁরা আগেও সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন, এখনও তাই।

কিন্তু একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার থাকা দরকার। কংগ্রেসের নির্বাচনে বহুবিধ প্রশ্নের অবতারণা হয়, তার মধ্যে অনেক প্রশ্নই একান্তভাবে স্থানীয়। দ্বিতীয়ত, ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য, কিংবা রিপাবলিকান দলের সদস্য, সারা দেশে যাঁরা ছড়িয়ে আছেন, দলীয় লেবেল দেখে তাঁদের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক মতবাদ বোঝা কঠিন। কে কতদূর রক্ষণশীল, কে কতদূর লিবারেল—তা নির্ধারণ করা যায় না, তার দলগত পরিচয় থেকে। কাজেই কংগ্রেসের নির্বাচন দেশের জনসাধারণের মনোভাবের খুব নির্ভরযোগ্য সূচক নয়। অপরপক্ষে, প্রেসিডেনট-নির্বাচনে বিবেচিতব্য বিষয়গুলি থাকে অনেক পরিষ্কার। কে প্রেসিডেনট হলেন, কী পরিমাণ ভোটে জিতলেন, এটা দেখলে আঁচ করা যায় মারকিন ভোটদাতারা দেশের জন্যে কোন্ নীতি, কোন্ পন্থা চান।

এ বিষয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক যে আমেরিকা আগামী চার বছরের জন্যেও প্রেসিডেনট রেগানের পন্থাই ভালো মনে করেছে। কেন করেছে—তা নিয়ে অনেক বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে, আমরাও আগের বার খানিকটা তার আলোচনা করেছি। একটা সিদ্ধান্ত তা থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে: সমাজতন্ত্র এদেশে আমাদের চোখে যেমন উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে, বিশ্বের সর্বত্র তা নয়। আমেরিকার কথা তো বলাই বাহুল্য। বস্তুত সে দেশে

কোনো বড়ো রাজনৈতিক দলই সমাজতন্ত্রকে তার নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নি। অনাগত দেখা যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এগোতে তো পারছেই না, বরং পিছু হঠছে।

ইউরোপে সমাজতন্ত্রের এখন কী অবস্থা? স্পেন এবং গ্রীসের পর, ১৯৮১ সালে ফ্রান্সে যখন ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ-র নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্রী দল ক্ষমতায় এল, মনে হল ইউরোপে সমাজতন্ত্র আবার ফিরে আসছে। এখনও প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ফরাসী সমাজতন্ত্রী দল এখনও সেদেশ শাসন করছে, কিন্তু সমাজতন্ত্র তার বোলচাল অনেকটাই বদলে ফেলেছে। বাধ্য হয়েই বদলেছে, নইলে সংকট অনিবার্য হয়ে উঠছিল। নতুন শিল্পমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদকে বিশেষ আমল দিচ্ছেন না। সমাজতান্ত্রিক সরকারের এই নতুন নীতির ফলে মধ্য-দক্ষিণপন্থী বিরোধী দল একটু বিপদে পড়ে গিয়েছে, কেন না, তাদের নীতির সঙ্গে সরকারি নীতির পার্থক্য এখন খালি চোখে নজরে পড়া মুশকিল।

ইতালিতেও সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্রমশই আদর্শবাদী সংকীর্ণতার পথ থেকে সরে এসে অভিজ্ঞতাসম্মত পথে চলবার চেষ্টা করছেন। ব্রিটেনের অবস্থা তো সকলেরই জানা। রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী থ্যাচারের আসন কখনো-সখনো যদি বা একটু টলমল করে ওঠে, আবার দেখা যায় তিনি আরো মজবুত হয়ে বসেছেন।

আফ্রিকাতে মাদাগাস্কারে, মোজাম্বিকে, একদা রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সোমালিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পন্থা এখন হয় পরিবর্তিত নয়তো পরিবর্জিত। সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট সিয়াদ বারে মোনাডিশুতে সাংবাদিকদের বলেছেন, আমাদের অর্থনীতি এখনও সমাজতান্ত্রিক, আমরা স্বাধীন ব্যাবসাকে উৎসাহ দিচ্ছি। আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে পুঁজি বিনিয়োগ আমরা সর্বান্তঃকরণে আমন্ত্রণ করছি।" অথচ এই প্রেসিডেন্ট বারে-ই একদা সোমালিয়াকে সোভিয়েত শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পশ্চিম আফ্রিকায় গিনির প্রেসিডেন্ট সেকু টুরে মৃত্যুর আগে তাঁর দেশকে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার অভিমুখে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীরা সেই পথেই এগোচ্ছেন।

আর চীনের সরকারি মুখপত্র সম্প্রতি মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে, তাতে তো পরিষ্কার, সমাজতন্ত্রের প্রচলিত সিদ্ধান্ত নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন তাঁরাও অনুভব করছেন গভীরভাবে।

এসব থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে সমাজতন্ত্র অবলুপ্তির পথে। হয়তো দেখা যাবে, এখনকার পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা আবার নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দেবে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

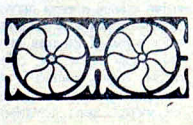

সংগীত

গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ

কিছুকাল আগে প্রয়াত হলেন একালের বিখ্যাত গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ। বছর চল্লিশ হল তিনি গান লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সংগীতসমাজ থেকে তাঁর স্মৃতি একরকম মুছেই গিয়েছিল। অথচ তিরিশের দশকে তিনি ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ গীতিকার, যাঁর রচিত গান খুব নামকরা গায়ক গায়িকা ছাড়া আর কাউকে গাইতে দেওয়া হত না। আমি গ্রামোফোন কোম্পানির হেমচন্দ্র সোমকে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখেছি এবং সুবোধবাবুর গান তিনি সাধারণ আর্টিস্টদের দিতে চাইতেন না।

সুবোধ পুরকায়স্থকে আমি প্রথম দেখি নলিন সরকার স্ট্রীটের গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে। এখানে গায়কগায়িকারা তাঁদের গান রিহার্সাল দিতে আসতেন। তখন যুদ্ধ চলছে; কলকাতা বোধকরি নিষ্প্রদীপ, চারিদিকে মিলিটারি কর্মব্যস্ততা। আমি মাঝে-মাঝে কৌতূহলবশেই এই আপিসে আসতুম, মনের কোণে একটা ক্ষীণ ইচ্ছা ছিল গীতিকার এবং সুরকার হবার, যদিচ সেটা খুব অল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হয়।

একদিন প্রচণ্ড গরমে দুপুরবেলা দেখলুম একটি ছোটোখাটো মানুষ আপিস-ঘরে এসে হেম সোম আছেন কিনা জানতে চাইলেন। তিনি ছিলেন না, সুবোধবাবুও চলে যাচ্ছিলেন,—এমন সময় একটি লোক তাঁকে ডেকে বললেন, "কাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় নি আপনার? শুনেছেন তো কাজী সাহেবের খবর?" সুবোধবাবু ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, "হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। আমাকে তিনি আদর করে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারলেন পিঠে আরকী যেন আপনার মনে বলে গেলেন। লক্ষণ ভালো মনে হল না।" অর্থাৎ, কাজী নজরুল ইসলামের সেই সময়ে মস্তিষ্কবিকৃতি হতে আরম্ভ হয়েছে। সুবোধবাবু বেরিয়ে গেলেন। তখনই আমি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলুম। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে অঙ্গশ্র পুস্তিকা বেরুত, সেগুলিতে সব গান প্রকাশিত হত। সেগুলি আমি যত্ন করে পড়তুম। অনেকেই লিখতেন কিন্তু সুবোধবাবুর মতো এত মর্মস্পর্শী লেখা আর কারুর রচনায় পাই নি। ইনিই সেই সুযোধ পুরকায়স্থ! তখন আলাপ হয় নি, কিন্তু আলাপ হল তার বছর বছর পরে যখন তিনি বন্ধু এবং গানের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর বহু গান জমা রয়ে গেছে, ছাপানো সম্বন্ধে যে খুব আগ্রহী ছিলেন এমন নয়, তবে ছাপা হলে খুশি হতেন নিশ্চয়। কিন্তু, তা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। আরও অনেক গীতিকারেরই রচনাগুলি ছেপে বেরোয় নি? একমাত্র অজয় ভট্টাচার্যের গানের একটি বই বেরিয়েছে কয়েক বৎসর আগে। অজয়বাবুও সুবোধবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিচিতি এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু সুবোধ পুরকায়স্থ রোমান্টিক কবি হিসাবে অপেক্ষাকৃত গভীরতর ছিলেন বলেই আমার ধারণা। বলতে গেলে ওরিজিনালিটিতে ছিল তাঁর একটি একক স্থান, কেননা এত অল্প কথায় এত মর্মমি প্রকাশ আর কারুর রচনাতেই দেখা যেত বলে আমার মনে হয় না। সুবোধবাবু যখন গীতিকার হিসাবে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাদৃত, তখনই তাঁর বিরোধ ঘটল গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে; তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন এবং আর কোনোদিন সংগীতজগতের সঙ্গে সম্পর্কটুকু রাখেন নি। তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংগীত-সাহিত্য ততোধিক বঞ্চিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম সাহিত্যিক আরও আছেন যাঁরা নীরবে আত্মগোপন করেছেন সাধারণ অথ্যাত জীবনে, এবং তাঁদের অনন্যসাধারণ রচনা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে।

সুবোধ পুরকায়স্থ, হিমাংশুকুমার দত্ত, শচীন দেববর্মণ, অজয় ভট্টাচার্য,—এঁরা ছিলেন তৎকালীন কুমিল্লার একটি গ্রুপ, যাঁরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠা বহু পূর্বেই অর্জন করেছিলেন। ক্রমে ওঁরা সকলেই কলকাতা তথা বাঙলায় বিপুল খ্যাতি ও গৌরব লাভ করেন।

হিমাংশুকুমার দত্ত প্রধানত দুজন কবির রচনায় সুর দিতেন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে, তাঁরা হচ্ছেন সুবোধ পুরকায়স্থ এবং অজয় ভট্টাচার্য। এঁদের রচিত বহু গান হিমাংশুবাবুর আরোপিত অপূর্ব সুরে রূপায়িত হয়েছে কেবল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে। হিমাংশুকুমার অত্যন্ত ভাবপ্রবণ সুরকার ছিলেন; সবাইকার গান তিনি প্রোফেশনাল হয়েও গ্রহণ করেন নি, যাঁদের করেছেন, তাঁদের রচনাকে কাব্যসংগীতের অসাধারণ শৈলী প্রয়োগে স্মরণীয় করে রেখে গেছেন। শচীন দেববর্মণ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে, তিনিও নির্বাচন সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুতে ছিলেন। এঁরা আসলে ছিলেন একটি ইনটেলেকচুয়েল জুটি যাঁরা গানের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেন নি। আজকের দিনের সঙ্গে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কনট্রাস্ট। এখন যাঁরা গীতিকার বলে পরিচিত তাঁরা সাহিত্যিক স্বীকৃতিলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে; তবে এই পরিচিতি হয়তো ইতিহাস অস্বীকার করবে না, তথাপি সাহিত্য বলতে যে স্টানডার্ড বোঝায় সেখানে তাঁদের প্রবেশ ঘটলে সাহিত্যেরই দুর্দিন বলতে হবে। কিন্তু সুবোধবাবুরা সেই ধরনের গীতিকার ছিলেন না, যথার্থ গীতিসাহিত্যে তাঁদের স্থান কিছুতেই অস্বীকৃত হতে পারে না।

কাজী নজরুল ইসলামের মতন প্রতিভাও বাবসায়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেন নি; ফলে তাঁর অনেক লেখাই প্রকৃত গীতিসাহিত্যের বাইরে থেকে গেছে, একথা তাঁর মতন ভালো আর কেউ উপলব্ধি করেন নি। হিমাংশুকুমার যাঁদের গান নির্বাচন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা কম কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই প্রকৃত সাহিত্যগুণ থেকে গেছে। এই কারণে এঁরা যে ইনটিগ্রিটিকে অধিকার করেছিলেন সেটা গড়পড়তা গীতিকারদের কোনোদিনই সাধ্যায়ত্ত হয় নি। এমনকি শচীন দেববর্মণ বোমবেতে অর্থোপার্জনের জন্য বহু অপাঙ্‌ক্তেয় হিন্দী ফিলমের গানে সুর দিলেও যখনই বাঙলা গান রেকর্ড করেছেন তখনই কমপোজিশনের এক-একটি বিশেষ ধারা নির্দেশ করে গেছেন। বাঙলা গানের ক্ষেত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত একজন ইনটেলেকচুয়েল শিল্পী হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে গেছেন। হিমাংশুকুমারের সুরও বহু রেকর্ড, স্বরলিপিতে রয়ে গেছে, কিন্তু সুবোধবাবুর গীতাবলী বা সেগুলির কোনও স্বরলিপি পুস্তিকা করে ছেপে বেরোয় নি। এটা সংগীতজগতের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। পরিশেষে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করে এই লেখা শেষ করি। গানটি গ্রামোফোনে রেকর্ড করেছিলেন কনক দাশ। একদা এটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। কবির পুত্র শ্রীমান শ্যামল পুরকায়স্থ এখনও হিমাংশুকুমার দত্ত মহাশয়ের লিখিত তাঁর সুরের স্বরলিপিটি রক্ষা করেছেন।

নিঝুম রাতের চাঁদের আলো
গজরিয়া ফিরে ফিরে
মোর সুরে আজ সুর মিলালো।
তন্দ্রালাগা শিউলিতলে
গানটিরে মোর নিয়ে চলে
কয় সে ধীরে শেফালি গো
মোর গানে আজ গন্ধ ঢালো।

আজ নিদ্রাহারা হিয়ার মাঝে
রয়ে রয়ে না-শোনা কোন
বেদনাবিধুর বাঁশি বাজে।
পূর্ণিমা চাঁদ আমার গানে
সেই ব্যথা আজ বয়ে আনে
দুলিয়ে সে দেয় বুকের তলে
চাউনিটি তার গভীর কালো।

রাজেশ্বর মিত্র

নাটক

একটি মানুষ যাঁর দুটি মাতৃভাষা

তিরিশের দশকের শেষ দিকে ইন্দুবালা একটি ওড়িয়া গানের রেকর্ড করেছিলেন :

আউ ন মিবি যমুনা
বাট-যোগী ঘাট মাগে
নন্দসুত কহ্না।

বোধহয় এটাই ইন্দুবালার একটিমাত্র ওড়িয়া গানের রেকর্ড।

এই গানটির রচয়িতা কে, সরকার কে? নামটা খুব একটা জানবার কথা নয় পাঠকদের। যদি বলি, নামটা হচ্ছে কার্তিককুমার ঘোষ, তাহলে দুটো প্রতিক্রিয়া হবে। একদল বলবেন, এ নাম শুনি নি কোনো দিন। আর-একদল বিস্মিত হয়ে বলবেন, বাঙালি!

দুটি প্রতিক্রিয়ার উত্তরে বলি, হ্যাঁ বাঙালি ; আর এ নাম বাঙালির বিশেষ শোনবার কথাও নয়। কার্তিককুমারের আদি বাড়ি বর্ধমান, কিন্তু তিনি সারাটা জীবন কাটিয়েছেন কটকে। বাঙলা আর ওড়িয়া—দুটোই তাঁর মাতৃভাষা। একটি পেয়েছেন জন্মসূত্রে, অন্যটি কর্মসূত্রে। কী কাজ তাঁর? বলা যায়, কী নয়! ইন্দুবালার গানের প্রসঙ্গে একটা পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তিনি গীতিকার আর সরকার। এ ছাড়াও তিনি নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, নৃত্যশিক্ষক ইত্যাদি। এখন একাশি বছর বয়সেও তিনি সক্ষম, সক্ষম, সক্রিয়। কয়েক মাস আগে কার্তিকবাবু কয়েক দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ আ্যান্ড ড্রামা ডিভিসনে একটি নাটক দিলেন। আর কলকাতা দূরদর্শনে দিলেন একটি ইনটারভিউ। তখন কয়েক দিন কার্তিকবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। তাঁর পরিচয়টা বাঙালিদের কাছে উপস্থিত করবার জন্যেই এই লেখা।

কার্তিককুমারের জন্ম ১৯০৩ সালে। কটকে তাঁদের পরিবারের বাস তাঁর দাদামশাইয়ের আমল থেকে। দাদামশাই গৌরীশংকর রায় কটকে কর্মবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 'উৎকলদীপিকা' উড়িষ্যার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র, তিনিই বার করেন। কটকে তাঁর নামে একটি পারক আছে।

গৌরীশংকরের ছোটো ভাই রামশংকর রায় 'কাণ্ডীকাবেরী' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন ১৮৮০ সালে। এর আগে ওড়িয়া ভাষায় আর-একটি নাটক রচিত হয়েছে। জগমোহন লালার 'বাবাজী' (১৮৭৭)। সময়ের দিক থেকে তিন বছর পরে হলেও, 'কাণ্ডীকাবেরী'-র নাট্যরচনা-কৌশল 'বাবাজী'র থেকে ভালো, এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

কার্তিককুমারের দাদা অশ্বিনীকুমার ঘোষ আগে কলকাতায় শিক্ষকতা করতেন। পরে কটকে যান এবং সেখানে প্যারীমোহন অ্যাকাডেমির হেডমাস্টার হন। তিনিও ছিলেন নাট্য-উৎসাহী। তিনি ওড়িয়া ভাষায় প্রায় পঞ্চাশখানি নাটক রচনা করেছিলেন। শুধু নাট্যরচনাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। কটকের এক থিয়েটারের মালিকের হঠাৎ মৃত্যু হলে সেই থিয়েটারটি অশ্বিনীবাবু নিয়ে নেন এবং চালাতে থাকেন। কিন্তু থিয়েটার-ব্যাবসা পরিচালনায় তিনি খুব দক্ষ ছিলেন না। ফলে ক্রমেই ধার বাড়তে থাকে। অবশেষে বসতবাড়িও বিক্রি হয়ে যায়।

এই নাট্য-আবহাওয়ার পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই কার্তিককুমার বড়ো হয়েছিলেন। পরিবারের প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতিও আবার এই থিয়েটারের কারণে। একদিকে থিয়েটার-প্রীতি, অন্যদিকে ক্ষতির ভয়—দুটোই তাঁর ছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি থিয়েটারকে নিজে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ছেলেদের এই লাইনে আসতে দেন নি।

যাই হোক, ছাত্র-অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় একবার হাজত ঘুরেও এলেন। আবার ওই অসহযোগের বছরেই, ১৯২১-এ, ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ১৯২৫-এ বিয়েও হয়ে যায়।

পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় যখন চরমে পৌঁছল, তখন কলকাতায় এলেন জীবিকার খোঁজে। মেগাফোন কোম্পানির মালিক জিতেন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ওড়িয়া গান রচনা আর সুর দেওয়ার কিছু কাজ করেন। পরে এইচ. এম. ভি.-র কিছু কাজও করেন। কিন্তু সর্বদাই মন টানছিল কটক—কটকের থিয়েটার।

সুতরাং একদিন আবার ফিরলেন কটকে। আবার থিয়েটার শুরু করলেন। নাট্যকার, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা তিনি নিজে। গান রচনা করেন, গানে সুরও দেন, কিন্তু নৃত্য? অশিক্ষিতপটুত্ব কিছুটা ছিল, তাই দিয়েই কাজ চলছিল। কিন্তু তেমন ভালোভাবে নয়। তখন চলে গেলেন আলমোড়ায়। উদয়শংকরের কাছে কিছু দিন নৃত্যের তালিম নিয়ে এলেন।

ওড়িয়া থিয়েটারে আগে মেরেরা অভিনয় করত না, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করত ছেলেরাই। তিনিই প্রথম মেয়েদের নামান মঞ্চে। তবে খুবই দরিদ্র কিন্তু ভদ্র পরিবারের মেয়ে তারা। অনেকে নানা কারণে নিপীড়িত, স্বামী-পরিত্যক্তা কেউ-কেউ।

থিয়েটারের দল নিয়ে মাঝে-মাঝে সফরে বেরোতেন। তাতেও কিছুটা রোজগারের সুরাহা হত। এইভাবেই চলছিল। এই সময় কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির সঙ্গে মিলে তিনি একটি চিত্রপ্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেন। সংস্থার নাম—রূপভারতী। 'শ্রীজগন্নাথ' নামে একটি ছবি তাঁরা প্রযোজনা করেন। নানা কারণে এই চলচ্চিত্র-সংস্থার আয়ু দীর্ঘ হয় নি।

বয়স চল্লিশ পেরোল। সংসার বেড়েছে। খরচ বেড়েছে। থিয়েটারেও নাটকের অভাব। তখন নাটক লেখায় বিশেষ মন দিলেন। তাতে থিয়েটারের উপকার। নিজের কিছু আয়ও হয়। রেকর্ড কোম্পানির কাজে যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন অল্প কিছু দিনের জন্যে স্টার থিয়েটারে অপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় জলধর চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাটক ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তারপর নাটক অনুবাদ বা রচনায় নিয়মিত হাত দেন নি। এখন সেটি দিলেন। এর পর থেকে তাঁর কলম আর থামে নি। বর্তমানে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা—তিরিশ। রেকর্ডের জন্যে লিখেছেন হালকা নকশা। যাত্রার জন্যে লিখেছেন চারটি পালা। বেতার-নাটকের সংখ্যা—বারো। দূরদর্শনের জন্যে হাসির নাটক লিখেছেন—চারটি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ আ্যান্ড ড্রামা ডিভিসনের জন্যে লিখে দিয়েছেন তিনটি নাটক। মৃণাল সেনকে 'মাটির মানিষ' ছবির সংলাপ রচনায় সাহায্য করেছেন। এবং এই ছবিতে ছোট একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'লক্ষহীরা' নাটকটি। এটি ১৯৫৫ সালে লিখিত, ১৯৫৬ সালে প্রযোজিত। তখন থেকে আজও এ বইটির নিয়মিত অভিনয় হয়। অর্থাৎ একনাগাড়ে প্রায় আটাশ বছর চলেছে এ নাটকটি।

নাটক ছাড়া অন্য ধরনের বইও তিনি রচনা করেছেন। ডিটেকটিভ গল্পের বই আছে দুটি। অভিনয়শিক্ষার উপর একটি বই লিখেছেন। ওড়িয়া চলচ্চিত্রের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস তাঁরই লেখা। 'ওড়িয়া রঙ্গমঞ্চ ও মোর নটজীবন' বইতে পাওয়া যায় মঞ্চ-ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে তাঁর কাজের বিবরণ। এখন তিনি একটি আত্মজীবনী রচনায় হাত দিয়েছেন। অনেকখানি লেখাও হয়ে গিয়েছে।

কার্তিককুমার স্বীকার করেন যে, বাঙলা থিয়েটার থেকে ওড়িয়া নাট্যজগৎ অনেক উপকার পেয়েছে। কিন্তু ওড়িয়ায় যাত্রা ইত্যাদির একটি লোকনাট্যপ্রবাহ থাকায় তাঁদের কাজ করতে সুবিধে হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যেও সহজে সাড়া পাওয়া যায়। বাঙলা থিয়েটারের মঞ্চকৌশল অনেক বেশি, কিন্তু ওড়িয়ার দর্শকসমাজ বিনা কৌশলেই বেশ ভালো সাড়া দেয়। তবে তাঁর খেদ, ওড়িয়ায় নিয়মিত মঞ্চের সংখ্যা কমে গেছে। তার কারণ, তাঁর মতে, ওড়িয়া থিয়েটার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারে নি। নতুন গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব হয়েছে। তবে তাদের শক্তি আর প্রভাব খুব বেশি নয়।

এখন কার্তিককুমার মঞ্চে নামেন না। তবে শেখান, পরামর্শ দেন। অবশ্য শারীরিক দিক থেকে তিনি একাশি বছর বয়সেরও প্রায় যুবকের মতো। খুব সক্ষম। এখনও গাইতে পারেন, যদিও গলায় সুর একটু কমেছে। কিন্তু অভিনয়ের কণ্ঠ এখনো চমৎকার। নানা রকমের অভিনয় করতে পারেন।

নিরভিমান, বিনয়ী মানুষ কার্তিককুমার। সারা জীবন থিয়েটার করে কী পুরস্কার পেলেন? এর জবাবে নানা সম্মাননের কথা বলেন তিনি। কিন্তু শেষে বলেন, "প্রভুর আনন্দ পেয়েছি কাজ করে। এর থেকে বড়ো পুরস্কার আর কী পাব?"

"তাহলে ছেলেদের এ লাইনে দিলেন না কেন?"

"ওরা কষ্ট পেত। এ লাইনে খুব কষ্টও আছে তো। আমি আনন্দ পেতাম। আজও পাই। এইটা না পেলে শুধু কষ্ট নিয়ে কি ওদের চলত? যে যার লাইন খুঁজে নেওয়াই তো ভালো। দারিদ্রোর কষ্ট বড়ো বেশি রকমের কষ্ট। এটা সওয়া খুব শক্ত।"

"বাঙলার জন্যে মন কেমন করে না?"

"বিশেষ না। আমি তো ওড়িয়াই।" হেসে বললেন। "তবে বাঙলার সঙ্গে যোগ থাকলে ভালো লাগে, সুবিধেও হয়। এখন তো যোগ একটু বেড়েছে। আমার ছেলে কলকাতায় চাকরি করে।

মাঝে-মাঝে আসি। তবে বয়স তো বাড়ছে। কতদিন আর আসতে পারব জানি না।'

কার্তিককুমার ফিরে গেছেন কটকে। লিখছেন আত্মজীবনী, অবশ্য ওড়িয়ায়। তিনি বাঙালি কিন্তু ওড়িয়া তো তাঁর মাতৃভাষা।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

চিত্রকলা

কৃষ্ণ রেড্ডির ছাপাই ছবি

'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মরজি নিয়ে'—এ কথাটার প্রমাণ রেখেছেন শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডি তাঁর রেট্রোসপেকটিভ ছবির প্রদর্শনীতে। বিড়লা আকাদেমির পাঁচতলায় প্রদর্শনীকক্ষের দেওয়ালে আঁটা শিল্পীর তৈরি পঞ্চাশটা ছবি। একতলায় তাঁর নিজের কয়েকটা সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। একগোছা পাকাচুলে বয়স্ক অভিজ্ঞ চেহারা, পুরু লেনসের চশমার ভিতরে অভিজাত বিদগ্ধ চোখ। প্রবীণদের মধ্যে তিনি প্রবীণ। তা সত্ত্বেও এক আলাদা জাতের নবীন মরজি নিয়েই প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ নিয়মিত অক্লান্ত উৎসাহে মুদ্রণরীতির ছবির চর্চা করে চলেছেন, এবং নানা-ভাবে তাকে উন্নত করছেন।

শিল্পী দীর্ঘদিন প্যারিস-প্রবাসী। প্রখ্যাত ব্রিটিশ গ্রাফিক আর্টিস্ট উইলিয়াম হেটর-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র। সুতরাং এমন একজন বিশিষ্ট শিক্ষা-গুরুর সাহচর্য, শিক্ষা আর আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে রেড্ডির। 'গ্রাফিক আর্ট'-রীতির প্রায় সমস্ত উত্তরাধিকার-ই বর্তে গেছে তাঁর উপর। তাই এই ছাপাই ছবির জগৎই হয়ে উঠেছে তার নিত্য-নতুন একসপেরিমেনটের ল্যাবরেটরি, তাঁর সারা জীবনের শিল্পসাধনার একমাত্র অবলম্বন।

ছবি তৈরির দুরূহ টেকনিক আর প্রলম্বিত প্রবাসযাপনের জন্যই শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডি খুব একটা চেনা মানুষ নন। এমনকি ছবিজগতের অন্যান্য কৃতীরাও তাঁকে দূর থেকে সমীহ করেন। এই কারণে আমাদের অনেকেরই জানা নেই, শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডির সামর্থ্য কত দূর। আমরা অনেকেই জানি না যে আমাদের শিল্পী 'আতালিয়ের সেবেন্তিন'-এর একজন কারিগর, বা, পৃথিবীর মাত্র সাতজন গ্রাফিক আর্টিস্ট-এর কাজ সম্বল করে প্রেসিডেনট কার্টারের উৎসাহে যে বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সাতজনের একজন ছিলেন কৃষ্ণ রেড্ডি। অবশ্য তাঁকে তাঁর মর্যাদার পুরস্কার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন আগে দিয়েছেন। কিন্তু সেই গৌরবের খবরও উল্লেখমাত্র চাপা পড়ে গেছে। তবে 'গ্রাফিক আর্ট'কে সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করে দেওয়া আর তাকে লোকপ্রিয় করে তোলায় কৃষ্ণ রেড্ডির যে ভূমিকা, শিল্পীমহলের প্রখ্যাত দিকপালরাও তা স্মরণ করতে গর্ব অনুভব করেন।

সরাসরি ক্যানভাসের ওপর পেনসিল বা রঙ-তুলি বুলিয়ে খেলা করেন না শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডি। বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম-ভোঁতা-ধারালো-তীক্ষ্ম যন্ত্রপাতিই তাঁর ছবি-তৈরির সরনজাম। তামা বা দস্তার চৌকো পাতের উপর এই-সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে ভাস্কর্যের মতো খোদাই করে, তাতে রঙ ঢেলে ঝলমলে ছাপ তুলে নেন ক্যানভাসে। তাঁর ছবিগুলির কনটেনট দামি বটে, কিন্তু আরও বেশি সপ্রতিভ ফরমের নিত্যনতুন বৈচিত্র্য। স্কেল-কাটা-কম্পাস-ড্রিল ব্যবহার করে ছবিকে যত অ্যাকুরেট যত পরিপাটি করা যায়, যত সঠিক মাপজোখ বা জ্যামিতিক প্রোপোরশন বজায় রাখা যায় সেদিকেই শিল্পীর যত্ন সতর্ক। গ্রাফিক টেকনিকের জন্য যে গণিত আর জ্যামিতি অপরিহার্য, তা প্রমাণ করেছেন স্বয়ং তিনিই। একই সরলরেখা বা বৃত্তচাপের বিচিত্র প্রয়োগ তাঁর প্রতিটি স্বতন্ত্র ছবিতে স্বতন্ত্র অর্থে অর্থবহ হয়ে ওঠে। গণিত আর জ্যামিতির পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানকেও তাঁর ছবি-তৈরির সহায়ক উপাদান করে নিয়েছেন শিল্পী। 'লাইফ মুভমেনট' ছবিতে পদার্থবিদ্যার 'আলো'র অধ্যায়ের প্রতি-ফলন-প্রতিসরণ-সূত্র শিল্পীর মগ্ন-চৈতন্যে সক্রিয় হয়েছে মনে হয়। 'রাইম ব্রোকেন'-এ শব্দতরঙ্গের ঘনীভূত এবং অনুভূত ব্যবধান লাইন ড্রয়িং-এর সাহায্যে দেখিয়েছেন শিল্পী। জীবদেহের কোষ এবং তাদের বিভাজন-পদ্ধতি, জগতে জীবের জন্ম—তাঁর ছবির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। 'টু ফরমস ইন ওয়ান' ছবিতে তুরস্কের গিরজা আঁকতে গিয়ে বা, প্যাসটোরাল, ওয়াটার-লিলি, রিভার, সানসেট, ওয়েভ—এ-সমস্ত ছবিতেই ছোটো-বড়ো-মাঝারি নানা আকারের নানা আয়তনের অগণিত কোষের মতো দেখতে অজস্র রঙে রঙিন অরগ্যানিক স্ট্রাকচার চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এদের কিছু-কিছু দানার মাপ বেশ বড়ো, তুলিতে আঁকা সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশই এত ছোটো যে ছাপাই ছাড়া তাদের অভিপ্রেত চেহারাটি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা একরকম প্রায় অসম্ভবই ছিল। 'ইনসেকট', 'মেটারনিটি' উওম্যান অ্যানড পার্টিং সন'—এ-সমস্ত ছবিও খুব সূক্ষ্ম রেখায় স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে—গ্রাফিক 'ইনতাগলিও' প্রথার মাধ্যমেই। কিছু-কিছু ব্যক্তিগত দর্শনও ছবিগুলোর অভিধা থেকে ফুটে বেরোয়। 'দ্য প্রেয়িং উওম্যান' আর 'উওম্যান অ্যান্ড পার্টিং সন'-এ, 'রেডিয়েটিং ফ্লাওয়ার্স' বা 'লাইফ মুভমেনট'-এ মানুষের জঙ্গম জীবনের তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতার প্রতীকী ইঙ্গিত থাকে, থাকে স্পেস, টাইম এবং একজিসটেনস-এর ব্যঞ্জনা। সূক্ষ্মতম রেখার সাহায্যে রঙবেরঙের টেকসচার-চাতুরী দিয়ে শিল্পী তাঁর ছবিকে ডিন্যামিক করে তোলেন। অর-গ্যানিক স্ট্রাকচারের অজস্র সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম দানা দিয়ে যে 'ওয়েভ' আঁকেন তার ভিতরে জমা থাকে 'কাইনেটিক এনারজি'র প্রাচুর্য। ফলে তা দর্শকের পায়ের তলায় সজোরে ঢেউ-এর বাড়ি মারে। 'আপু স্পেস' বা 'আপু ক্ললিং'-এ অপটিমাম দূরত্ব থেকে বস্তুর ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার এফেক্টটিকে আলো আর অপটিক্যাল লেনসের সাহায্যে দেখিয়েছেন শিল্পী। সারকাস সিরিজের ছবিগুলির বেশ কটি 'পেন ড্রয়িং' একটানে আঁকা। ক্লাউন, ট্র্যাপিজ, জাগলার—প্রতিটিতেই একাধিক বর্ণযোজনা, আলো-ছায়ার খেলা, অন্ধকার জায়গায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি, স্রোতের মতো গড়ানো তীব্র রঙ। প্রতিটি ছবিই সরাসরি বিমূর্ত বা নানারকম টেকসচারে মজাদার। রেড্ডির ছাপাই রীতির ছবিতে আসলে এই অজচ্ছল রঙের বড়ো আকর্ষণ। কারণ তাঁর মতো একজন পেশাদার শিল্পী জানেন যে, ছবিতে কারিগরি দুর্বোধ্যতা বজায় রেখেও কি-ভাবে জাঁকজমক দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করতে হয়।

বর্ণালী দাস

'কলেজ অব ভিসুয়াল আর্টস'-এর ছবির মেলা

গুরু যদি সহায় হন তাহলে শিষ্যের সিদ্ধি অনায়াসেই আসে। পারক হোটেলের সামনে খোলামেলা 'আপীজে' পারকে শিল্পী শুভাপ্রসন্নর 'কলেজ অব্ ভিসুয়াল আর্টস'-এর প্রায় পঞ্চাশ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর আঁকা শ তিনেক ছবির একটা মেলা হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসের বাইশ তারিখে মারকিন শিল্পী পল লিংগ্রেন মেলাটির উদ্বোধন করেছিলেন। আরও বিস্ময়ের আর আনন্দের ব্যাপার এই যে, এইরকম একটা শিল্পকৃপণ দেশে, যেখানে যামিনী রায় বা নন্দলাল বসুর ছবিতে-ও ক্রেতার অভাবে ধুলো জমতে থাকে, সেই দেশেরই কিছু শিল্পপিপাসু দর্শক এই-সমস্ত নবীন উদীয়মান শিল্পীদের শিল্পকৃতি কিনে নিয়ে গেছেন।

জলরঙে, তেলরঙে, পোস্টার কালারে বা কালিতে ছোটোরা প্রধানত এঁকেছে নিসর্গদৃশ্য, আর বড়োরা এঁকেছে কিছু কিছু ক্রিয়েটিভ। এ কলেজ থেকে প্রতিবছর ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে বেড়াতে যাওয়া হয়। তাই রাজস্থান, খাজুরাহোর মন্দিরভাস্কর্য, কালিম্পং-এর কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতশোভা যা এঁরা দেখে এসেছেন, সে-সমস্ত দৃশ্য অনেকেরই ছবির সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হল, এঁদের মধ্যে সেরা রঙ লাগানোর কায়দাটা রপ্ত করেছেন মোহনলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর আঁকা 'রেনি সিজন' বা 'কালিম্পং' ছবিতে জলরঙের পরিচ্ছন্ন কাজ। একই সঙ্গে অনেকগুলো রঙে তুলি না ডুবিয়ে একটা বিশেষ রঙেরই গাঢ়, ফিকে, মাঝারি— তিনরকম কমপোজিশন তাঁর ছবিগুলোকে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে রেখেছে। রথীন্দ্রনাথ রায় আর গৌতম করের ছবিতে সাধারণ বিষয়বস্তু হল নাগরিকতা। রথীন্দ্রনাথ রায় কলকাতা শহরের (সম্ভবত উত্তর কলকাতার) খুব সাদামাটা বাড়ির স্থাপত্যকে আপাদমস্তক ভালো করে পাঠ করে দরজা-জানলা-সিঁড়ি-রেলিঙের সামগ্রিক কমপোজিশন তৈরি করেছেন। গথিক স্ট্রাকচারের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তবে তাঁর ছবিতে বিবৃতি বড়ো বেশি। শিল্পীর জীবনবোধেরও একটু প্রতি-ফলন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। বরঞ্চ অবজেকটকে প্রাধান্য দিয়েও নিজস্ব চেতনাকে প্রবাহিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন গৌতম কর। যন্ত্রযুগে যান্ত্রিকভাবে দিনযাপন করতে-করতেই বোধ হয় ভাঙাচোরা গাড়ির অনুষঙ্গে তাঁর কল্পনা নাড়া খেয়েছে। তবে তাঁর বিপন্নতা আর যন্ত্রণাবোধের অভি-ব্যক্তির এই সদ্য সূত্রপাত। ভবিষ্যতে আমরা গৌতমের কাছে এর আরও পরিণত চেহারাকে প্রত্যাশা করব। সিদ্ধার্থ সেনগুপ্তের 'মেডিটেশন' নামের দুটো ছবি চোখকে বন্দী করে প্রধানত অপ্রচলিত রঙের ব্যবহারের জন্য। গতানুগতিক রঙের সঙ্গে আপোসের কোনো লক্ষণ তাঁর ছবিতে নেই। আগুন ধরনের বিরল বর্ণ নির্বাচনে তিনি যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন বলেই মনে হল। দীপক মণ্ডলের একজোড়া 'ককফাইট' দৃষ্টি-কে কেড়ে নিয়ে যায়। সাদা বোর্ডের

ওপর টকটকে লাল মোরগঝুঁটির এফেক্ট দূর থেকে চমৎকার। বিভিন্ন বিরোধী রঙের কমবিনেশন হিসেবে ছবি দুটোতে একধরনের ঝকঝকে সপ্রতিভতা আছে। যশপাল সিং এবং পুলক ঘোষ চিন্তায় আর কাজে বিশেষ সাবালকত্বের প্রমাণ রেখেছেন। 'কমপোজিশন' নামের যশপালের দুটো ছবিই তেলরঙে আঁকা। পেশীসমৃদ্ধ শ্রমজীবী মানুষদের গড়নে আদিমতা আনতে চেয়েছেন তিনি। খুব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সরু সুতোর মতো ঘন কালো রোমে আবৃত পুরুষদের প্রতীকের মাধ্যমে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। 'রিলাকট্যানট' ছবির মধ্যে কবিতার মেজাজের জন্য পুলক ঘোষকে অভিনন্দন। একজোড়া ক্রুশবিদ্ধ পা তাঁর ভিস্যুয়াল। মানুষটি কি যীশু? না জীবনানন্দ দাশের আত্মহন্তারক মানুষটি? তবে ছবির নামটা 'পিস' হল না কেন? তবে কি পুলক আউটসাইডারের মারসোর মরবিডিটি আমাদের স্মরণ করালেন? তেলরঙে আঁকা পুলকের 'রেমব্রাঁ'-র প্রতিকৃতি সুন্দর। ছিমছাম হয়েছে তামা দিয়ে করা 'মিউর‍্যাল'-এর কাজটি। এ ছাড়া মধুমঙ্গল বসুর 'বস্তী', পবিত্র সাহার 'মার্কেট', শ্যামলবরণ সাহার 'সাইলেনস', রূপা বসুর 'স্টীল লাইফ', দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মী চক', শুভ্রা গাঙ্গুলির 'ভিকটোরিয়া' (কালি) বেশ জোরালো আবেদন এনেছে। শিক্ষকরাও মেলা থেকে বাদ পড়েনি। শিপ্রা ভট্টাচার্যের 'পিপ্‌লস্‌' নামক চমৎকার ছবিটির পিঠে পিঠ দিয়ে থাকে শুভাপ্রসন্নর 'পাখি' আর 'র‍্যাপড' সিরিজের একটি করে ছবি। আর তারপরেই মেলার মাঠ থেকে বিদায় নেবার দরজা।

বর্ণালী দাস

বিশ্বসাহিত্য

বিশ্বসাহিত্যের আলোচনায় বিশ্বের যে-কোনো সাহিত্যের আলোচনা করা যাইতে পারে। আমি বাঙলা সাহিত্য লইয়া মাসের পর মাস লিখিয়া যাইতেছি। কোনো ইংরাজি বা ফরাসি পত্রিকায় যদি বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে সেই আলোচনায় বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখই বোধহয় থাকিত না। চীন বা জাপানের কোনো পত্রিকায়ও এইরূপ আলোচনায় বাঙলা সাহিত্যের বড়ো স্থান হইত না। বাঙলা সাহিত্য লইয়া বাঙালি না ভাবিলে আর কে ভাবিবে। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিয়াই বা কী ফল হইবে। আমি লিখিলাম বাঙলা সাহিত্য এক উত্তম সাহিত্য, আর আক্ষেপ করিলাম—আহা, এই উত্তম সাহিত্যের সংবাদ বিশ্বের কানে পৌঁছাইল না! ইহাতে লাভ কী হইবে। বরং বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে অন্য প্রশ্ন তুলিতে পারি। সারা বিশ্বের কয়জন বাঙলা সাহিত্য পড়িলেন, এই জিজ্ঞাসা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি—সারা বঙ্গদেশের কয়জন বাঙলা সাহিত্য পড়েন। শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৩৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে। আদমশুমারিতে যিনি লিটারেট বলিয়া গণ্য তিনি উক্ত ইংরাজি শব্দটির অর্থে সাহিত্যের সহিত কিঞ্চিদধিক পরিচিত, এমন কথা বলিতে পারি না। আদমশুমারিতে যিনি নাম সহি করিতে সক্ষম, তিনিই লিটারেট। অকসফোর্ড ডিকশনারিতে লিটারেট শব্দের দুইটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে :

(person) having some acquaintance with literature,

(person) able to read and write

শতকরা ৩৬ জন বাঙালি লিটারেটদের মধ্যে এই দুই অর্থের যে-কোনো একটি অর্থে লিটারেটের সংখ্যা দশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আবার যিনি লিখিতে-পড়িতে সক্ষম তিনি স্বভাবতই লিখিবেন এবং পড়িবেন, এমন ধরিয়া লইতে পারি না। যে দেশে বি.এ., এম.এ. পাস-করা মানুষ গ্রন্থ স্পর্শ করিবার সময় পান না, সেই দেশে যিনিই নাম সহি করিতে পারেন তিনিই মেঘনাদকাব্য খুলিয়া পড়িতেছেন, এমন হইতে পারে না।

কিন্তু আমাদের এই অভাগা দেশের নিরক্ষর মানুষও বড়ো কাব্যরসিক। তিনি পদাবলীকীর্তন শুনিয়া কাব্যরসে আপ্লুত হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনিয়া জানকীর দুঃখে কাঁদিয়া বক্ষ ভাসান। কাশীদাসের মহাভারত শুনিয়া অমৃতের আস্বাদ পান। রামপ্রসাদের 'চিনি হওয়া ভালো নয় রে মন/চিনি খেতে ভালোবাসি' গান শুনিয়া ভক্তিরসে সিক্ত হন। তিনি কাব্য পড়িতে পারেন না, কাব্যের রস তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম স্পর্শ করে। বলিতে পারি, কাব্যরস তাঁহার অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই অসংখ্য নিরক্ষর কাব্যরসিকের জন্য আমাদের আধুনিক লেখকগণ কয় লাইন লিখিয়াছেন? আর যদি বল—একালের সাহিত্য সুসভ্য সুশিক্ষিত সমাজের সাহিত্য, পড়িবার বস্তু, শুনিবার বস্তু নহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব, দেশের অধিকাংশ মানুষের কথা ভুলিয়া কতিপয় মানুষের জন্য তুমি কী প্রকৃতির সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছ। ইউরোপের কোনো সুদূর শহরের এক সুদূর মধুশালায় কতিপয় বিদগ্ধ বিদেশীকে তুমি তোমার কবিতা শুনাইলে। তোমার দেশের পরাণ মণ্ডল শুনিল কই। হোমারের কাব্য গ্রীসের পরান মণ্ডল বুঝিত, বুঝিয়া আনন্দ পাইত। মহাকবি শেকসপিয়রের কাব্য ইংলন্ডের পরান মণ্ডল বুঝিত, বুঝিয়া আনন্দ পাইত। আধুনিক কয়জন বঙ্গীয় কবির কাব্য বঙ্গদেশের পরান মণ্ডল বুঝিবে এবং বুঝিয়া আনন্দ পাইবে। আমাদের সাহিত্য আমাদের বৃহৎ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাহিত্য উঠিয়াছে। যে সাহিত্য আমাদের দেশের সকল মানুষের আদরের বস্তু হইয়া উঠিল না, সে সাহিত্য সারা বিশ্বে আদৃত হইবে কী করিয়া।

আমরা কেহ-কেহ আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিয়া থাকি। কেহ বা কমবেশি সাহিত্য পড়িয়াও থাকি। আমরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপনা করি, বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া থাকি। সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রবন্ধাদিও বড়ো কম লেখা হয় না। তবু বলি, সাহিত্য আমাদের জীবনে একটি বড়ো স্থান জুড়িয়া নাই। রাজপথে পত্রপত্রিকার দোকানে দেখি, যে বস্তুর বেশি বিক্রি তাহা ঠিক সাহিত্যবস্তু নয়। সিনেমা, রেডিও, টি-ভিকেও সৎসাহিত্যের প্রচারক বলিতে পারি না। হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রী আজকাল বাঙলা সাহিত্যের চর্চা করেন। সেই চর্চার ফলে দেশে এক নূতন সাহিত্যবোধের উন্মেষ হইয়াছে কিনা বুঝিতেছি না। অপর পক্ষে দেখি, চারিদিকে যেন এক সাহিত্যের মহোৎসব চলিতেছে। কত সাহিত্যসভা, কত কবিসম্মেলন, কত বক্তৃতা। কত সাহিত্যিক নানাবিধ পুরস্কার পাইতেছেন, পুরস্কার-প্রাপকেরা অভিনন্দিত হইতেছেন। আমাদের সাহিত্যজীবন আজ যেমন মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তেমন পূর্বে কখনও হয় নাই। আমাদের রাজনৈতিক জীবন মুখরতর হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যজীবন নীরব হইয়া পড়িয়াছে, এমন বলিতে পারি না। আসল কথা, আমাদের সামাজিক জীবনে নীরবতার বড়ো স্থান নাই। আবার এক শ্রেণীর মানুষ আমাদের সামাজিক জীবনকে বিশেষভাবে সরব করিয়া তুলিয়াছেন। সেকালে অনেক বুদ্ধিমান মানুষ দেখিয়াছি। একালে দেখিতেছি বুদ্ধিজীবীর ভিড়। এই বুদ্ধিজীবী শব্দটি কে কী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আচার্য সুকুমার সেন বলিতে পারিবেন। অনুমান করি, শব্দটি ইংরাজি ইনটেলেকচুয়াল শব্দের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদটি বড়ো সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। একবার দেখি আমার নামটিও কোনো প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীর তালিকায় স্থান পাইয়াছে। পিতামহী আমার বুদ্ধির পরিমাপ করিতে গিয়া যে সরলমতি প্রাণীটির সঙ্গে আমার তুলনা করিতেন, তাহার কথা স্মরণ করিলাম। সাহিত্যের প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীর কথা তুলিলাম ইহা ভাবিয়া যে, সাহিত্যসংসারে বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশ সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে বলিয়া মনে করি না। আবার ইহাও সাহস করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের বুদ্ধি যত কমিতেছে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা তত বাড়িতেছে।

বিশ্বসাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের স্থান লইয়া চিন্তা করিতে হইলে প্রথমে প্রশ্ন করিতে হয়, বাঙালি হিসাবে আমরা সারা বিশ্বে কী লইয়া গর্ব করিব। ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ বিকাশ বঙ্গসংস্কৃতিতে। ভারতীয় সভ্যতা সকল বড়ো সভ্যতার মতো বিচিত্রমুখী। সেই বিচিত্রমুখী সভ্যতার একটি বিশেষ বস্তু সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সে বস্তু বেদান্তদর্শন। সেই দর্শন আমাদের সকল চিন্তা, সকল অনুভূতির মানসসরোবর। গীতা হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির কাব্যের ভাব মূলত বেদান্তের ভাব। এই বেদান্তের তত্ত্ব বাঙালির জীবনে, তাহার চিন্তায়, ভাবনায়, তাহার কাব্যে, দর্শনে কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যদি বল বাঙালি ব্রাত্য, মন্ত্রহীন, তাহা হইলেও দেখিব যে সেই ব্রাত্য বা মন্ত্রহীনের শাস্ত্রবিরোধিতার মধ্যেও কোনোভাবে বেদান্তের তত্ত্বই এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

অনুমান করিতে পারি, পাঠক ভাবিতেছেন, সাহিত্য-প্রসঙ্গে বেদান্তের কথা উত্থাপন করিয়া গোল বাধাইলাম। কেহ-কেহ বলিবেন সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনের অহি-নকুলসম্পর্ক। আর জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের ষড়্‌দর্শনের কোন্‌ গ্রন্থখানিকে সাহিত্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি? কিন্তু ভারতীয় মন যে বিশেষভাবে দার্শনিক মন, তাহা কিন্তু বিশ্বের মানুষ বুঝিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীর কাছে আমাদের গৌরব আমাদের দর্শনের গৌরব। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ভারতের সৃষ্টি হইল, নূতন শিক্ষা তথা নূতন চিন্তার ফলে যে নূতন চেতনার আবির্ভাব ঘটিল, তাহার মূলে আমাদের এই দার্শনিকতা। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এই দর্শনের প্রবক্তা। গান্ধীর অহিংসা এবং অনাসক্তিযোগ এক মহৎ জীবনদর্শন। নেহরু একজন আধুনিক মানুষ এবং মার্কস-লেনিনের ইস্কুলে কিছু পাঠ লইয়াছিলেন। তিনিও দেখি বলিতেছেন :

Almost unawares, a vague idealist approach would creep into my mind, something rather akin to the Vedanta approach.

কাব্যরসিক বাঙালি পাঠক বলিবেন, উপনিষদের তৎ ত্বম্‌ অসি মন্ত্র যিনি সার করিয়া ব্রহ্মে লীন হইলেন, তাঁহার আর কাব্যে প্রয়োজন কী। কাব্যের আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর হইতে পারে। কিন্তু যিনি ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইয়াছেন, তিনি কাব্য পড়িবেন কেন? এই প্রসঙ্গে এক ইংরাজ দার্শনিকের একটি উক্তি মনে পড়িতেছে। একদিন দেখি অকসফোর্ডের একটি কলেজে অধ্যাপক জেনার শাংকর বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

জেনার তখন ডকটর রাধাকৃষ্ণনের পর অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের স্পলডিং অধ্যাপক। লেকচার হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দশ-বারোজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ইংরাজ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন। উঁহাদের কাহাকেও অবশ্য চিনিলাম না। কয়েকজন দেখিলাম, বক্তৃতা শুনিতে-শুনিতে চক্ষু মুদিত করিতেছেন। উহা শুধু নিদ্রা না যোগনিদ্রা বুঝিলাম না। একজন মহিলা নিবিষ্ট হইয়া সোয়েটার বুনিতেছেন। বুনিতে-বুনিতে শুনিতেছেন, না, শুনিতে-শুনিতে বুনিতেছেন—বুঝিলাম না। ড. জেনারের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, শংকরের অদ্বৈতবাদ ধর্মের মৃত্যু। ধর্মের মূলে ভক্তি, আর সেই ভক্তির মূলে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে দ্বৈত সম্পর্ক। যেখানে ভক্তই ভগবান বনিয়া যাইতেছে, সেখানে কে কাহাকে ভক্তি করিবে। বক্তৃতার মধ্যে কোনো সংস্কৃত শব্দ উচ্চারিত হইল না। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৎ ত্বম্ অসি কথাটি শুনিলাম না। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের একটি সূত্রও উচ্চারিত হইল না। শংকরাচার্যের শারীরিক মীমাংসাভাষ্য গ্রন্থখানি হইতেও কোনো উক্তি উপস্থিত করা হইল না। সুন্দর সরল ইংরাজিতে বলা হইল, শাংকর বেদান্তে ধর্মবোধের স্থান নাই। বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন আহ্বান করা হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে-কতিপয় শ্রোতা নিদ্রা বা যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তাঁহারা চক্ষু খুলিয়াছেন। যিনি উল বুনিতেছিলেন তিনি উক্ত কর্ম হইতে বিরত হইয়াছেন। কেহই কোনো প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতেছেন না। মনে হইল, বক্তৃতাটি সকল প্রশ্নের নিরসন করিয়াছে। আমি সভয়ে উঠিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি সংস্কৃতজ্ঞ নই, দার্শনিকও নই। আমি একজন বাঙালি হিন্দু। আপনারা যাহাদের পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন আমি তাহাদের একজন। আমাদের বাড়িতে ফুলচন্দন-সহ বিগ্রহসেবা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিগ্রহের সামনে বসিয়া আমরা যে গান করিয়া থাকি তাহার মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব উচ্চারিত হয়। তাহার পর আমার দুর্বল ইংরাজিতে একটি গানের অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—

এই করো হরি দীন দয়াময়
তুমি আমি যেন দুটি নাহি হয়
জলেরই তরঙ্গ জলে করো লয়
চিদ্‌ঘন শ্যাম সুন্দর।

জেনার সাহেব বলিলেন, তিনি যে ইংরাজি বইগুলি পড়িয়া শংকরের অদ্বৈতদর্শনের মূল কথাগুলি আয়ত্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির কোনো আভাসমাত্র তিনি পান নাই। আমি বলিলাম, শংকর চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি সুন্দর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সন্ধ্যায় আলোচনা বেশিক্ষণ চলিল না। আর আমি তত্ত্বজ্ঞ মানুষ না হওয়াতে সার্থক আলোচনা সম্ভবও ছিল না। জেনার সাহেব অবশ্য আমাকে অল সোলস কলেজে চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাসময়ে সেই কলেজে উপনীত হইয়া দেখি, অকৃতদার ড. জেনার তাঁহার গ্রন্থরাশির মধ্যে ডুবিয়া আছেন। তিনি তখন অভেস্তার এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত। গ্রীক-ল্যাটিনে অধিকার অর্জন করিয়া প্রাচীন পারসিকে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছেন। তিনি আমাকে দুইটি প্রশ্ন করিলেন। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি যে ভগবান তাহা তিনি কী করিয়া বুঝিবেন। তারপর টেবিলে রক্ষিত অ্যাশ-ট্রে বা ছাইদানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ বস্তুটি ঈশ্বর কিনা। বলা বাহুল্য, আমি বিপাকে পড়িলাম। তথাপি সাহস করিয়া বলিলাম, শংকর কোথাও বলেন নাই যে, কেহ যে-কোনো সময়ে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। ব্রহ্মলাভ কঠিন সাধনার ফল। যিনি ব্রহ্মলাভ করেন তিনি আর জিজ্ঞাসা করিবেন না তিনি ব্রহ্ম কিনা। আর তাঁহার চারিপাশের বস্তুনিচয় ব্রহ্ম কিনা, সে প্রশ্নও তখন উঠিবে না। জেনার সাহেব রোমান ক্যাথলিক। অদ্বয়-সিদ্ধির রহস্য তাঁহার কাছে রহস্যই থাকিয়া গেল।

তবে ইহার পর সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া বেদান্তশাস্ত্র মূলে পড়িয়া ড. জেনার শংকরের অদ্বৈতবাদের তত্ত্বটি অন্ততপক্ষে পণ্ডিত হিসাবে বুঝিয়া-লইয়াছেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের বহু পরে লিখিত চারখানি গ্রন্থ বিশেষ আগ্রহসহকারে পড়িয়াছি এবং পড়িয়া লাভবান হইয়াছি। সেই চারখানি গ্রন্থ আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

R. C. Zachner, *Mysticism ; Hindu and Muslim*, 1960
Mysticism ; Sacred and Profane, 1961
Hinduism, 1962
The Bhagavad Gita, 1965

ইহার মধ্যে তৃতীয় বইখানিতে ড. জেনার একটি বড়ো চমকপ্রদ কথা বলিয়াছেন। সুফি তত্ত্বকে তিনি বলিয়াছেন 'মুসলমানি পরিচ্ছদে বেদান্তবাদ'। ভারতীয় ধর্মসংগীতের আলোচনায় এই উক্তিটির মূল্য সমধিক। রজনীকান্ত সেনের 'কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা' অদ্বৈতের প্রতীক্ষা। কিন্তু বাউলের গানে যখন এই তত্ত্বের আভাস পাই, তখন উহাকে আমরা সুফিবাদের এক প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করি। জেনার সাহেব বুঝাইলেন, অদ্বৈতবাদ মাত্রেই বৈদান্তিক বস্তু। স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ লইয়া কোনো আধ্যাত্মিক সংগীত রচনা করা হইয়াছে কিনা জানি না। স্পিনোজা ধর্মবিশ্বাসে ইহুদি। ওলড টেসটামেনটে অদ্বয়বাদের নামগন্ধও নাই। তাহা হইলে স্পিনোজাকে কি বৈদান্তিক বলিব? ইংরাজ কবি যখন লিখিলেন,

O, be mine still ; still make me thine
O, make no thine and mine.

তখন কি তিনি শাংকর বেদান্তের অনুগামী? টমাস ট্রেহার্নের 'মাই স্পিরিট' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি :

My soul a spirit infinite ;
....
A pure substantial light
That being greatest which doth nothing seem

এই বিশুদ্ধ জ্যোতির কথা, পরমপুরুষের নিরুপাধিত্বের কথা বাইবেলে নাই। অথচ দুপেরোঁ-কৃত ল্যাটিন উপনিষদ প্রকাশিত হয় ইহার অনেক পরে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। রুডল্ফ অটোর 'মিসটিসিজম ঈস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' পাঠে মনে হইবে, ভারতের বাহিরেও এক বৈদান্তিক চিন্তাধারা রহিয়াছে। মধ্যযুগের জারমান দার্শনিক মাইস্টার এখার্ট অদ্বয়বাদী। ড. অটো শংকর আর এখার্টকে এক গোত্রের দার্শনিক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখার্ট ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না।

একালে দেখিতেছি, ইওরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ-কেহ উপনিষদের তৎ ত্বম্ অসিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। জারমান বৈজ্ঞানিক শ্রোয়েডিনজার তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিলেন :

This life of yours which you are living is not merely a piece of this entire existence. but is in a certain sense "the whole"; only this whole is not so constituted that it can be surveyed in one single glance. This, as we know, is what the Brahmins expressed in that sacred mystic formula which is yet really so simple and so clear ; Tat Tvam Asi, this is you, or again, in such words as "I am in the east and in the west. I am below and above. I am the sole world".

সাহিত্যের প্রসঙ্গে বেদান্তের কথা তুলিলাম ইহা ভাবিয়া যে বহির্বিশ্বের কাছে ভারতের প্রধান আকর্ষণ ভারতের বেদান্ত। আমাদের সকল মহৎ চিন্তার উৎস এই বেদান্ত। কবির আশংকা ছিল

একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলি ক্রমে
ডুবে যাবে

ডুবিবার বোধহয় আর বড়ো বাকি নাই। আমাদের কথা ক্রমশ অগভীর অনুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সকল উচ্চারণ যেন আমাদের কানেই অস্পষ্ট শুনাইতেছে। আমাদের চিন্তাও তাহার স্বচ্ছতা হারাইয়াছে। এদেশের কোনো নিবিড় অনুভূতি যেন সংগীত হইয়া বহুর হৃদয় আর স্পর্শ করিতেছে না। আমাদের নীতিবোধের অভাব আমাদের আচরণে ধরা পড়িতেছে। কোথাও যেন একটি সুন্দর মানুষ দেখিতে পাই না। যে দেশে সুন্দর মানুষ নাই, সে দেশে সুন্দর কথা কে বলিবে। ইংরাজ কবি বলিতেন, কবি নিজেই একখানি কাব্য। সেই কাব্য কোথায় খুঁজিব। খুঁজিলেও পাইব কিনা জানি না। কবির কথা—সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। এখন দেখি প্রায় সকলেই কবি। বাঙালি অকবি এক দুর্লভ বস্তু। কিন্তু বহু কবির বহু কবিতায় আমাদের মন ভরিল কই।

The noisy day is deafened by crowd
Of undistinguished birds, a twittering race
But only lark and nightinagle forlorn
Fill up the silences of night and morn.

এই কথা বোধহয় সকল দেশে সকল যুগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন আবার কোনো এক সিন্ধুসারসের মহাসংগীত শুনিবার জন্য কান পাতিয়া বসিয়া আছি। সে সংগীত ধ্বনিল কই।

ভাবিতেছি এমন কেন হইল। আমরা বোধহয় কোনো শৌখিন আধুনিকতার সন্ধানে ছুটিতে-ছুটিতে আমাদের যুগযুগান্তের সঞ্চিত ঐশ্বর্যকে হারাইতে বসিয়াছি। বলিবে, সেই ঐশ্বর্য কবে ফুরাইয়া গিয়াছে। এযুগের কবি তাহা হইলে কি বসিয়া-বসিয়া গদ্যে বা পদ্যে গীতার ভাষ্য লিখিবে, না কোনো উপনিষদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিবে। আমি বলি, আকাশ যেমন ফুরাইয়া যায় না, সূর্য-চন্দ্র-তারা যেমন নিত্যই নূতন, উপনিষদ গীতা তেমনই চিরনূতন বস্তু। সে বস্তু যেন আজ আমাদের কাছে দূরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

আজ যিনি উপনিষদ গীতা পাঠ করেন তিনি ধর্মাচরণ করেন। তিনি সাহিত্যচর্চা করেন এমন কথা কেহ বলিবেন না। গীতা সম্বন্ধে এক ইংরাজ বন্ধুর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। তিনি বলিলেন টি. এস. এলিয়টের 'দ্য মারডার ইন দ্য কেথিড্রাল' নাটকে গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ বড়ো সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেকেটের প্রশ্ন গীতার প্রশ্ন,

Can I neither act nor suffer without perdition ?

বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, গীতার এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া বাঙলা ভাষায় কোনো নাটক রচিত হইয়াছে কিনা। তিনি আরও বলিলেন গান্ধীর দেশকর্মের আদর্শ অনাসক্তিযোগে

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গীতাখানি নিশ্চয় আমাদের নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমি অবশ্য গীতার দর্শন দ্বারা প্রভাবিত কোনো বাঙলা নাটকের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু বঙ্কিম কিভাবে গীতার ভাব লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিলাম। ভদ্রলোকের গীতা সম্বন্ধে কৌতূহল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। চার্লস উইল-কিন্স-কৃত গীতার অনুবাদে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপ এক নূতন জীবনদর্শনের পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরিচয়ের ফলে ইউরোপে এক নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। উইলকিন্সের ইংরাজি গীতাখানি পড়িয়াই এমারসন বলিয়াছিলেন: "ইট ওয়জ দ্য ফারস্ট অব বুকস; ইট ওয়জ অ্যাজ ইফ অ্যান এমপায়ার স্পোক টু আস।" কিন্তু মারকিন সাহিত্যেও গীতার প্রভাব তেমন গভীর হয় নাই। আমাদের দেশে তিলকের গীতা আছে, অরবিন্দের গীতা আছে, গান্ধীর গীতা আছে, বিনোবা ভাবের গীতা আছে, কিন্তু গীতার ভাব লইয়া একটি মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হইল কই। উপনিষদের তত্ত্ব আমাদের কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউলের গান, গীতাঞ্জলি। আমাদের সকল ধর্মসঙ্গীত বেদান্তমূলক। কিন্তু তবু বলি উপনিষদ বা গীতার কৃত্তিবাস বা কাশীদাস নাই। উহা শাস্ত্রই রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্য হইয়া উঠে নাই।

গীতার কাব্যরস সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র আলোচনার কথা মনে পড়িল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গ্রীক পণ্ডিত এ. বি. লর্ডের বাড়িতে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি ভারতীয় বলিয়া তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডোনিয়েল ইপ্পলস এবং ডিভিনিটি স্কুলের ক্যানটওয়েল স্মিথকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের পর গীতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। আমি ড ইপ্পলসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি গীতার কোথাও তত্ত্ব ব্যতীত একান্তভাবে হৃদয়স্পর্শী কিছু পাইয়াছেন কিনা। উনি বলিলেন অবশ্যই পাইয়াছেন। আমিও বলিলাম গীতার একটি অংশের হিউম্যান পেথস আমার মর্ম স্পর্শ করে। দেখিলাম, আমারা দুইজনে গীতার বিশেষ কয়েকটি শ্লোকের কথা ভাবিয়াই এই কথা বলিয়াছি। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া বলিলেন তুমি স্বয়ং ভগবান তাহা না জানিয়া তোমাকে সখা ভাবিয়া তোমার সঙ্গে কত রঙ্গ করিয়াছি:

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে তামহমপ্রমেয়ম্।।

অর্জুনের এই ভাবটি অবশ্যই বড়ো স্বাভাবিক। যিনি সখা এবং সারথি, এবং যাঁহাকে তিনি আদেশ করিয়াছেন রথ যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া চলো, তিনিই জগদীশ্বর। এই আবিষ্কার তাঁহাকে যে বিমূঢ় করিবে ইহা তো স্বাভাবিক।

কিন্তু গীতার ন্যায় এক মহাগ্রন্থে ভক্তিরসের একটি বিচিত্র ভাব দেখি প্রকাশ পাইল না। অর্জুন করজোড়ে বলিলেন, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

ইহার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু তিনি অর্জুনকে সখা বলিয়া কাছে টানিয়া লইলেন না। অর্থাৎ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভাব বা আচরণে কোনো ব্যতিহারের আভাস পর্যন্ত গীতায় নাই। মধ্যযুগের ভক্তিকাব্যে দেখি—ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, প্রিয়ার সঙ্গে প্রিয়ের সম্পর্ক, সখার সঙ্গে সখার সম্পর্ক। মধ্যযুগের এই ভাব হইতেই গীতাঞ্জলির ভাবের সৃষ্টি। গীতাঞ্জলি গীতার গীতা, এক নূতন গীতা। গীতাঞ্জলি আবার এক নূতন উপনিষদ:

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে

এই ভাব উপনিষদে নাই, গীতায় নাই। কিন্তু উপনিষদ এবং গীতা হইতে এই ভাবে উত্তরণ সম্ভব। বেদান্তের ভাব বেদে নাই। বেদ হইতে বেদান্তের সৃষ্টি। 'বেদের জ্যোৎস্না নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রান্তে'। এই অর্থে গীতাঞ্জলি এক আধুনিক গীতা। ভক্তির এই আধুনিক রূপ ইওরোপীয় কাব্যেও দেখিতে পাই। জারমান কবি রিলকে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হা ঈশ্বর, আমি মরিলে তোমার কী হইবে?"

বাইবেলে এই ভাবটি কোথায়? কিন্তু বাইবেলের ঈশ্বরপ্রেমের ভাব হইতেই এই ভাবের উৎপত্তি। তাই ভাবিতেছিলাম উপনিষদ এবং গীতা হইতে গীতাঞ্জলি পাইলাম। আমাদের ভাবজীবনের সেই মানস-সরোবর কি শুকাইয়া গিয়াছে?

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

• PERFORMANCE
• SERVICE
• DEPENDABILITY

That's what makes us No 1

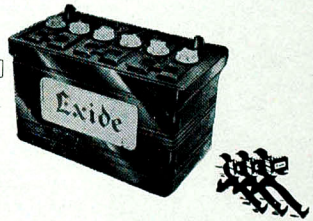

THE HOWRAH MOTOR CO. LTD.

CALCUTTA, PATNA, DHANBAD, CUTTACK, SILIGURI AND GAUHATI